এখানে ওখানে

এখানে ওখানে

শংকর

সাহিত্যম্ ॥ ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

EKHANE OKHANE
by SANKAR

প্রথম প্রকাশ :
—মাঘ ১৩৭১

প্রাপ্তিস্থান :
নির্মল বুক এজেন্সী
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ৭০০ ০০৭
নির্মল পুস্তকালয়
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রকাশক :
নির্মলকুমার সাহা
সাহিত্যম্
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :
প্রদীপকুমার সাহা
লোকনাথ বাইন্ডিং এন্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৩বি, কলেজ রো
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

রাত কলেজ

সেই ছোটবেলা থেকে বিচিত্র এই মানবসংসারে কত মানুষের সঙ্গেই তো পরিচয় হলো। শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়কালে যে-সব পুরুষ ও নারীর সান্নিধ্যে আসা গিয়েছিল তাঁরাই পাকে-চক্রে আমার সাহিত্যসৃষ্টির উপাদান হয়ে উঠেছেন।

যাঁদের আমি দেখিনি, যাঁদের আমি জানি না, যাঁদের সম্বন্ধে অনেক কথা আমার বিশ্বস্তজনদের কাছে শুনিনি, তাঁদের সম্বন্ধে আমার কিছুই লিখতে ইচ্ছে করে না। সেই ছোটবেলা থেকে যাঁদের আমি চিনেছি-জেনেছি, যাঁদের ভালবাসার স্পর্শ লাভ করেছি, তাঁদের ক'জনের কথাই বা অবশিষ্ট জীবনের কয়েকটি বছরে লিখে শেষ করতে পারবো? সুতরাং গল্পসৃষ্টির রঙিন রথে চড়ে অচেনা চরিত্রদের আহ্বান করবার প্রয়োজন কোথায়? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অসংখ্য বঞ্চনার মাঝেও তিনি আমাকে বহু বিচিত্র মানুষের দীর্ঘ শোভাযাত্রা খুব কাছ থেকে দাঁড়িয়ে দেখার দুর্লভ সৌভাগ্য দান করেছেন।

জীবনসংগ্রামের প্রয়োজনে প্রতিকূল পরিবেশে সারাজীবন ধরে কাজ করতে হলেও, আমার স্বভাবে একটু কুড়েমি থেকে গিয়েছে। অনেক দুঃসাহসী লেখক আছেন যাঁরা দুর্বারগতিতে গল্পের পিছনে ছুটে যান, সাংবাদিকের দক্ষতায় অপরিচিতজনদের সঙ্গে পরিচয় করেন, যা গোপন এইসব মানুষের একান্ত অভিজ্ঞতা ছিল, তা প্রকাশ্যে টেনে আনেন।

এইসব সাহসীরা প্রয়োজন হলেই ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। নতুন-নতুন জনপদে অপরিচিতদের সঙ্গে আলাপ জমান এবং তাঁদের সঞ্চয়ের ঝুলি ক্রমশই ভারী হয়ে ওঠে। আমারও এই রকম হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমি সেই দলে, যারা শুতে পেলে বসে না, বসতে পেলে দাঁড়ায় না, দাঁড়াতে পারলে হাঁটে না, হাঁটতে পারলে দৌড়য় না।

আমার এক শুভানুধ্যায়ী বাল্যবন্ধু এ-ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে প্রায়ই আমাকে গোপনে উপদেশ দেয়—এখন গতির যুগ। দ্রুতগামী চরিত্রদের পিছনে লেখককে ফুটবল মাঠের রেফারি এবং লাইনসম্যানদের মতো সারাক্ষণ ছুটতে হবে। না-হলে ভাল গল্প হাতছাড়া হয়ে যাবে। বন্ধুর ভয়টা যে অমূলক নয় তা আমিও অস্বীকার করতে পারি না কিন্তু এই বয়সে নিজের স্বভাব আমূল পরিবর্তনের ক্ষমতা আমি রাখি না। তাই তর্কের খাতিরে বন্ধুকে বলি, "গল্পলেখকদের অতিমাত্রায় গল্পলোভী হওয়া শোভন নয়।

অতিমাত্রায় ব্যস্ত কোনো-কোনো লেখক কাঁচা গল্পকে কারবাইডের তাপে অকালপক্ক করে ফেলেন। পাঠকের সাময়িক প্রয়োজন তাই পূর্ণ হলেও তাঁর মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থেকে যায়।"

আমার কাছে কারবাইডে-পাকানো গল্পের কথা শুনে একবার কাদম্বিনী ও কাশীনাথ খুব হেসেছিল। আমার বান্ধবী কাদম্বিনী সিংহরায় এবং সহপাঠী বন্ধু কাশীনাথ মজুমদার।

সে অনেকদিন আগেকার কথা। কাদম্বিনী তখনও আমাকে 'আপনি' বলতো। কাদম্বিনী পরামর্শ দিয়েছিল, "আপনি কখনও গল্পের চাপে পড়ে সেনস-অফ-হিউমার অর্থাৎ রসবোধ হারাবেন না।"

কাশীনাথ চিরকালই সিরিয়াস মানুষ। সে বলেছিল, "গল্প-উপন্যাস ম্যানুফ্যাকচার এবং মার্কেটিং এক ধরনের স্মল স্কেল ইনডাসট্রি, ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগ। সুতরাং লেখককে নিয়মিত প্রোডাকশন দিয়ে যেতেই হবে। প্রয়োজন হলে তোমাকেও কারবাইডে গল্প পাকাতে হবে বৈকি। তবে পাঠককে ঠকিয়ে নয়, এমনভাবে কারবাইড প্রয়োগ করতে হবে যাতে গল্পটা বিস্বাদ না হয়ে ওঠে।"

কাদম্বিনী সেই সময় কাশীনাথ মজুমদারের দিকে তাকিয়েছিল। তারপর বলেছিল, "কেন আপনি একজন সিম্পল আর্টিস্টের মাথায় বিপণন, উৎপাদন এই সব বিজনেস ফিলজফি ঢুকিয়ে দিচ্ছেন? ওঁকে নিজের লাইনে নিজের মতো করে এগিয়ে যাবার স্বাধীনতা দিন। আমি তো ওঁর লেখাতেই পড়েছি, গল্পলেখায় একটিমাত্র আইন আছে তা হলো, কোনো বাঁধাধরা নিয়মের দাসত্ব লেখককে পালন করতে হয় না!"

আমার দিকে তাকিয়ে কাদম্বিনী বলেছিল, "যাই ঘটুক, আপনি কখনও হাসবার এবং হাসাবার সুযোগ হারাবেন না। তা ছাড়া, মন যা চায় তাই করবেন। কোনো প্রত্যাশা নিয়ে কারও পিছনে ছোটাছুটি করবার প্রয়োজন নেই। সাহিত্যটা ফুটবল খেলা নয়। সৃষ্টির প্রাঙ্গণে বিভিন্ন খেলোয়াড়ের মধ্যে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। বেশি গোল খেলেই সাহিত্যের অঙ্গনে হার হয় না।"

"অনেক গোল খেয়েও জীবনের খেলায় মানুষ অনেক সময় জিতে যায়," কাদম্বিনীর এই কথাটা আমি একটা গল্পে লিখে দিয়েছিলাম। অনেকের খুব ভাল লেগেছিল, কেউ-কেউ চিঠিও দিয়েছিলেন আমার 'সৃষ্টিশীল' মন্তব্যের জন্য। আমি পত্রলেখককে জানিয়ে দিয়েছিলাম, "এই মূল্যবান উক্তিটির জন্যে আমাকে অভিনন্দিত করবেন না। অনেকদিন আগে কলেজ ক্যানটিনে এক বান্ধবীর মুখে এই কথাটি শুনেছিলাম। পৃথিবীর এই বৃহৎ জনারণ্যে তিনি অনেকদিন হলো হারিয়ে গিয়েছেন না হলে তাঁর ঠিকানা আপনাদের জানিয়ে দিতাম।"

একজন উৎসাহী পাঠিকা পুনর্বার পত্রাঘাত করে লিখেছিলেন, "বক্তব্যটা ে

আপনার নিজস্ব নয় তা মূল লেখাতেই স্বীকার করেননি কেন? যেখান থেকে যা নেওয়া হয় তার স্বীকৃতি দেবার রেওয়াজ তো ইংরিজি প্রবন্ধ-সাহিত্যিকরা দীর্ঘদিন ধরে মেনে চলেছেন।"

যুক্তিসঙ্গত অভিযোগ। পরবর্তী পত্রে সেই উৎসাহী পাঠিকাকে আমি লিখেছিলাম, "সমগ্রজীবন ধরে আমার সাহিত্যকর্মে নিজের কথা সামান্যই বলেছি। আমার পরিচিতজনরা যা করেছেন, যা বলেছেন তাই আমি সাধ্যমতো লিপিবদ্ধ করে চলেছি। স্মৃতিকাহিনীতে আমার ভূমিকা নিতান্তই একজন রিপোর্টারের, কোনো মূল্যবান বস্তুর সৃষ্টির কৃতিত্ব আমার নয়। আমার সমস্ত গল্প-উপন্যাসের শুরু এবং শেষে সব সময় অদৃশ্য অথচ বিশাল উদ্ধৃতিচিহ্ন রয়েছে, ধরে নিতে হবে। পরিচিত এবং অপরিচিতজনদের কথামতোই আমার সাহিত্যজীবনের একমাত্র সম্পদ অপরের অমৃতবাণী সঞ্চয় করেই আমার সৃষ্টির ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে উঠেছে।" অর্থাৎ কার কাছ থেকে কী সংগ্রহ করেছি তার পূর্ণ বিবরণ দিতে গেলে প্রতিটি বইয়ের প্রতিটি পাতা সুদীর্ঘ পাদটীকায় ভরে উঠবে।

যেমন কাদম্বিনী ও কাশীনাথের কথাই ধরুন। কী উজ্জ্বল মুক্তোর মতো এক-একটি মন্তব্য করতো কাদম্বিনী, যা আমার মনের মধ্যে গভীর দাগ রেখে যেতো। আমার উপন্যাসের নায়িকাদের চরিত্র উজ্জ্বল করতে সেইসব কথা বহু বছর ধরে আমি সানন্দে একের পর এক ব্যবহার করেছি। সেই সঙ্গে বিনম্রচিত্তে স্মরণ রেখেছি—ওইসব মূল্যবান মন্তব্য আমার পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভব হতো না।

কাদম্বিনী তার যৌবনকালে অসামান্য সুন্দরী ছিল, এই দাবি করা বোধ হয় ঠিক হবে না। কাদম্বিনীর শরীরের রঙ কাঞ্চন নয়। তার মুখ চোখ নাক গ্রীবার সৃষ্টিতে ঈশ্বরের ভাস্কর্যপ্রতিভার প্রশংসনীয় নিদর্শনও ছিল না। কিন্তু তার ছিল লাবণ্য এবং সেই সঙ্গে মধুর ব্যক্তিত্বের ঐশ্বর্য। দেহসম্পদে প্রচণ্ড গরীয়সী না হয়েও এক-একজন রমণী থাকেন যিনি বিজয়িনী হবার সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। কাদম্বিনী সিংহরায়কে সেই দলে ফেলাটাই যুক্তিযুক্ত হবে।

যখন বয়স কম থাকে তখন রমণী শরীরের ঐশ্বর্য নিয়েই তরুণরা অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকে। ব্যক্তিত্ব কথাটা তখন তেমন কানে ঢোকে না। তার কোনো বিশেষ অর্থও থাকে না।

আমাদের ক্লাসের রমলা সিকদার বা প্রতিমা বিশ্বাস অবশ্যই কাদম্বিনীর তুলনায় সুন্দরী ছিল। কিন্তু তাদের ক্ষুরধার ব্যক্তিত্ব ছিল না। রমলা সিকদারের সমস্ত সৌন্দর্য যা ধুয়েমুছে যেতো যে-মুহূর্তে সে সহপাঠীদের সঙ্গে কথা শুরু করতো। টেকস্ট্ বুকের বাইরে জনপ্রিয় সিনেমা এবং আধুনিক বাংলা গান ছাড়া কোনো বিষয়েই তার আগ্রহ ছিল না। রমলা সিকদার প্রাত্যহিক সংবাদপত্রটা পড়তেও আগ্রহবোধ করতো না।

কোনোরকমে কলেজে নিয়মিত হাজিরা দিয়ে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বসতে চায়, যখন সে মুখস্থ নোটবুকগুলো উগ্‌রে দিতে পারবে। পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাবনা-চিন্তার যে একটা ভূমিকা আছে তা রমলা সিকদারকে দেখলে কেউ বুঝতেই পারবে না। পর পর তিনদিন কলেজ ক্যানটিনে ওর কথা শোনার পরে কারও মনে রাখার কথা নয় যে রমলা সিকদার একজন সুদর্শনা বঙ্গললনা। রমলা সিকদারের পক্ষে শুধু এইটুকুই বলা চলে যে সে কুটীলা নয়। মনের প্রকৃত ভাবনা-চিন্তা লুকিয়ে রেখে সে নিজেকে একজন চিন্তাময়ী বলে জাহির করে না।

প্রতিমা বিশ্বাসের ব্যাপারটাও আমরা গবেষণা ও বিশ্লেষণ করেছি। প্রতিমাকে বাংলা মতে ফর্সা বলা চলে। সংবাদপত্রের পাত্র-পাত্রী বিজ্ঞাপনে এই রকম মেয়েরাই তো প্রকৃত সুন্দরী বলে প্রচারিত হয়ে থাকে। যদিও ট্রামে-বাসে পথে-ঘাটে এরা আপনার দৃষ্টি কেড়ে নেয় না। এদের উপস্থিতিতে কোনো স্টেশনারি দোকানে চাপা সাড়া পড়ে যায় না। এরা অবশ্য বিবাহের নির্বাচনী পরীক্ষায় সামান্য প্রচেষ্টাতেই ভাবী শ্বশুর-শাশুড়ীর অনুমোদন পেয়ে যায়।

কিন্তু প্রতিমা বিশ্বাসকে কলেজে বিজয়িনীর ভূমিকায় আমি দেখতে পাই না। কারণটা খুবই স্বাভাবিক। ডালহৌসি স্কোয়ারে এক বিলিতি কোম্পানির রিসেপশনিস্ট প্রতিমা বিশ্বাস বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ভাল করবার নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। চার পাঁচটা বাড়তি নম্বরের লোভে সে বিশ্বসংসারে ভিখিরির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। পরীক্ষার নম্বর ছাড়া আর কোনো ব্যাপারে প্রতিমা বিশ্বাসের কোনো আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না। এই ধরনের নম্বর-হ্যাংলামো যে মেয়েদের সৌন্দর্য নষ্ট করে তা অনেকদিন পরে আমি বুঝতে পেরেছি।

অথচ ব্যক্তিত্বই মেয়েদের আসল সৌন্দর্য। মন্তব্যটা যে আমার নয় তা গোড়াতে বলে রাখি। আমাদের সহপাঠী কাশীনাথ মজুমদার কথাটা চায়ের টেবিলে বলেছিল।

আমাদের বন্ধু প্রণবেন্দু তখন এক সুন্দরী অফিসকর্মীর সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছে। সে বলেছিল, "শরীরের বোতল থেকেই তো ব্যক্তিত্বের পারফিউম ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং সৌন্দর্যকে অবহেলা কোরো না, ব্রাদার।"

শরীর, সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্বের জটিল রসায়ন নিয়ে আমরা দীর্ঘস্থায়ী তর্কযুদ্ধে নামতে পারতাম, কিন্তু সেই সময়ে কাদম্বিনী আমাদের টেবিলে এসে যোগ দিয়েছে। জিজ্ঞেস করেছে, "কে আমাকে হাওড়া পর্যন্ত পৌঁছে দেবে আজ ? শুনছি, বড়বাজারে পুরো রাস্তাটা জ্যাম।"

"প্রয়োজন হলে আমরা সবাই হাওড়ার সিটিজেনশিপ নেবো।" প্রণবেন্দু তা সকলের হয়ে ঘোষণা করলো।

আসলে এটা ব্যঙ্গ। আমার বন্ধুরা জানে, একমাত্র আমিই হাওড়ায় থাকি, অপর নাম তখন ঈশ্বরপরিত্যক্ত নগরী, গড-ফরশেকেন সিটি।

সেইদিন সন্ধ্যায় কাদম্বিনীকে একাকিনী হাওড়ায় পৌঁছে দেবার দুর্লভ সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। সময় লেগেছিল অন্তত একঘণ্টা, কিন্তু মনে হলো মাত্র কয়েক মিনিট। এই রকমই হয়ে থাকে। দুঃখের সময় দীর্ঘ হয়ে ওঠে, আর সুখের সময় হঠাৎ শেষ হয়ে যায়। রাজা হরিশ্চন্দ্র দুঃখের এক রাত্রিকে দ্বাদশ বৎসর মনে করেছিলেন।

কাদম্বিনীর সঙ্গে শিয়ালদহের কলেজ থেকে বেরোবার আগে আমি একটু বোকামি করে ফেলেছিলাম। বোধহয় একটু বেশি চপলতা প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল। আমি বলেছিলাম, "রাস্তা যদি বন্ধ থাকে তা হলে ক্লাশ শেষ হবার একটু আগে বেরিয়ে পড়লেই ভাল হয়।"

আমার বন্ধুরা আমার প্রস্তাবের কদর্থ করেছিল। আমাকে আড়ালে ডেকে বলেছিল, 'সুযোগ তো পেয়েছো। আমরা কেউ তো তোমাকে ফলো করছি না। তবু অত ব্যস্ততা কেন? ক্লাশ শেষ হোক, ঘণ্টা বাজুক, তারপর হ্যারিসন রোডের একদিক থেকে আর একদিকে যেতে যত খুশি সময় নিও। এখনই এতো চঞ্চল হলে, কাদম্বিনীই বা কী ভাববে?"

কাদম্বিনী কিন্তু ক্লাশ শেষ না-করেই সেদিন কলেজ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সে বোঝে, রাত্রিবেলায় কলেজ স্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, চিৎপুর পেরিয়ে অতোটা পথ হাঁটতে হলে, আর দেরি করা উচিত নয়।

সেদিন কলেজ থেকে বেরিয়ে কাদম্বিনী বলেছিল, "ফেললাম তো আপনাকে বিপদে! আমার জন্যে কষ্টও করবেন, আবার বন্ধুদের সমালোচনাও সহ্য করবেন।"

"আমার বন্ধুরা চমৎকার মানুষ। আমরা নিজেদের নিয়ে মজা করি, কিন্তু কারুরও কোনো জ্বালা থাকে না।" আমি সেদিন বন্ধুদের পক্ষে ওকালতি করে ভালই করেছিলাম। কারণ কাদম্বিনী আমার কথা শুনে খুব খুশি হয়েছিল।

সেদিন হ্যারিসন রোডে সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। "একজন দুষ্টু ইংরাজকে তাড়িত করে এই জঘন্যরাজ মহাত্মা গান্ধীকে ডেকে এনে তাঁকে এমনভাবে অপমান করার কী প্রয়োজন ছিল?" কথাটা কাদম্বিনীই বলেছিল সেদিন।

আমি তখন ভাবছি, কেমনভাবে এই পথটুকু পেরিয়ে কম কষ্টে কাদম্বিনীকে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দিতে পারি। তারপর আমি চলে যাবো কালিবাবুর বাজারের কাছে মাধুরীবাগানে। হাওড়ার পথঘাট আমার অপরিচিত নয়, জন্ম না হলেও এখানেই আমি শৈশব, কৈশোর অতিবাহিত করেছি।

কাদম্বিনী সিংহরায়। এক ক্লাশে পড়লেও সে আমার থেকে অনেক ছোট। ইস্কুল-

কলেজে এমন সাধারণত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু রাত কলেজে অসম্ভব বলে কোনো জিনিসই নেই। জীবিকার তাড়নায় অনেকগুলো বছর নষ্ট করে আমি আবার এসেছি এই কলেজে, পিছন-দরজা দিয়ে একটা ডিগ্রি সংগ্রহ করতে।

কাদম্বিনীই একবার আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনি কেন শুধু-শুধু এখানে সময় নষ্ট করতে এসেছেন?"

আমি বলেছিলাম, "যেদেশে যা নিয়ম!" একজন ইংরেজ মহিলা যিনি এদেশকে জানেন তিনি আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, "এদেশে ডিগ্রি ছাড়া সারাজীবন পদে-পদে অপমানিত হবে। সুতরাং সুযোগ পেলে, সব কাজ ছেড়ে, একটা পরীক্ষা পাসের সীলমোহর যোগাড় করে নিও।"

সেই পরামর্শমতোই আমি অনেক বছরের ব্যবধানে রাত কলেজে ফিরে এসেছি প্রথম একটু লজ্জা-লজ্জা করছিল। শিং ভেঙে বাছুরের দলে যোগ দেওয়া। কিন্তু কলেজে এসে দেখলাম, আমার থেকে বয়সে অনেক বড়-বড় মানুষ এখানে এসেছেন নামের পাশে দুটি অক্ষর (বি-এ) লেখবার দুর্লভ আকর্ষণে। যিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বয়সী, চাকরি থেকে অবসর নিতে তাঁর মাত্র তিন বছর আছে, তাঁর মেয়ে ইতিমধ্যেই এম-এ পাস করেছেন, সংসারের দায়দায়িত্ব থেকে কিছুটা মুক্তি পেয়ে তিনিও এসেছেন এই রাত কলেজে পড়তে।

কিন্তু সবাই অনেক বছর নষ্ট করে সময়কে সামলাতে এই রাত কলেজে আসেনি কাদম্বিনীর মতো মেয়েরা আই-এ পাস করেই এখানে ছুটে এসেছে। দুপুরবেলায় সে একটু সংসারের কাজকর্ম দেখে, তার মায়ের শরীর অসুস্থ। তারপর সন্ধ্যাবেলা কাদম্বিনী কলেজে চলে আসে। এই সব ছাত্রীর জন্যেই তো মর্নিং সেকশন। কিন্তু কাদম্বিনী বলে, "সকালবেলাতেই তো বাড়িতে কাজের চাপ বেশি। বাবাকে অফিস এবং ভাইকে ইস্কুলে পাঠাতে হৈ-চৈ পড়ে যায়। মা বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ভীষণ অসহায় বোধ করেন।"

কাদম্বিনী বলেছে, "ছেলেরা ভীষণ পরনির্ভর, কিছুতেই একলা-একলা তৈরি হতে পারে না।"

আমি অবশ্যই কাদম্বিনীর সঙ্গে একমত। ওর কথা শুনেই একটা গল্পে লিখেছিলাম "প্রত্যেক বাঙালীর আবশ্যিকভাবে হোস্টেলে বসবাস প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে আবশ্যিক এন-সি-সি ট্রেনিং। ছোট বয়সে বাড়ির বাইরে না-ঠেললে বাঙালীর পরনির্ভরতা কমবে না।"

নারীজাতির প্রশংসায় বলেছিলাম, "যেদেশে পুরুষরা যত অপদার্থ হয় প্রকৃতি সে দেশের নারীকে তত কাজের করে তোলেন। বাঙালী মেয়েদের আমি কোনো দোষ দেখতে পাই না, নিজেদের কাজকর্ম সেরে বাড়ির চিরনাবালক পুরুষ আত্মীয়দের সেবা করতে এঁরা তুলনাহীনা। বাংলার বোন ও বাংলার বধূর 'মুখের মধু' যে অলীক

কবিকল্পনা নয়, তা যে-কোনো মধ্যবিত্ত বাড়িতে যে-কোনো সময়ে প্রবেশ করলেই প্রমাণিত হবে।"

"যে-কোনো সময় নয়।" কাদম্বিনী প্রতিবাদ করেছিল। "সন্ধ্যাবেলায় আমি তো বাড়িতেই থাকি না। অফিস থেকে এসেই বাবা পুরোপুরি দায়িত্ব বুঝে নেন। আজ বাড়িতে ফিরে বাবার রান্নাই তো আমরা মজা করে খাবো।"

আমি বুঝেছি, কাদম্বিনীর বাড়িতে অসুখবিসুখের জ্বালা থাকলেও মানসিক দুঃখ নেই। রোগের যন্ত্রণাকে তোয়াক্কা না করেই তারা বাড়িতে কিছুটা আনন্দ রক্ষা করতে পারছে। এটাও কম কী ? দুঃখের মধ্যে যারা সুখী থাকার উপায় বার করতে পারে আমি তাদের শ্রদ্ধা করি। অনেক বাড়িতে মানসিকতা এমন স্যাঁতসেঁতে যে সুখের ঢোক বাজলেও তারা সুখী হতে পারে না।

কাদম্বিনীর সঙ্গী হয়ে সেবার হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত যাওয়া নিয়ে বন্ধুমহলে একটু হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল।

পরের দিন কলেজে আমাকে নিয়ে বেশ চাপা কৌতূহল ও উত্তেজনা। প্রথম ক্লাশে অধ্যাপক না আসায় আমার সমস্যা আরও বেড়ে গেল। প্রায় বন্দী অবস্থায় তিন বন্ধুর সঙ্গে আমাকে কলেজ ক্যানটিনে হাজির হতে হলো।

বন্ধুরা আজ নির্দয়। আমার অ্যাকাউন্টেই তারা চা এবং টোস্ট অর্ডার দিলো। কাদম্বিনীকে সান্নিধ্য দেবার এক্সক্লুসিভ সৌভাগ্য যে সহপাঠী বোনাস হিসেবে লাভ করেছে তার পক্ষে কয়েক কাপ চা এবং টোস্টের খরচ বহন করা কী এমন ব্যাপার ?

এসব কতদিন আগেকার কথা। কিন্তু পুরনো দিনের কথা ইচ্ছে করলেই ভোলা যায় না। যত বয়স বাড়ে ততই ঘুরে-ফিরে পুরনো স্মৃতি বয়সী মানুষকে উতলা করে তোলে।

আমি নিজেও আজকাল কলম ধরলে নিজের অজান্তেই মাঝে-মাঝে পুরনো দিনে চলে যাই।

আমার মনে পড়ে, ছোটবেলায় লেখাপড়ায় খুব আগ্রহ ছিল। যদিও আমি পড়াশোনায় ফার্স্ট-সেকেন্ড হতাম না তবু বাবার মুহুরি বলতেন, "আপনার এই ছেলে একদিন বিদ্যের জাহাজ হবে-- এম-এ, পি-এইচ-ডি কিছুই বাদ থাকবে না।"

এই সব কথা মুহুরিমশায়ের মুখে শুনতে আমার খুব ভাল লাগতো. মনের মধ্যে কোনো সন্দেহ থাকতো না যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষাগুলো আমি অতি সহজে উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছি।

কিন্তু আমার উৎসাহে বাবা জল ঢেলে দিতেন। "বিদ্যের জাহাজ তো অনেক দূরের কথা, আগে নৌকো হোক! কোনো জিনিসে ওর ধৈর্য নেই--নিষ্ঠা এবং ধৈর্য না-থাকলে মানুষ পরীক্ষায় ভাল করতে পারে না।"

বাবার বলবার অধিকার ছিল, কারণ তিনি ম্যাট্রিক এবং আই-এস-সিতে স্কলারশিপ পেয়েছিলেন, বৃত্তির টাকাতেই তাঁর পড়াশোনা হয়েছে।

ধৈর্য এবং নিষ্ঠা কাকে বলে আমি তখন তা বুঝতাম না। বাবার মুহুরি যোগীন্দ্রনাথ মান্না ভাল বাংলা জানতেন। তিনি আমাকে চুপি চুপি বলতেন, "ধীর শব্দ থেকেই ধৈর্য কথাটা এসেছে। ছটফটে ভাব ছেড়ে দিয়ে ধীর হও, তা হলেই ধৈর্য এসে যাবে যে-কোনো সাবজেক্ট তখন তুমি নিজের আয়ত্তে আনতে পারবে। কিন্তু ধৈর্য ধরে লেগে থাকতে হবে তোমাকে।"

নিষ্ঠা কথাটা বোঝাতে গিয়েই যোগীনবাবু বিব্রত হয়ে পড়তেন। বলতেন, "শ্রদ্ধা, অনুরাগ, এইসব গুণ থাকলে লোকে বলে নিষ্ঠাবান।"

আমি তখন ইস্কুলে একটা খারাপ কথা শিখেছি। জিজ্ঞেস করে বসলাম, "আর নিষ্ঠীবন?"

জিভ কেটে যোগীনবাবু বললেন, "ওর মানে তো থুতু! বাবু যে নিষ্ঠার কথা বললেন সে হলো জ্ঞাননিষ্ঠা, কর্মনিষ্ঠা। এই নিষ্ঠা ছাত্রের মধ্যে দেখলে সরস্বতী খুশি হন, তাকে আশীর্বাদ করেন।"

আমি তখন মনে-মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি, "হে ভগাবন, আমাকে ধৈর্য দাও, নিষ্ঠা দাও।"

কিন্তু তখন বোধহয় বড় দেরি হয়ে গিয়েছে। একদিন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে আমার বাবা হাওড়া কোর্ট থেকে রিকশ চড়ে বাড়ি ফিরে এলেন। তারপর তাঁর আদালতে যাবার শক্তি রইলো না। দীর্ঘদিন ধরে তিনি তিলে-তিলে অশেষ ধৈর্য ও নিষ্ঠা নিয়ে দুরারোগ্য ব্যধির সঙ্গে সংগ্রাম করলেন। কিন্তু বিশেষ কোনো ফল হলো না। একদিন গভীর রাতে আমাদের সকলকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে তিনি মরণ-সাগরের পারে যাত্রা করলেন।

আমি ততদিনে বয়সের তুলনায় অনেক পরিণত হয়ে উঠেছি। বাবার দীর্ঘ রোগযন্ত্রণা শেষ পর্যন্ত আমাদের জন্যে কী অবস্থার সৃষ্টি করতে চলেছে তা কিছু আন্দাজ করতে আরম্ভ করেছি। আমি তখন লেখাপড়ায় খুব মনোযোগী হয়ে উঠেছি, এক মুহূর্তও অমনোযোগী হই না। বাবার শরীরে হাত বুলোতে-বুলোতে আমি বলেছি, "বাবা, আমি ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াশোনা করবো। আমি এম-এ, পি-এইচ-ডি হবো; তুমি দেখে নিও।"

বাবা তখন কথা বলতে পারেন না। সারাক্ষণ অবর্ণনীয় হিক্কায় কষ্ট পাচ্ছে

অনেক দিন পরে অবশ্য আমার মনে হয়েছিল, বাবা আমাকে বলতে চেয়েছিলেন, আমাকে অনেক যুদ্ধ করতে হবে। যত দুঃখই আসুক, যাদের ধৈর্য থাকে, নিষ্ঠা থাকে, তাদের শেষ পর্যন্ত জয় হয়।

কী আশ্চর্য এই বাণী ! বাবা চলে গেলেন। মুহুরিমশাই যোগীন্দ্রনাথ মান্নাও বিদায় নিলেন আমাদের সংসার থেকে। লেখাপড়া সব মাথায় উঠলো। সামান্য কয়েকটা টাকার জন্যে আমি তখন কলকাতার পথে-পথে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

সেই সময় আমার বিধবা মা ভগবানের ওপর নির্ভর করে বসে আছেন। তিনি তখন প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন, ভগবানের দয়া হলে এই সংসারে নাকি আর কিছুরই প্রয়োজন হবে না। অথচ আমার মনে পড়তো বাবার কথা। তিনি তো কারও দয়ার কথা বলেননি, তিনি তো ধৈর্য ও নিষ্ঠার কথাই আমাকে শুনিয়ে গিয়েছেন।

চরম সেই দুঃখের দিনে বাবাকে স্বপ্ন দেখলাম। মনে হলো, বাবা হঠাৎ ফিরে এসেছেন। কী আশ্চর্য, আমি বাবাকে বাড়ির ভিতরে আসার জন্যে অনুরোধ করছি, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না, বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি শুধু গোপনে আমার সঙ্গেই কথা বলতে চান। তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, আমাকে আদর করলেন, তারপর স্বনির্ভর হবার আশীর্বাদ জানালেন। আমার কোনো ভয় নেই, তিনি জানালেন। তারপর আমি তাঁকে প্রশ্নটা করলাম এবং তিনি বললেন, নিষ্ঠা এবং ধৈর্য থাকলেই মানুষ বিজয়ী হবে।

বাবাকে আরও অনেকগুলো প্রশ্ন করার ছিল, কিন্তু কিছুই হলো না। তিনি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন, আর দেখা দিলেন না।

বাবা যে এসেছিলেন এবং তাঁকে হাতের মধ্যে পেয়েও যে ধরে রাখতে পারলাম না, তা আর মাকে জানাতে সাহস হলো না। মা তখনও প্রতিদিন ঠাকুরের সামনে মাথা নিচু করেন এবং বলেন, "ঠাকুর, দয়া করো।"

মা তারপর আমাকে বুঝিয়ে দিতেন, এই আত্মীয়হীন সংসারে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হবে। তিনি বলতেন, "তোমাদের বড় হবার একটাই পথ। যাঁর কাজ করবে তাঁকে ঠকাবে না। এক টাকা নিয়ে পাঁচ সিকের কাজ দিয়ে যদি তাঁকে খুশি করতে পারো তা হলে ঈশ্বরও খুশি হবেন।"

আমি তখন নিজের মনেই ভাবতাম, এর নামই তো নিষ্ঠা ! এই একটি মাত্র পথই তা ঈশ্বর আমাদের মতো অভাগা দরিদ্রের জন্য খুলে রেখেছেন।

সেই পথ ধরেই শুরু হয়েছে আমার জীবনসংগ্রাম। আমার পরিচিত আত্মীয়স্বজন নই, আমার অর্থ নেই, শিক্ষা নেই, আছে কেবল ধৈর্য এবং নিষ্ঠা এবং মায়ের আশীর্বাদ। শুধু মায়ের আশীর্বাদের কথা বলছি এই জন্য যে ঈশ্বরের কাছে আমার

মা তো প্রতিদিনই আবেদন-নিবেদন করে চলেছেন, কিন্তু আশীর্বাদ পেয়েছেন কি না তা তো জানা যায়নি।

বিপুল সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত না হলেও কর্মক্ষেত্রে আমি নিতান্ত দুর্ভাগ্য নই। কোনোরকমে বেঁচে থাকার মতো একটা চাকরি আমি যোগাড় করেছি এবং আরও কিছু বাড়তি মাইনে পেয়ে পুরনো চাকরি ছেড়ে নতুন সুযোগের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছি। মা এই নিরন্তর সুযোগসন্ধানে চিন্তিত হলেও আমাকে বাধা দিতেন না। তিনি শুধু বলতেন, "এমনভাবে যাবে যে পুরনো জায়গাতেও তোমার জন্যে ভালবাসা থাকে। তাঁরা যেন বোঝেন, সংসারের জন্যে বাধ্য হয়েই তোমাকে নতুন জায়গায় যেতে হলো।"

মায়ের এই উপদেশ আমি সমস্ত জীবন ধরে অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছি। প্রয়োজনের তাগিদে আমাকে অনেকবার চাকরি পাল্টাতে হয়েছে, কিন্তু সর্বত্র আমি বন্ধুত্ব রেখে এসেছি। এইভাবে বহু মানুষের প্রীতিলাভের সৌভাগ্যও অর্জন করেছি।

কাজের মধ্যে থেকে-থেকে আমি এই বিশ্বসংসারের বিচিত্র রূপের সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হয়েছি। সেই সব অভিজ্ঞতার কাহিনীই তো এতোদিন ধরে বিভিন্ন বইতে লিখে চলেছি।

কিন্তু যা এখনও বলা হয়নি তা হলো মিসেস আইলীন রায়ের কথা। এই ইংরেজ মহিলা গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের কাজে জড়িত ছিলেন। তখন গোলপার্কের কেন্দ্র সৃষ্টি হয়নি, অফিস ছিল রসা রোডের ছোট্ট একটি বাড়িতে।

আমি তখন চাকরির বাইরে কিছু সময় ওখানেই ব্যয় করতাম। ছোটবেলার কোনো স্বপ্নই তো সম্ভব হলো না, তাই অন্তত সাধু ও সজ্জনের সান্নিধ্যে কিছু সময় কাটুক। ইনস্টিটিউটের পত্রিকার দায়িত্ব ছিল আইলীন রায়ের ওপর। সেখানেই ছুটির দিনে চলে আসতাম কিছু কাজ করার নেশায়।

মিসেস রায়ের সঙ্গে দিনের পর দিন দেখা হতো, তিনি একমনে নিজের কাজ করে যেতেন এবং আমাকেও কাজের নির্দেশ দিতেন।

তারপর একদিন তিনি আমাকে বললেন, "তোমার একটা ডিগ্রি প্রয়োজন শংকর আমি যে-দেশে জন্মেছিলাম সে-দেশে ডিগ্রি নিয়ে কারও কোনো মাথাব্যথা নেই কিন্তু তুমি যেখানে জন্মেছো সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না থাকলে সারাজীবন অযথা অপমান সহ্য করতে হবে।"

আমি তো আই-এ পাসের পর কলেজে না গেলেও জ্ঞানচর্চা বন্ধ করিনি। কি মিসেস রায় বললেন, "পড়াশোনা এবং বি-এ পাস এক জিনিস নয়। বিদ্যার জাহাজ হলেও সীলমোহরের অভাবে এদেশে মানুষ সারাজীবন কষ্ট পায়।"

এর পর মিসেস রায় পরামর্শ দিয়েছিলেন, "তোমাকে ছাড়াও এখানকার কা

আমি চালিয়ে নিতে পারবো। কিন্তু ডিগ্রিটা ছাড়া তোমার চলবে না। এখনও তোমার তেমন বয়স হয়নি। ঝাঁপিয়ে পড়ো।”

কী মূল্যবান পরামর্শই দিয়েছিলেন সেই ইংরেজনন্দিনী! তিনি সাহস না যোগালে এইভাবে আবার রাত কলেজে ফিরে আসতে পারতাম না।

অথচ এই সময় আবার নতুন নেশা চেপেছে। সে হলো লেখার নেশা। প্রবল আর্থিক অনটন সত্ত্বেও সাহিত্যের কমলবনে মত্তহস্তীর মতো প্রবেশ করার জন্যে মন উতলা হয়ে উঠেছে।

কিছু-কিছু লেখা তখন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। যদিও কেউ ডেকে লেখা চায় না। কিন্তু লেখা পাঠালে সৌভাগ্যক্রমে তা ফিরে আসে না। কিছুদিনের মধ্যেই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে যায়। ঠিক এই সময় আবার নামের পাশে বি-এ লেখার সাধ জাগলো। ভর্তি হলাম রাত কলেজে।

তখন মুহূর্তের অবকাশ নেই। ভোরবেলায় শুরু হয় প্রাইভেট টিউশনির অভিযান। কলকাতা শহর ভালভাবে জেগে ওঠবার আগেই আমার দুটি ছাত্র পড়ানো শেষ হয়ে যায়।

তারপরেই অফিস যাবার তাগাদা। আমার মায়ের কাছে আরেক শিক্ষা, সময়ানুবর্তিতা, ইংরেজরা যাকে আদর করে বলেন প্যাংচুয়ালিটি। অজ পাড়াগাঁয়ের মানুষ হয়েও নির্ধারিত সময়ের আগেই সর্বত্র উপস্থিত হবার কঠিন শিক্ষা মা কোথা থেকে পেয়েছিলেন তা আজও আমার অজানা। শত অসুবিধার মধ্যেও মা চাইতেন, আমি কলকাতার বাস-ট্রামের বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে নির্ধারিত সময়ে কর্মক্ষেত্রে হাজিরা দিই।

শরীর যতই খারাপ হোক, বাড়িতে যতই বিপদ ঘটুক, মা চিরদিন আমাকে সকালের ভাত যথাসময়ে রেঁধে দিয়েছেন, একদিনও ব্যতিক্রম হয়নি। শুধু ভাত নয়—দুপুরের টিফিন কিনে খাবার মতো বিলাসিতা তখনও আমার আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। তাই অফিস বেরুবার আগেই একটা কৌটোতে মা রুটি ও আলুভাজার ব্যবস্থা করে ফেলতেন। মায়ের হাতে তৈরি টিফিনের অর্ধেক খেতাম দুপুরে, আর বাকিটা তোলা থাকতো বিকেলের জন্যে।

দ্বিতীয় দফা টিফিন শেষ করে ছুটতাম রাত কলেজে। সেখানে নতুন এক জগতে এসে পড়লাম।

প্রতিমা বিশ্বাস, রমলা সিকদার, নমিতা চ্যাটার্জি, কাদম্বিনী সিংহরায় এবং আরও অনেক ছাত্রী ছিল আমাদের ক্লাশে। তাদের নিয়ে সহপাঠী মহলে তখন নানা গুঞ্জন এবং কৌতূহল। আমার নৈতিক মান যে সর্বোচ্চ স্তরের তা নয়, কিন্তু জীবনসংগ্রামের বাইরে কোনো ব্যাপারে মনঃসংযোগের মতো সময়ের বিশেষ অভাব। আমার তখন একমাত্র চিন্তা কেমন করে আমি সমস্ত বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে মায়ের হাতে আরও

কয়েকটা বাড়তি টাকা তুলে দিতে পারবো। সন্ধ্যেবেলাটা নিজের স্বার্থে নষ্ট করছি। ডিগ্রির নেশা না চাপলে প্রাইভেট টিউশনি অথবা পার্টটাইম চাকরি থেকে সংসারের জন্যে আরও কিছু টাকা রোজগার করা যেতো।

আমার পুরনো বন্ধু প্রণবেন্দু ব্যানার্জিও আমার সঙ্গেই কলেজে ঢুকেছিল। প্রণবেন্দুর বাড়ির অবস্থা ভাল। খেয়ালের বশে পড়াশোনার সঙ্গে তার যোগাযোগ অকালে ছিন্ন হয়েছিল। সে এবার শিং ভেঙে বাছুরের দলে যোগ দিয়েছে। নামের পাশে দুটো ইংরিজি শব্দ না থাকলে কেমন যেন বেমানান লাগে।

চাকরির নির্বাসনে বহু সময় ব্যয় করার পর এবার নতুন সুযোগ মিলেছে প্রণবেন্দুর। বিদ্যাস্থানে নববসন্তের সমস্ত সমারোহ সে উপভোগ করতে চায়।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যে প্রণবেন্দু অনেক সহপাঠিনীর বিস্তারিত পরিচয় সংগ্রহ করে ফেলেছে। এইসব তনয়াদের সে এতো সহজে কী করে জেনে ফেললো সেইটাই আশ্চর্য। .যেমন প্রণবেন্দুই আমাকে খবর দিলো, "ওই যে মানসী রায়চৌধুরী, দেখছো—মিষ্টি চেহারা, মিষ্টি হাসি, আকর্ষণীয়া মহিলা... ।"

আমি প্রণবেন্দুর দৃষ্টি ব্যাকরণের প্রতি আকর্ষণ করলাম। "আকর্ষণীয়া কথাটির অপপ্রয়োগ হচ্ছে আজকাল। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করে দেখো। যা আকর্ষণের যোগ্যা তাই আকর্ষণীয়া। তুমি নিশ্চয় মানসী সম্বন্ধে যা বলতে চাও তা হলো মানসী রায়চৌধুরী অন্যকে আকর্ষণ করেন, সেক্ষেত্রে শব্দটা হবে আকর্ষিকা।"

হো-হো করে হাসলো প্রণবেন্দু। "রাখো তোমার বাংলার মারপ্যাঁচ। তুমি কী বলতে চাও মানসীর মতো সুশরীরিণী মহিলা আকর্ষণের যোগ্যা নয়?"

"ব্রাদার, তুমি উল্টো চাপ দিচ্ছো।" আমি এবার প্রণবেন্দুকে সামলাবার চেষ্টা করি।

সে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বললো, "অতো পিউরিটান হলে আজকাল মেয়েদের সঙ্গে মেশা যায় না। বিশেষ করে, এই রাত কলেজে। এখানে ব্যাপারটা একটু আলাদা। এখানে ছাত্র-ছাত্রীভাব আছে, অথচ কেউ নাবালিকা নয়। রুজিরোজগার ক'রে কমবয়সী ছেলে এবং মেয়েরা এখানে ভবিষ্যতের ভিত গড়তে এসেছে। নিজের পয়সায় পড়া তো, তাই ব্যাপারটা বেশ আলাদা।"

প্রণবেন্দু নিজেই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলো। কলেজে যে-মাইনেটা দিচ্ছে সবাই তার উশুল চায়। আমি ছাড়া এখানে কেউ ঠকতে রাজি নয়!"

"ঠকবার প্রশ্ন উঠছে কেন এখানে?"

প্রণবেন্দু উত্তর দিলো, "শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকেই আমি আনন্দ পাচ্ছি। পরীক্ষার সিলেবাস-সমুদ্রে আমি ডুবে থাকতে চাই না।"

প্রণবেন্দু ওসব কথা বলতে পারে। পয়সাওয়ালা যৌথপরিবারে তার বসবাস। মাইনে থেকে এক পয়সাও সংসার খরচের জন্যে তাকে দিতে হয় না।

আমি বললাম, "কে জিতলো, কে ঠকলো সে তো ঠিক হতে এখনও অনেক দেরি। আমি এখন ভাই কোনো ব্যাপারে মাথা ঘামাতে পারছি না—সন্ধ্যেবেলায় দুটো টিউশনি হাতছাড়া হয়ে গেল। বেসরকারি অফিসে বি-এ পাস করলেও তো একটা ইনক্রিমেন্ট হবে না!"

প্রণবেন্দু জানে, আত্মরক্ষা এবং আত্মোন্নয়ন ছাড়া আমার সামনে আর কোনো কাজ নেই। অন্য কোনোদিকে কৌতূহল প্রকাশ করার অবকাশ নেই আমার। প্রণবেন্দুর অবশ্য মায়া আছে আমার ওপর। সে বলে, "চেষ্টা চালিয়ে যাও ব্রাদার, একদিন নিশ্চয় ভগবান মুখ তুলে তাকাবেন।"

হয়তো ঈশ্বর একদিন সত্যিই আমার দিকে তাকাবেন, কিন্তু এখন আমাকে সশ্রম কারাদণ্ডের মধ্যে রেখেছেন তিনি। মধ্যিখানে দু'দিন অফিসে কিছু ওভারটাইমের সুযোগ পাওয়ায় কলেজে আসিনি। আমি শ্যাম ও কুল দুই রাখতে আগ্রহী।

প্রণবেন্দু আমাকে অবাক করে দিয়েছে। সে বলেছে, "তোমাকে দু'দিন না দেখতে পেয়েই মহিলা-মহলে কথা উঠেছে। মানসী রায়চৌধুরী জিজ্ঞেস করেছে, "কী হলো আপনার বন্ধুর? অসুখে পড়লেন নাকি?"

"অসুখ নিশ্চয় নয়। সকালে টগবগিয়ে অফিসে ঢুকতে দেখেছি। তবে না-আসার নিশ্চয় কারণ আছে। ও তো এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করার পাত্র নয়!"

প্রণবেন্দু আমাকে মস্ত সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছে, যা আমার প্রাপ্য নয়। আমি অনুযোগ করেছি, "কেন তুমি বাড়িয়ে বলো? জানোই তো, আমার আরও অনেক কাজ করার ইচ্ছে, কিন্তু শরীরে বয় না। এই শরীরকে খাটিয়েই কাজের লোকরা অনেক কাজ তুলে নেয়, অথচ আমি পারি না।"

প্রণবেন্দু হাসে। "যখন দেখি, মহিলা মহল তোমার খবর জানতে আগ্রহী তখন আমি কেন বাদ সাধবো? ওদের ধারণা, তুমি একটি ভাল মানুষ।"

এসব কথা শুনলে কার না আনন্দ হয়! কিন্তু এগোবার সম্ভাবনা নেই আমার। আমার হাতে এখন অনেক কাজ। আমাকে সংসারের দায়িত্ব পালন করতে হবে, আমাকে নামের পাশে বি-এ লিখতে হবে এবং সেই সঙ্গে চালিয়ে যেতে হবে লেখক হবার প্রচেষ্টা। কেন যে এই নেশা হঠাৎ ঘাড়ে চেপে বসলো! গরিবের ঘোড়ারোগ একেই বলে! লেখার পিছনে অনেক সময় নষ্ট করতে হয়, অথচ এর থেকে অনেক কম সময়ে কয়েকটা প্রাইভেট টিউশনির দায়িত্ব সেরে নেওয়া যায়।

মধ্যিখানে হঠাৎ মাথায় একটা গল্পের প্লট এসে গেল। দু'দিন কলেজ কামাই করে

গল্পটা মাথা থেকে নামাতেই হলো। প্রণবেন্দু ভেবেছিল, শরীর খারাপ। কিন্তু ওকে মিথ্যে কথা বলিনি। ওইটাই হলো কাল।

প্রমীলা মহলে খবরটা রটতে বেশি দেরি হলো না। প্রণবেন্দু আবার রঙ চড়িয়েছে। "লেখার নেশা চাপলে বেচারার পাগলের মতো অবস্থা হয়। যতক্ষণ না গল্পটা মাথা থেকে নামাতে পারছে ততক্ষণ শান্তি পায় না।"

আমার নাকি সারাক্ষণ মাথা ধরে থাকে, প্রণবেন্দু রিপোর্ট দিয়েছে যথাস্থানে।

এরপর মানসী রায়চৌধুরীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে রাত কলেজের করিডরে। মানসী বলেছে, "আপনি তো বেশ লোক! আপনি যে গল্প লেখেন তা তো আগে বলেননি।"

এতে আর বলবার কী আছে? কিন্তু মানসীর কথায় বেশ লজ্জা পেয়ে গিয়েছি।

প্রণবেন্দুকে পাকড়াও করেছি আমি। "সব কথা প্রমীলা মহলে রিপোর্ট করবার কী প্রয়োজন?"

প্রণবেন্দু উত্তর দিয়েছে, "নিজে যদি লিখতে পারতাম তা হলে তোমার নাম মুখেও আনতাম না। তুমি ওই মানসী রায়চৌধুরীকে নিয়েও একটা গল্প লিখতে পারো। ভদ্রমহিলা বিধবা।"

ওঁকে বিধবা বলে কখনও মনে হয়নি। বেশবাস সাজসজ্জায় কোথাও বৈধব্যের বৈরাগ্য-লক্ষণ [illegible] প্রসন্ন মধুর হাসিটি লেগে আছে।

প্রণবেন্দু জানালো, "খুবই দুঃখের ঘটনা। স্বামী হঠাৎ একদিন ট্রেন থেকে পড়ে স্টেশনেই মারা গেলেন। আত্মহত্যা না দুর্ঘটনা ঠিক বোঝা গেল না। বোধ হয় দুর্ঘটনাই, কিন্তু মানসী রায়চৌধুরীর মনের মধ্যে কেমন যেন ধারণা হয়ে আছে, ব্যাপারটা আত্মহত্যাও হতে পারে! নমিতা ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে, এরকম কোনো ধারণা মনের মধ্যে রাখা উচিত নয়।"

বলা বাহুল্য, নমিতা [illegible]র্জির সঙ্গে প্রণবেন্দুর কী সম্পর্ক হতে পারে তা আপনারা নিশ্চয় আন্দাজ করতে পারছেন। কিন্তু সে ব্যাপারে পরে আসা যাবে।

প্রণবেন্দুর গর্ব প্রমীলা মহলের কোনো খবর জানা তার পক্ষে কিছুই নয়। "তোমার যদি কোনো মেয়েকে ভাল লেগে যায়, তার সম্বন্ধে গল্প লিখতে ইচ্ছে করে, আমাকে বলবে। সমস্ত হাঁড়ির খবর আধঘন্টার নোটিসে পেয়ে যাবে।"

আমি বলি, "প্রণবেন্দু, যেসব মেয়ে কলকাতার এই জনজঙ্গল ভেদ করে রাতে পড়তে এসেছে তাদের অশেষ সহ্যশক্তি। তাদের জন্য আমার মায়া হয়। ওরা সবাই সসম্মানে বি-এ পাস করুক, সেটাই একটা গল্প হয়ে যাবে। মানুষ এতো কষ্ট করে, নিজেদের কাজকর্ম বজায় রেখে, রোজগার করতে করতে পরীক্ষাসমুদ্র পেরিয়েছে, এটাই তো মস্ত ঘটনা।"

প্রণবেন্দু অভিযোগ করেছে, "সব ব্যাপারকে করুণ করে তুলতে তোমার জুড়ি

নেই। কষ্টের মধ্যেও যে যথেষ্ট আনন্দ আছে তা বান্ধবীদের সঙ্গে গল্প করলেই বুঝতে পারবে।"

প্রণবেন্দু হয়তো সত্যি কথাই বলছে। কিন্তু আমি এখন প্রণবেন্দুর মতো সমস্ত দায়দায়িত্ব থেকে হাল্কা হয়ে নমিতা চ্যাটার্জিদের সঙ্গে গল্পগুজবে মত্ত হতে পারবো না। ওসব প্রণবেন্দুকেই মানায়, কারণ ওকে বাড়িতে সংসার খরচের টাকা দিতে হয় না।

ঠিক সেই সময় দৈনিক কাগজের রবিবাসরীয়তে আমার একটা গল্প বেরিয়েছে। মানসী রায়চৌধুরীর সঙ্গে কলেজের করিডরে আবার দেখা হয়ে গিয়েছে। একটা ক্লাশরুম খালি হয়ে যাবার অপেক্ষায় আমরা সকলে দাঁড়িয়ে আছি। মানসী রায়চৌধুরী নিজেই বললো, "আপনার হাতটা মিষ্টি। লেখাটা বেশ টানে।"

খুব আনন্দ হলো, সেই সঙ্গে লজ্জা। ছদ্মনামে লেখার একটা সুবিধে, নিজে নিশ্চিন্তে থাকা যায়, প্রশংসা অথবা নিন্দা কোনোটাই নগদ গ্রহণ করতে হয় না। কিন্তু প্রণবেন্দুর উৎসাহে ঐ সুখটুকু আমার কপালে সহ্য হলো না।

প্রণবেন্দু কিন্তু নিজের কোনো দোষ খুঁজে পায় না। "তুমি অত কষ্ট করে রাত জেগে গল্প লিখবে, আর আমি তার প্রচার করবো না, তা কখনও হয়?"

লেখাটা নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত বিলাসিতা। নিজের দুঃখ ভুলবার জন্যে আমি লিখি। "প্রণবেন্দু, লেখা সম্বন্ধে কেউ কিছু বললে আমি ভীষণ অস্বস্তি বোধ করি।"

প্রণবেন্দু হেসে উড়িয়ে দিয়েছে আমার কথা। "লেখাটা হলো পাবলিক প্রপার্টি। ছাপার অক্ষরে কিছু প্রকাশ হওয়া মানেই তুমি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাছে আবেদন পত্র পাঠিয়েছো। তোমার ভাগ্যে পুরস্কার অথবা তিরস্কার কিছু একটা জুটবেই।"

এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্যেই তো আমি ছদ্মনাম বেছে নিয়েছি। স্বনামধন্য হবার কোনো স্বপ্নই নেই আমার বুকের মধ্যে। কিন্তু প্রণবেন্দু ওই সূক্ষ্ম পার্থক্য বোঝে না। সে এবার নমিতা চ্যাটার্জিকে 'কোট' করলো, "ছদ্মনামের বোরখা পরলেও পাঠকরা তোমাকে খুঁজে বার করবেই।"

প্রণবেন্দুর ধারণা, স্রেফ কৌতূহল বাড়ানোর জন্যেই অনেকে ছদ্মনামের আশ্রয় নেয়। নমিতা মেয়েটি শুনেছি ভীষণ নরম। সে নিশ্চয় আমার সম্বন্ধে অমন অন্যায় সন্দেহ পোষণ করবে না।

"আমার অনেক যন্ত্রণা, প্রণবেন্দু। আমি নিজের জন্যে একটু স্বাধীনতা চাই আমার নিজস্ব সৃষ্টির সাম্রাজ্যে। আমার সমস্ত দুঃখ এবং ব্যর্থতা ভুলবার জন্যে কলম ধরে আমি কিছুক্ষণের রাজা হতে চাই।"

প্রণবেন্দু আমার কথা শুনলো, কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বোধ হয় বুঝতে পারলো না।

ওকে বেশি আক্রমণ করে লাভ নেই। মনের দুঃখে প্রণবেন্দু এখনই নমিতা চ্যাটার্জির সঙ্গে সবিস্তারিত আলোচনায় বসে যাবে। তারপর কয়েক ঘন্টার মধ্যে প্রতিটা কথা প্রমীলা মহলে ছড়িয়ে পড়বে। কেউ আমার মতো একজন অখ্যাত লেখকের দুঃখ বুঝবে না, বরং আমাকে নিয়ে সবাই হাসাহাসি করবে। "নাচতে নেমে ঘোমটায় মুখ ঢাকবার চেষ্টার অর্থ হয় না," প্রণবেন্দু নিজেই একবার আমাকে বলেছিল।

আমি এই সময় দু'দিন আবার অনুপস্থিত হয়েছিলাম। আমাকে অফিসে পাকড়াও করে প্রণবেন্দু জানতে চেয়েছে, "কী হলো তোমার ? কয়েকজন মহিলার তো তোমার জন্যে খুব চিন্তা ! নমিতাকে তো তারা জ্বালিয়ে খাচ্ছে। জানতে চাইছে, লেখক কোথায় ?"

আমি এবার কোনো হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়তে চাই না। প্রণবেন্দুর টিপ্পনী : "অতগুলো আকর্ষিকার মায়া কাটিয়ে তুমি কেমন করে ক্লাশে অ্যাবসেন্ট হও ? রতন মজুমদার অফিসে ছুটি নিয়েছে, কিন্তু ক্লাশে চলে আসছে নিয়মিত। আর তুমি অফিসে এসেও, ক্লাশে হাজির হচ্ছো না। প্রমীলারা যদি একবার অভিমান করে তা হলে বুঝবে মজা।"

প্রণবেন্দুর রসবোধ ইদানীং নমিতা-সান্নিধ্যে বেড়েই চলেছে। আমি নিজের যন্ত্রণায় নিজেই অস্থির হয়ে রয়েছি। আমি এবার ওভারটাইমের লোভে কলেজ কামাই করিনি। একটা গল্প মাথায় এসে গিয়েছিল। তাকে মুক্তি দিতে হলো মস্তিষ্ক থেকে। কিন্তু সে-কথা প্রণবেন্দুকে বলে লাভ নেই, এখনই প্রচার করে দেবে। আমি মুশকিলে পড়ে যাবো, কারণ গল্পটা সম্পাদক আদৌ তাঁর কাগজে ছাপবেন কি না তা আমার জানা নেই।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে গল্পটা এবার দ্রুত প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদকের পাণ্ডুলিপির ভাণ্ডার পরিপূর্ণ না থাকলে অনেক সময় অপরিচিত লেখকদের ভাগ্য খুলে যায়।

সেই গল্প যে আমার সহপাঠিনী মহলে বিশেষ ঔৎসুক্য জাগাবে তা আমি ভাবিনি। আমার সহপাঠিনীদের এতো কাজকর্ম, বাড়ি থেকে কর্মক্ষেত্র, সেখান থেকে কলেজ এবং কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার এতো হাঙ্গামা, সংসারেও হাজার রকম দায়িত্বের বোঝা। সুতরাং আমার ধারণা ছিল এরা রবিবারে প্রকাশিত গল্প পড়ার সময় পাবে না। কিন্তু সোমবারেই নগদ ফল পাওয়া গেল। লাস্ট ক্লাশের পর পায়ে হেঁটে বাস স্ট্যান্ডে আসতে আসতে প্রণবেন্দুর প্রশ্ন : "তুমি কি মানসী রায়চৌধুরীকে নিয়েই এবারের গল্পটা লিখলে ?"

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। মানসী রায়চৌধুরীর সম্বন্ধে আমি কতটুকু জানি ?

প্রণবেন্দু বললো, "তোমার নায়িকা কমপ্যাশনেট গ্রাউন্ডে মৃত স্বামীর অফিসে

চাকরি পেয়েছে। মানসীরও তাই। তোমার নায়িকা যন্ত্রণা বোধ করছে এই কারণে যে, স্বামী তাকে সত্যিই ভালবাসতো কি না ! ভালবাসাটা যদি মিথ্যা হয়, তা হলে সেই সম্পর্ক ভাঙিয়ে স্বামীর অফিসে চাকরি নেওয়াটা একধরনের লোক ঠকানো কি না ! তুমি লাস্টে দেখিয়েছো, যেদিন সে অকাট্য প্রমাণ পেলো স্বামী তাকে ভালবাসতো না, সেদিন সে চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেল। ফর ইওর ইনফরমেশন, মানসী রায়চৌধুরী কেন পড়াশোনা করতে আবার কলেজে এসেছে ? বি-এ ডিগ্রি পেলে সে স্বামীর অফিসের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে অন্য একটা কিছু করবে।"

আমি তো শুনে তাজ্জব। প্রণবেন্দুর খবর, "মানসী খুব আপসেট গল্পটা পড়ে—ও ভাবছে নমিতার মাধ্যমে আমিই তোমাকে গল্পটা বলেছি।"

"তুমি তো আমাকে গল্প বলোনি প্রণবেন্দু। আমি নমিতার সঙ্গেও কথা বলার সুযোগ পাই না। কলেজ শেষ হবার আগেই তুমি ওকে নিয়ে হুস করে চলে যাও। আমি, আমাদের পাড়ার মিলিকে নিয়ে গল্পটা লিখেছি। অকালে মৃত মিলির স্বামীর অফিসে চাকরিতে ঢুকে বেচারা হঠাৎ প্রেমে পড়লো। কমপ্যাশনেট গ্রাউন্ডে চাকরিতে ঢোকা বিধবার জীবনে প্রেম মানায় না। যে প্রেম করছে সে চায় মিলি চাকরিটা রাখুক, কিন্তু মিলির মনে হয় সেটা ঠিক নয়। সে যদি কাউকে ভালবেসে থাকে, তা হলে কমপ্যাশনেট গ্রাউন্ডের চাকরি থেকে তার ইস্তফা দেওয়া প্রয়োজন।"

প্রণবেন্দু তখন আর কিছু বলেনি। আসলে সে নমিতা চ্যাটার্জির সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করতে চায়। নমিতা চ্যাটার্জির পরামর্শ ছাড়া প্রণবেন্দু এখন এক পাও এগোতে পারে না।

আমি কিন্তু ভীষণ লজ্জা বোধ করেছিলাম। নমিতা চ্যাটার্জির সঙ্গে আমার কথাবার্তার কোনো সুযোগই নেই। আমার বন্ধু প্রণবেন্দু এবং নমিতা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত আছে। আমার কল্পনা খাটিয়ে, কলেজ কামাই করে আমি একটা গল্প লিখলাম, আর আমারই একজন সহপাঠিনী ভেবে বসলো, আমি তার গভীর দুঃখের জায়গায় হাত দিয়ে বসেছি !

আমি প্রণবেন্দুকে বলেছি, "কেউ আঘাত পেলে আমার ভীষণ কষ্ট হয়, প্রণবেন্দু। একজন অখ্যাত লেখক রবিবারের কাগজে কী লিখলো তাতে কারও কিছু যায় আসে না। মানসী রায়চৌধুরী যেন আমাকে ক্ষমা করেন। তুমি তো জানো, ওঁর গল্পটা আমার জানা নেই।"

আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি কখনও আমার সহপাঠী বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে কোনো গল্প লিখবো না। বিশ্বসংসারে অনেক গল্পের প্লট ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাকে কখনও বন্ধু-বান্ধবের ঘটনার ওপর নির্ভর করতে হবে না।

কিন্তু এবারেও আমার নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ পাওয়া গেল। কী কুক্ষণে যে প্রণবেন্দুকে বলতে গিয়েছি, "তুমি নমিতা চ্যাটার্জির মন পাবার জন্যে যত খুশি চেষ্টা করো, কিন্তু

ভাই ওইসব গল্প আমাকে বোলো না। আমি কখনও বন্ধু অথবা বান্ধবীদের নিয়ে গল্প লেখার চেষ্টা করবো না।"

প্রণবেন্দু কয়েকদিন পরেই আমাকে পাকড়াও করেছে। বলেছে, "তোমার ডিসিশনের কথা বলতে গিয়ে নমিতার কাছে আমি খুব বকুনি খেলাম। আমার ভাই খুব ইচ্ছে, যদি নমিতার মন পাই তা হলে একদিন তোমাকে আমাদের গল্পটা লিখতেই হবে। নমিতার সঙ্গে আমি এই শনিবারে একটু আউটিংয়ে যাচ্ছি।"

আমি একবার ভাবলাম বলি, "প্রণবেন্দু, যে-কাজের জন্যে আমরা এই রাত কলেজে এসেছি সে-কাজের ওপর মন দেওয়া যাক।"

কিন্তু সে-কথা কে প্রণবেন্দুর কানে তোলে? প্রণবেন্দু স্বীকার করছে, একটু প্রাইভেসির জন্যে তারা হাঁপিয়ে উঠেছে। প্রণবেন্দু স্বীকার করছে "কী ছিল বিধাতার মনে! না-হলে এতোদিন পরে তুমি আমাকে এই রাত কলেজে কেন টেনে আনবে?"

আমি নিরুত্তর, কারণ দোষটা সত্যিই আমার। প্রণবেন্দুর নিজের এখানে আসার তেমন ইচ্ছে ছিল না। আমিই জোর করেছিলাম।

প্রণবেন্দু বললো, "আমি প্রথম দিকে একটা টান অনুভব করছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। একদিন নমিতা কলেজে না আসায় পরের দিন ওর অফিসে ফোন করেছিলাম। প্রথম একটু-আধটু ভয়-ভয় করছিল, হঠাৎ একসেপশন নিয়ে না বসে। মেয়েদের মন বোঝা ভার। কিন্তু দেখলাম, শুধু-শুধু ভয় পাচ্ছিলাম। টেলিফোন পেয়ে নমিতা মোটেই রাগ করলো না। শুধু জানতে চাইলো, কেমন করে আমি ফোন নম্বর যোগাড় করলাম। আমি মজা করে বললাম, 'হয়ার দেয়ার ইজ এ উইল, দেয়ার ইজ এ ওয়ে।' নমিতা ভীষণ স্মার্ট, বললো, 'ওমা! আপনার বন্ধুই তো এবারে গল্পে উল্টো কথা লিখেছে : 'হয়ার দেয়ার ইজ এ ওয়ে, দেয়ার ইজ এ উইল!'

প্রণবেন্দু তখন বলেছে, "আমার বন্ধু মানুষের সততায় অবিশ্বাসী হয়ে যাচ্ছে! ওর ধারণা, দরজা দেখলেই মেয়ে মানুষের ঢোকবার ইচ্ছে হয়।"

আমি বললাম, "আমি সিনিক নই, প্রণবেন্দু। আমার চরিত্র, যাকে নিয়ে গল্প লিখেছি, সে সিনিক। ইচ্ছে থেকে সুযোগ, না সুযোগ থেকে ইচ্ছে—এই ব্যাপারটা সে পরিষ্কার বুঝে উঠতে পারছে না।"

প্রণবেন্দুর মাথায় ওইসব সূক্ষ্মতত্ত্ব এখন ঢুকবে না। সে তার রঙিন অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় মত্ত হয়ে রয়েছে।

প্রণবেন্দু জানালো, "পরের দিনই রিটার্ন ফোন পেয়েছি। নমিতা চ্যাটার্জি বলছে, 'ওমা, আমাকে শাসানি দিয়ে কলেজে নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি আপনি নিজেই অ্যাবসেন্ট।' আমি ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেলাম—একটা সিনেমা দেখতে চলে গিয়েছিলাম।"

এই অনুরাগলীলার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ শুনতে আমি উৎসাহী নই। প্রণবেন্দুর য়স হয়েছে এবং নমিতাও সাবালিকা, দু'জনেই অফিসে কাজ করে, সুতরাং তারা ভাল মনে করবে তাই করবে।

কিন্তু প্রণবেন্দু ছাড়বে না। তার সাফল্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস একজনকে না নিয়ে সে বোধ হয় স্বস্তি পাচ্ছে না।

আমি কোথায় কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর অধ্যাপক মৈত্রের নোট থেকে লিখে নেবার ষ্টা করছি, আর প্রণবেন্দু বলছে, "পরীক্ষা এখনও অনেক দূর।"

পরীক্ষা হয়তো সত্যিই দূর। প্রণবেন্দুর ভাষায় ষষ্ঠীর দিন বিজয়া দশমীর কথা াবতে নেই। কিন্তু আমি জানি, যারা চাকরি করে, রাত কলেজে পড়ে, তারা সময়ের খারি—দেখতে-দেখতে পরীক্ষা এসে যাবে এবং তখন দুঃখের শেষ থাকবে না।

প্রণবেন্দুর সেই এক কথা "কৃপণ দোকানীও অত হিসেবী হয় না। প্রাণ খুলে য সময় খরচ করতে পারে না ভগবান তাকে দু'হাত তুলে সময় দেন না।"

প্রণবেন্দু আমাকে জোর করেই চায়ের দোকানে নিয়ে গেল। তারপর শোনালো, নমিতা তোমার প্রসংসায় পঞ্চমুখ। ও তোমার প্রায় সমস্ত লেখা পড়েছে।"

"ও" শব্দটা একটু রহস্যময় ঠেকলো। এই সামান্য ক'দিনের পরিচিতিতে "সে" ব্দটাই সৌজন্যমূলক ছিল। আমরা তখনও "তুই"-এর যুগে পৌঁছইনি। রাত কলেজে য়েদের আমরা "আপনি" বলতাম এবং অন্য ছাত্রদেরও।

"ও" নামক মহিলাটির পরবর্তী মন্তব্যও প্রণবেন্দু আমাকে শুনিয়ে দিলো। নমিতা াটার্জি বলেছে, আমার উচিত কলেজে সময় অপচয় না-করে সারাক্ষণ মন দিয়ে লখা।

কথাটা শুনে আনন্দও হচ্ছে, দুঃখও হচ্ছে। যতটুকু সময় আছে তা লেখায় নিয়োগ রলে সত্যিই ভাল হতো। কিন্তু পরীক্ষায় পাস করাটাও জরুরী হয়ে উঠেছে। প্রণবেন্দু লো, "আমি তোমার চরিত্রটা ওর কাছে এক্সপ্লেন করেছি।"

"প্রেমের ফার্স্ট রাউন্ডে পরস্পরকে পরস্পরের কাছে এক্সপ্লেন করো উইথ ফারেন্স টু দ্য কনটেকস্ট! এর মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তিকে টেনে আনা কেন?"

প্রণবেন্দুটা এই ক'সপ্তাহেই নমিতাসান্নিধ্যে বেশ তুখোড় হয়ে উঠেছে। সে হেসে লো, "পরচর্চাটাই তো প্রেমের ম্যাচিওরিটির লক্ষণ, তুমি নিজেই তো গতবারের ল্পে লিখেছো!"

এবার আমার মতো অভাজনের চরিত্রব্যাখ্যা। প্রণবেন্দু জানালো, "আমি ওকে লেছি, আমার বন্ধুর মধ্যে পিক্যুলিয়র একগুঁয়েমি আছে। যা হাতে নেবে তাতেই ফল হতে চায়। বি-এ পরীক্ষাতেও ও ভাল করবার সুযোগ ছাড়বে না।"

আমি প্রথমে চুপ করে রইলাম। তারপর মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। "যে-াজে মন দেবে না সে কাজ হাতে নেবে না।"

প্রণবেন্দু আমার মন খারাপ করে দিলো। নমিতা চ্যাটার্জি ওকে জব্বর একা কথা শুনিয়েছে। "লেখকের কাজ লেখক হওয়া। শরৎচন্দ্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র; এঁরা বি এ পাস কি না এ-কথা বাংলাদেশের কেউ জিজ্ঞেস করে না। আবার কত মহাপণ্ডি এম-এ, পি-এইচ-ডির গল্প উল্টে দেখে না।"

নমিতার কথাগুলো আমার মনে গেঁথে গিয়েছে। কিন্তু লেখক হওয়া আমা কপালে আছে এ-কথাই বা কিসের জোরে বলি ? নিজের সময় খরচ করে, বানিয়ে বানিয়ে কিছু লেখা এক ধরনের বিলাসিতা। কোনো স্বীকৃতিই কপালে জুটলো ন হয়তো। অথচ বি-এ পাসের সার্টিফিকেটটা মায়া মরীচিকা নয়। মিসেস আইলী রায় বলেছেন, সময় থাকতে থাকতে ওটা পাকড়াও করতে পারলে অনেক দুঃখে অবসান ঘটবে।

প্রণবেন্দু এবার আমাকে চায়ের দোকানে নিয়ে গিয়েছে। দুর্দান্ত এক অ্যাডভেঞ্চারে কথা কাউকে না-বলা পর্যন্ত সে স্বস্তি পাচ্ছে না। গতকাল লাস্ট ক্লাশে ওকে দে যায়নি।

"আমাকেই শুধু ধরলে ! নমিতাকেও যে শেষ ক্লাশে দেখা গেল না সে-কথা ে বললে না !" প্রণবেন্দু একেবারে ছোট ছেলের মতো পাল্টা অভিযোগ করলো।

পরিচিত বন্ধুদেরই আমি শাসন করি, মেয়েদের চলাচলের ওপর আমি নজর রা না। পড়াশোনার ব্যাপারে মেয়েরা যে বেশি দায়িত্বশীল তা ক্লাশের সব অধ্যাপব জানেন।

প্রণবেন্দু বললো, "নমিতাই বলেছিল শেষ ক্লাশটা সে করবে না, আর দোষ হ গেল আমার। আমি শুধু ভাবলাম, একদিন ওকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।"

আমি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম, আরও একটা ক্লাশ পরে নমিতাকে এগিয়ে দিয়ে আসলে কোনো ক্ষতি হতো না। এখানে কেউ অপ্রাপ্তবয়স্ক নেই, যাকে যে খুশি এগিয়ে দিয়ে আসতে পারে।

প্রণবেন্দু এবার মৃদু আক্রমণ করলো। "মেয়েদের সম্বন্ধে এই জ্ঞান নিয়ে তুমি কী করে বাংলা গল্প-লেখক হবে ? মেয়েরা সব কিছুই করতে চায়, কিন্তু একটু চুপি চুপি। যদি শেষ ক্লাশের পরে আমরা দু'জনে একসঙ্গে বেরোতাম তা হলে দুনিয়াসু সবাই আমাদের দেখতে পেতো।"

এই দিকটা যে সত্যিই আমার মাথায় ঢোকেনি তা আমাকে স্বীকার করতে হলো পরিস্থিতির চাপে পড়ে প্রণবেন্দু এখন বেশ বুদ্ধিদীপ্ত হয়ে উঠেছে।

"অ্যানাদার পয়েন্ট !" প্রণবেন্দুর সংযোজন। "ঐ প্রতিমা বিশ্বাস ছিনে জোঁকে মতো নমিতার সঙ্গে লেগে থাকতো। একই বাসে দু'জনে উঠবে। সেখানে আমাে দেখা গেলে রক্ষে নেই। সুইট অ্যান্ড সাওয়ার স্টোরি কয়েক ঘন্টার মধ্যে ছাত্র ছাত্রীমহলে ছড়িয়ে পড়বে। শুনে রাখো, বন্ধুত্বের ব্যাপারে মেয়েরা একটু হিংসুটে হয়

[ত]োমার গল্পে মেয়েদের অতো মাথায় তুলো না। সারাক্ষণ মনে রাখবে, ওরা একটু [দুর্ব]ল, ওরা একটু অনগ্রসর।"

আমার মাকে দেখে তো সে-কথা কখনও মনে হয় না। চরম দুঃখের মধ্যেও [বি]পুল শক্তি নিয়ে দশভুজার মতো তিনি সন্তানদের প্রতিপালন করছেন, দুর্বলতার [কো]নো চিহ্ন নেই কোথাও।

প্রণবেন্দু বললো, "শুধু মায়ের কথা লিখে কেউ বাংলা সাহিত্যে নাম করতে [পা]রেনি। তোমাকে প্রেমের কথাও লিখতে হবে, যদি তুমি রাইটিং থেকে টু-পাইস [ক]রতে চাও।"

"না ভাই, টু-পাইস করবার জন্যে ওভারটাইম আছে, টিউশনি আছে, পার্ট-টাইম [চা]করি আছে। লেখাটা আমার একমাত্র বিলাসিতা। আমার মনের মধ্যে যতো অপূর্ণ [আ]ত্যাশা আছে, যতো চাপা দুঃখ আছে, যতো অপ্রকাশিত ভালবাসা আছে, তাদের [মু]ক্তি দেবার জন্যেই আমি লিখে থাকি।" আমার বাড়িতে তখন ইলেকট্রিকের আলো [ন]েই। তবু হ্যারিকেন জ্বালিয়ে আমি মনের মধ্যে বন্দী চিন্তাগুলোকে মুক্তি দিই।

"মেয়েদের তুমি হয়তো একদিন ঠকাতে পারবে। তখন তোমার নাম হবে। বাঙালী [মে]য়েদের ওই একটা ভীষণ দুর্বলতা, ওটা বিশেষভাবে স্টাডি করো—প্রশংসা করলে [ও]রা গলে যায়। সেই জন্যেই তো একটা কথা আছে, ছেলেরা চোখে দেখে ভালবাসে, [আ]র মেয়েরা কানে শুনে ভালবাসে। মেয়েরা যে মিষ্টি কথার দাসী তা তুমি একটা [গ]ল্পে দেখাতে পারো।"

প্রেম নিয়ে গল্প লেখার কোনো ইচ্ছা যে বর্তমানে আমার নেই তা প্রণবেন্দু জানে। আমি মানুষের জীবনসংগ্রাম নিয়ে গল্প লিখতে চাই। প্রেম ছাড়াও আরও কত নাটক [র]য়েছে এই মানবসংসারে। বিপদকে পদানত করে কর্মকুরুক্ষেত্রে বিজয়ী হওয়াটাও [ক]ম কথা নয়। কত মানুষ সেই যুদ্ধের কথা শুনতে চায়। নাই বা জয় করলাম আমি [ত]রুণীদের মন, তাদের নিয়ে লিখবার জন্যে তো আরও কত লেখকই রয়েছেন।"

"তোমার কোনো প্রবলেম থাকবে না," প্রণবেন্দু আমাকে আশ্বাস দিলো। "সব [কি]ছু নিজে করে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে এমন কথা নেই। নমিতা এবং [তা]র বান্ধবীদের সব খবরাখবর আমি তোমাকে দিয়ে যাবো রিপোর্টারের মতন, আর [তু]মি নিউজ এডিটরের মতো টেবিলে বসে সেগুলো সাজিয়ে বাজিমাত্ করবে।"

প্রণবেন্দু এবার গত সন্ধ্যার কথা সবিস্তারে জানালো। একজন কারুর সঙ্গে না-[ব]লা পর্যন্ত-সে স্বস্তি পাচ্ছে না।

"আমি এবং নমিতা লাস্ট ক্লাশ শুরু হবার আগেই বেরিয়ে এসেছিলাম," প্রণবেন্দু [ব]ললো, "এক সঙ্গে বেরোইনি যাতে সবার নজরে না পড়ে যাই। নমিতা একটু আগে [বে]রিয়েছে, আমি একটু পরে। তুমি আমাকে চলে যেতে দেখেছো, নমিতাকে লক্ষ্য [ক]রোনি।"

"তার মানেই তোমাদের পরিকল্পনা সফল হয়েছে," আমি আগাম স্বীকৃতি জানাই
"শিয়ালদহের মোড়ে এসে দেখলাম নমিতা আমার জন্যেই অপেক্ষা করছে এক
ল্যাম্প-পোস্টের তলায়। ওর রুটের একটা বাস চলে গেল, আমি যদি আর এক
স্পীড দিতাম তা হলে ওই বাস হাতছাড়া হতো না।"

কিন্তু ঈশ্বর যা করেন তা মঙ্গলের জন্যেই। রাস্তায় নমিতাকে অস্বস্তিতে পড়
হচ্ছে না, কারণ জানাশোনা ছাত্র-ছাত্রীরা কেউ কাছে-পিঠে নেই।

"এই সময় আমি হঠাৎ একটা কাজ করে বসলাম।" প্রণবেন্দু আমার মুখের দি
তাকাচ্ছে, সে চাইছে আমি আন্দাজ করি প্রণবেন্দু গত রাত্রে কী করে বসলো।

আমি মাথা চুলকে বললাম, "নমিতাকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকলে ?"

"হলো না।" প্রণবেন্দু আমাকে আর একটা সুযোগ দিলো। এবার ভুল হলে চল
না। আমি বললাম, "নমিতাকে বাসে তুলে দিলে, কিন্তু নিজে উঠলে না।'

"তুমি কোনোদিন গল্পলেখক হতে পারবে না। হলেও প্রেমের দৃশ্যগুলো ম্যানে
করবার জন্যে তোমাকে আমার কাছে আসতে হবে।"

"হোয়াট অ্যাবাউট নমিতা ? ওকে কনসালট্যান্ট হিসেবে পাওয়া যাবে না ?

এবার প্রণবেন্দু একটু লজ্জা পেয়ে গেল। "ওকে পাবে পরামর্শদাত্রীরূপে, ত
আমার থ্রু দিয়ে। সরাসরি জিজ্ঞেস করলে ভীষণ লজ্জা পেয়ে যাবে। ও তো ব
বার বলেছে, কাউকে যেন আমি ব্যাপারটা কোনোদিন না বলি।"

"তা হলে তুমি বলো না, প্রণবেন্দু। ওর ইচ্ছের একটা মূল্য আছে।" আ
প্রণবেন্দুকে সাবধান করে দিই।

"তুমিও যেমন। নমিতাও নিশ্চয় কাউকে কিছু বলবার জন্যে ছটফট করছে
কিন্তু মেয়েদের মধ্যে হিংসে একটু বেশি।"

"কেন ? ক্লাশে মেয়েরা তো পরস্পর সম্বন্ধে অনেক বেশি খবরাখবর রাখে
আমরা ছেলেদের সম্বন্ধে অনেক খবর জানি না।"

"ওসব বাজে-বাজে খবর। আসল খবর অন্য মেয়েদের কাছে চেপে রাখতে ওদে
জুড়ি নেই। এই যে কাদম্বিনী...ওর অ্যাডভেঞ্চার..." প্রণবেন্দু এবার আমার মুখে
দিকে তাকালো।

আমি সত্যিই চাইছি, প্রণবেন্দু এবার একান্তে যদি নমিতা চ্যাটার্জির কোনো বিশে
অনুগ্রহ লাভ করে থাকে তবে সেটা ওদের মধ্যেই থাকুক।

কিন্তু প্রণবেন্দু বললো, "যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যে হয়। বাস স্ট্যা
দু'মিনিট দাঁড়িয়েছি, দেখি হাতের গোড়ায় এক সর্দারজীর ট্যাক্সি। হঠাৎ কী হলে
'ট্যাক্সি' বলে ডাকলাম, আর শ্রীমান সর্দারজী সুড়সুড় করে আমাদের সামনে এ
থেমে গেল।"

'সে এক ভীষণ পরিস্থিতি ব্রাদার !"

"ট্যাক্সি ডাকবার আগে নমিতার পারমিশন নিলে না?"

"উচিত ছিল," প্রণবেন্দু স্বীকার করছে। "কিন্তু কী যে হয়ে গেল। ট্যাক্সিওয়ালা ততক্ষণে পিছনের দরজা খুলে দিয়েছে।"

এবার প্রণবেন্দু বলেছে, "ভুল হয়ে গিয়েছে। যদি কোনো অসুবিধে থাকে, তা হলে ট্যাক্সির মিটার পেমেন্ট করে দিচ্ছি।"

কিন্তু অশেষ ভাগ্য প্রণবেন্দুর। নমিতা চ্যাটার্জি ট্যাক্সিতে উঠতে আপত্তি করেনি।

প্রণবেন্দু আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। "সেই রাত্রে কী যে হলো ব্রাদার, কেমন যেন নেশায় পড়ে গেলাম দু'জনে। ওর বাঁ-হাতটা আমার ডান হাতে লাগলো, কিছু আপত্তি করলো না নমিতা। তারপর দু'জনেরই বাক্‌শক্তি রহিত। নমিতার পাড়া এসে যাবে এবার। এই সময় একটা অন্যায় করে ফেলেছি ভাই।"

নমিতা চ্যাটার্জিকে ছোট্ট একটি চুম্বন করেছে প্রণবেন্দু ব্যানার্জি। নমিতা ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে, কোনো হৈ-চৈ বাধায়নি।

আমি এই সব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শুনতে মোটেই উৎসাহী নই। এইভাবে বিপদ ডেকে আনা যে যুক্তিযুক্ত নয় তা বোঝবার মতো বয়স প্রণবেন্দুর নিশ্চয় হয়েছে।

প্রণবেন্দু নিজেও বোধহয় ব্যাপারটা বুঝছে। সে বললো, "এইভাবে লাস্ট ক্লাশ ড্রপ করতে দিও না আমাকে।"

"প্রণবেন্দু, এই ট্যাক্সি-অ্যাডভেঞ্চার তুমি কবে থেকে প্ল্যান করে রেখেছিলে? এর থেকে কী বিপদ আসতে পারে তা নিশ্চয় তোমার অজানা নয়।"

প্রণবেন্দু আমার হাতটা চেপে ধরলো। "বিশ্বাস করো, কোনো আগাম পরিকল্পনা ছিল না। হতভাগা ট্যাক্সিটা কেন যে ওই সময় সামনে এসে দাঁড়ালো নিয়তির মতো।"

আমি প্রণবেন্দুর মুখের দিকে তাকাচ্ছি। প্রণবেন্দু জানালো, "আজ দুপুরে আমি নমিতাকে ফোন করেছিলাম। ও নিজেই ফোন ধরলো। আমি ক্ষমা চাইলাম। তোমার মতো নমিতার মনেও বোধ হয় কিছু সন্দেহ ছিল। আমি ওকেও একই কথা বললাম, ট্যাক্সিটা কোথা যে হঠাৎ এসে পড়লো।"

আমি আবার তাকাচ্ছি প্রণবেন্দুর দিকে। সে বললো, "আমার অশেষ সৌভাগ্য। নমিতা অপরাধটা তত সিরিয়াসলি নেয়নি। তবে রাত্রে যখন ওকে পাড়ার বাস স্ট্যান্ডে নামিয়ে দিলাম তখন চুপচাপ নেমে গেল, একটা গুড নাইটও জানালো না।"

"সেই গাড়ি ঘুরিয়েই আমি নিজের বাড়িতে চললাম। ভীষণ লজ্জা হলো, দুশ্চিন্তা হলো। কিন্তু যা করে ফেলেছি তার ওপর আমার কোনো হাত ছিল না," প্রণবেন্দু এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে গেল।

প্রণবেন্দু সম্বন্ধে আমার চিন্তা বাড়ছে। এইভাবে এগোলে সে পড়াশোনার সময় পাবে কখন? বেশ ছিল প্রণবেন্দু, আমি কেন যে ওকে কলেজে ঢোকবার পরামর্শ দিলাম!

একবার ভাবলাম, প্রণবেন্দুকে সাবধান করে দিই। কথায়-কথায় রাত্রে নমিতাকে এগিয়ে দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু আবার ভাবলাম, না চাইলে উপদেশ দেবার কোনো অর্থ হয় না। ওরা কেউ ছোট নয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে যখন কাদম্বিনী সিংহরায় সেবার হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দেবার প্রস্তাব দিলো এবং সে-দায়িত্ব আমার ওপর চাপলো তখন প্রণবেন্দু ও নমিতা খুব উৎসাহী হয়ে উঠলো।

আমি প্রণবেন্দুকে বলেছিলাম, "চলো একসঙ্গে যাওয়া যাক। কতক্ষণ আর সময় লাগবে ? তাছাড়া তোমার বাড়িতে ফোন রয়েছে। প্রয়োজন হলে হাওড়া থেকে ফোন করে দেওয়া যাবে।" কিন্তু প্রণবেন্দু কোনো উৎসাহ দেখালো না। সে বললো, "নমিতা ভীষণ রাগ করবে। ওকে আজ একটু এগিয়ে দেবো।"

পরের দিন অফিসেই প্রণবেন্দু আমাকে পাকড়াও করেছে। "কী ব্যাপার ব্রাদার ! একেবারে মুখে কুলুপ লাগিয়ে বসে আছো !"

"খুব ভোগান্তি হয়েছে ভাই। কাদম্বিনী একবার রিকশায় ওঠার উৎসাহ দেখালো, কিন্তু আমার সাহস হলো না।"

"ওমা ! রিকশাতেও ভয় ! তুমি ভীষণ পিউরিটান। তোমার কোএডুকেশন কলেজে আসাই উচিত হয়নি।"

"রিকশা তো নড়া চাই !" আমি বোঝাবার চেষ্টা করি। "সমস্ত হ্যারিসন রোড যেন জমে গিয়েছে। পায়ে হেঁটে যাওয়াই এক অসম্ভব কাজ !"

"তুমি একটি অপদার্থ ! সুযোগ কি আর রোজ আসে ?"

আমি বললাম, "ভগবানের আশীর্বাদে কোনো 'মেজর' গোলমাল ঘটেনি। কাদম্বিনী নিজেই পূরবী সিনেমার সামনে এক প্যাকেট বাদাম কিনলো। সেই বাদাম চিবোতে-চিবোতে আমরা দু'জন হ্যারিসন রোড পিছনে ফেলে রেখে, হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে, হাওড়া স্টেশনে হাজির হলাম।"

"কাদম্বিনী তোমায় কী বললে ?"

"অসংখ্য ধন্যবাদ দিলো। আমি বললাম, কাগজে কোনো বড় শোভাযাত্রার আগাম নোটিস থাকলে সেদিন আর কলেজে আসবেন না। বাড়িতে বসে পড়াশোনা করলে কোনো ক্ষতি নেই।"

"সমস্ত রাস্তা ধরে শুধু এইটুকু কথা হলো ? কাদম্বিনী কিছুই জিজ্ঞেস করলো না ?"

"জিজ্ঞেস করলো, আমি সব কিছু ছেড়েছুড়ে লিখছি না কেন ?"

আমি বললাম, "লিখলে তো পেট ভরবে না, অনেকগুলো নাবালক ভাইবোনকে মানুষ করতে হবে।"

প্রণবেন্দু তখনও প্রশ্ন চালিয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, "কাদম্বিনী আমার হাঁড়ির

খবর জেনে গিয়েছে। এই রাত কলেজে পড়াটাও যে আমার পক্ষে বিলাসিতা তা সে বুঝেছে। আমার লক্ষ্য কী তা সে জানতে চেয়েছে।"

"তুমি কী বললে?" জানতে চায় প্রণবেন্দু।

"যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা বি-এ পাসের রবার স্ট্যাম্প যোগাড় করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য তা কাদম্বিনী জেনে গিয়েছে। যার ঘাড়ে এতো দায়িত্ব সে এই মুহূর্তে জীবন থেকে আর কী প্রত্যাশা করতে পারে?"

খুব দুঃখ পেলো প্রণবেন্দু। "তুমি সত্যিই একটা অপদার্থ। নমিতা তোমাকে এসকর্ট হবার এমন একটা সুযোগ করে দিলো, তুমি তার ব্যবহার করতে পারলে না!"

আমি আবার প্রণবেন্দুর মুখের দিকে তাকাচ্ছি, সে বললো, "ব্যাপারটা খুব সোজা। নমিতা চায়, মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার একটু অভিজ্ঞতা বাড়ুক। তাতে তোমার লেখার ঝকঝকে ভাবটা বাড়বে। তাই কাদম্বিনী যখন ফিরে যাবার ব্যাপারে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করলো, তখন আরও দু'একটা নাম উঠেছিল। কিন্তু নমিতা তোমার নামটাই স্ট্রংলি রেকমেন্ড করলো। আলাপের একটা সূত্রপাত হবে। তা তুমি এতোই নীরস পাথর যে কাদম্বিনীর কেনা বাদাম-ভাজা চিবোতে-চিবোতে এতো বড় সুযোগটা নষ্ট করলে।"

আমি তখন কী আর বলি? "এতোই যখন শুভেচ্ছা, তখন গোড়াতেই একটু সাবধান করে দিলে পারতে।"

"তুমি যা চীজ! আগেই ভয় পেয়ে গেলে হয়তো কাদম্বিনীর সঙ্গে যেতেই রাজি হতে না তুমি।"

কথাটা মিথ্যা বলেনি প্রণবেন্দু। ওদের মনের কথা জানতে পারলে আমি অবশ্যই কাদম্বিনীর সঙ্গে যেতাম না। এরা কেন বোঝে না, আমার অনেক দায়িত্ব। বাবার মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে আমি মনে-মনে শপথ করেছি, আমি ভাইবোনদের মানুষ করে আমার মায়ের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলবো। আত্মরক্ষা ও আত্মোন্নতি ছাড়া আমার সামনে আর কোনো স্বপ্ন নেই। যতো আকর্ষণই থাক, অন্য কোনো ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার বিলাসিতা আমাকে মানায় না।

প্রণবেন্দু সম্বন্ধে আমার চিন্তা ছিল। কারণ ওর মা কিছুদিন ধরেই ছেলের জন্যে পাত্রী সন্ধান করছিলেন। আমার সঙ্গে তিনি দু'একবার উচ্চপর্যায়ে আলোচনা করেছেন। আমি প্রথমে বলতাম, "আগে বি-এ ডিগ্রিটা নিয়ে নিক। তখন ভাল পাত্রী পেতে আপনার সুবিধে হবে।"

প্রণবেন্দুর মা আমার সঙ্গে একমত হতেন না। "যারা বি-এ পাস করেনি, এ-দেশে কি তাদের বিয়ে হচ্ছে না? ও ভাল চাকরি করে, নিজেদের বাড়ি রয়েছে। একখানা গাড়িও রয়েছে সংসারে। ভগবানের আশীর্বাদে দিন-আনি দিন-খাই সংসার নয়। সুতরাং বিয়েতে আপত্তি কোথায়?"

আমি প্রথম দিকে আপত্তি তুলেছি। "বি-এ পরীক্ষাটা ছোট বয়সে সহজ। কিন্তু বেশি বয়সে যে-কোনো পরীক্ষাই কঠিন। চাকরি করে পরীক্ষা দিতে হবে।"

প্রণবেন্দুর মা প্রতিবাদ করতেন। "এই তো তুমি, চাকরি ছাড়াও প্রাইভেট টিউশনি করছো, আবার পড়াও চালাচ্ছো। খোকা বলছিল, তোমার আবার লুকিয়ে-লুকিয়ে বই লেখার নেশা রয়েছে!"

বইয়ের কথায় আমার লজ্জা পাওয়ার কথা। বইয়ের পরিকল্পনা এখনও অনেক দূরে। এই মুহূর্তে আমি ছোট লেখাতেই হাত পাকাতে চাই। তা ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। যা ছিল স্রেফ বিলাসিতা তা ক্রমশই কিছু রোজগারের উৎস হয়ে উঠছে। বিকেলে প্রাইভেট টিউশনি থেকে যা রোজগার করতে পারতাম তা প্রায় উঠে আসছে শনি-রবিবারের কয়েক ঘন্টা সাহিত্য প্রচেষ্টায়। লেখা প্রকাশিত হবার আনন্দটা বাড়তি বোনাসের মতো।

প্রণবেন্দুর মা বলেছেন, "না বাবা, তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে বলো। তোমাকে ও ভালবাসে, তোমার কথা শুনবে। আমি ভাল-ভাল কয়েকটি পাত্রীর সন্ধান পেয়েছি।"

প্রণবেন্দু নিজেও এতদিন চটপট বিয়েতে আগ্রহী ছিল না। কিন্তু নমিতা চ্যাটার্জির ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করতে হয়।

ওরা দু'জনেই একদিন দুপুরে আমাকে চীনা দোকানে নেমন্তন্ন করলো এবং নিজেদের শুভেচ্ছা সলজ্জভাবেই প্রকাশ করলো। ব্যাপারটা এইভাবেই পরীক্ষা পর্যন্ত গড়িয়ে নিয়ে যেতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু যারা নায়ক-নায়িকা তারা যদি তাড়াতাড়ি শেষপর্বে পৌঁছতে চায় তা হলে আমরা আপত্তি জানাবার কে?

উচ্চপর্যায়ের ঘটকালির দায়িত্বটা যে সর্বসম্মতিক্রমে আমার ঘাড়েই চাপবে তা প্রথমে বুঝিনি। প্রণবেন্দু জানালো, "মা তোমাকে খুব ভালবাসেন। ওখানে তোমার মতামতের একটা বিশেষ মল্য থাকবে।"

অর্থাৎ আমি যা বোঝাবো তাই বুঝে নেবেন প্রণবেন্দুর মা, এইরকম ধারণা হয়েছে নমিতার মনে।

আরও সব আবদার আছে। এটা যে প্রেম তা দুই পরিবারের কোথাও রটনা করা চলবে না। এটা যেন বিদ্যাস্থানে দূর থেকে পরস্পরকে দেখা, একটু চাপা পছন্দ হওয়া এবং বাকিটা যোগ্যাকে যোগ্যের সঙ্গে যোজন করবার জন্যে ঘটকের ব্যক্তিগত উদ্যোগ।

অতীব গুরুতর দায়িত্ব। দায়িত্বের মধ্যে মাধুর্যও আছে। প্রজাপতির জালে আপাতবন্দী বন্ধুকে নিরাপত্তা প্রদানও বন্ধুর অন্যতম দায়িত্ব। কিন্তু প্রণবেন্দুর মায়ের কাছে আমারও যে দায়িত্ব আছে তা কতটুকু দেখাতে পারি? এ বিষয়ে প্রণবেন্দুর নির্দেশ প্রয়োজন।

দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রণবেন্দু প্রেমরসে সিক্ত হয়ে তার প্রতাপ সম্পূর্ণ হারিয়েছে। সবচেয়ে সোজাপথে মাকে আড়ালে ডেকে পুরোপুরি কনফিডেন্সে নেওয়া। প্রেম যখন আসে

তখন অঙ্ক কষে আসে না, তা মা নিশ্চয় বুঝবেন। আর ছেলে যখন বিশেষ কাউকে জীবনসঙ্গিনী করতে আগ্রহী তখন মা শুধু-শুধু কেন আপত্তি করবেন?

কিন্তু এই আধুনিক পথে যেতে চাইছে না প্রণবেন্দু। আমিও এসব ব্যাপারে খুব চালাকচতুর নই। একটা ক্লাশ কামাই করে ট্যাক্সি চড়ে সহপাঠিনীকে বাড়ির দিকে এগিয়ে দিতে আসার ব্যাপারটা যদি জেরার চাপে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে তা হলেও বিপদ।

এ-বিষয়ে প্রণবেন্দু আড়ালে আরও আলোকপাত করেছে। "তোমার কাছে কিছুই চেপে রাখবো না। আচমকা ওই কিসিং-এর ব্যাপারটা সেই একবারই। পরিচয়টা যতই বেড়েছে নমিতা ততই শক্ত হয়ে উঠেছে। ট্যাক্সি চড়া হয়েছে কয়েকবার, কিন্তু দেখে-দেখে বাঙালীর ট্যাক্সি, যেখানে ড্রাইভারের সীটে দু'জন লোক অনর্গল বকে চলেছে।"

নমিতা চ্যাটার্জি নাকি কাছে সরে এসেই শারীরিক দূরত্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। প্রণবেন্দু কোনোদিন আর প্রশ্রয় পায়নি। এ-বিষয়ে আমি অবশ্যই নমিতার সঙ্গে কথা বলতে পারি না। সুতরাং প্রণবেন্দু যা প্রাণ থেকে বলছে তা মেনে নেওয়াই ভাল।

এরপর আমি আসরে অবতীর্ণ হয়েছি। মাসিমা আমাকে দেখেই বললেন, "আজ এলে। খোকা তো পরীক্ষার নোট কপি করবার জন্যে কোন প্রফেসারের বাড়ি চলে গেল!"

এই 'প্রফেসারটি' যে নমিতা চ্যাটার্জি তা আমি জোর করে বলতে পারি।

ঈশ্বর নিজেই এবার সুযোগ করে দিলেন। প্রণবেন্দুর মা বললেন, "সবই হচ্ছে, কিন্তু সময় বয়ে যাচ্ছে। খোকার বিয়ের একটা কিছু করা গেল না।"

আমি এবার শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। "ভাল মেয়ে পাওয়া আজকাল খুবই কঠিন, মাসিমা। দুষ্ট গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।" আমি প্রণবেন্দুকে 'কোট' করলাম।

"এতো চেষ্টা করে খোকাকে একটা মেয়ে দেখাতে পারলাম না!" মাসিমার দুঃখ চাপা রইলো না।

"দেখলেই তো হয়ে গেল মাসিমা। আপনারা খেটেখুটে খোঁজখবর নিয়ে যা ওর দেখার যোগ্য মনে করবেন তা কি ও ফেলে দেবে? আপনার ছেলে তো সেরকম নয়।"

মাসিমা ক্ষীণ আশার আলোক দেখতে পেয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "জানাশোনা কত ভাল পাত্রী তখন হাতে ছিল। কিন্তু মেয়ের বাপ্ কতদিন বসে থাকবে? সব হাতছাড়া হয়ে গেল। এখন খোকাকে যদি রাজি করাতে পারো তা হলে নতুন করে খোঁজখবর নিতে হবে। ভাল জমির মতো ভাল মেয়ে দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়, দেরি করেছো কি ঠকেছো।"

এইবার আমি নমিতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছি। আমাদের জানাশোনা একটি পালটি ঘরের মেয়ে রয়েছে। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, স্বভাবও খুব মিষ্টি। বেশ লম্বা—প্রণবেন্দুর মেড ফর ইচ আদার।"

"সে আবার কী জিনিস?" মাসিমা শেষ কথাটা বুঝতে পারেননি।

"রাজ-যোটকের ইংরিজী, মাসিমা! পাত্র পাত্রী দু'পার্টিই টপ ক্লাশ হলে লোকে আজকাল সিগারেট কোম্পানির বিজ্ঞাপনের দাপটে ওই কথা বলে। যেন একজনের জন্যেই ঠাকুর আর-একজনকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন ধরুন চাবি আর তালা, হাঁড়ি আর সরা, রুটি আর মাখন, লুচি আর আলুর দম, এই সব আর কি!"

মাসিমা একচোট খুব হাসলেন। "তা তুমি যে-পাত্রীর কথা বলছো তাকে কি খোকা দেখতে যাবে?"

"এইটাই ভাগ্য মাসিমা, মেয়েকে রোজই দেখছি আমরা দু'জনে। আমাদের ক্লাশেই পড়ছে। অতীব শান্তস্বভাবা, গৃহকর্মনিপুণা বলতে যা বোঝায় অক্ষরে-অক্ষরে তাই। তাছাড়া সাজানো মেয়ে দেখলে অনেক সময় বোঝা যায় না।"

"সে আর আমাকে বলছো! দীপুর বউয়ের বেলায় আমরা ঠকে এলুম। অমন চমৎকার রঙ, অমন চুল দেখে এককথায় নিয়ে এলুম, আর এখন দেখছি অন্যরকম। যাই হোক, বউমার স্বভাবটি ভাল তাই গেরস্তর পুষিয়ে গিয়েছে।"

"এবারে দু'দিকেই লাভ, মাসিমা। পাত্রীর যেমন স্বভাব, যেমন ফিগার, তেমন রং। শুধু কিনা ওই প্রণবেন্দুকে রাজি করানো। বিয়ের নাম শুনলেই তো তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে।"

"ছিঃ, বিয়েতে এতো ভয় কেন? বাপ পিতামহ বিয়ে করেননি? তাঁদের মুখে বছরে বছরে জল পড়বে কী করে? তোমরা সবাই যদি বলো বিয়ে করবার সামর্থ নেই?"

"এবার তৃতীয় পয়েন্ট, মাসিমা! মেয়ে চাকরি করছে বটে, কিন্তু যা মিষ্টি স্বভাব, যেদিন বলবেন সেদিনই ইস্তফা দিয়ে দেবে। বিশ্বাস না হলে, বড় জ্যাঠামশাই তাঁর ছেলের বউয়ের ব্যাপারে যা করেছেন তাই করা যাবে।"

মাসিমা আমার মুখের দিকে তাকালেন। বড় জ্যাঠামশায়ের বুদ্ধিটা তিনিও নিতে চান।

আমি বললাম, "বড় জ্যাঠামশাই সন্দেহ করেছিলেন, 'একবার যে রোজগারের স্বাদ পেয়েছে সে কি কখনও চাকরি ছাড়তে পারবে? এই নিয়ে কত সংসারে অশান্তি।' সেই না শুনে, তাঁর ভাবী বেয়াই মোক্ষম অস্ত্র ছাড়লেন। পকেট থেকে বার করলেন আগাম রেজিগনেশন লেটার, মেয়ের সই করা। রেখে দিন আপনার কাছে, যেদিন খুশি তারিখ বসিয়ে মেয়ের আপিসে পাঠিয়ে দেবেন, ওকে জিজ্ঞেস করারও দরকার হবে না।"

খুব খুশি হচ্ছেন মাসিমা। এই মতলব মাথায় আসেনি তাঁর। আমিও খুশি হলাম,

ওই বিষয়ে আর প্রশ্ন হচ্ছে না বলে। কারণ বড় জ্যাঠামশায়ের বড় বউমা এখনও দোর্দণ্ডপ্রতাপে চাকরি করে যাচ্ছেন, কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে সংসারে সারাক্ষণ বন্দী হয়ে থাকার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তাঁর নেই। জ্যাঠামশাই এবং জ্যেঠিমা দু'জনেই হার মেনে বেবি সীটারের কাজ করছেন, আর বউদি নিত্য চলেছেন রাইটার্স বিলডিংসে।

মাসিমা টোপ গিললেন। "দেখো না, যদি ওকে রাজি করাতে পারো।"

"পাত্রকে রাজি করানো তো অনেক পরের কথা। আগে আপনি ব্যাপারটা বুঝে-সুঝে দেখুন, মতামত দিন।"

মাসিমা ভাবছেন, "ভাল করতে গিয়ে মন্দ কিছু না হয়ে যায়। হাজার হোক, একই সঙ্গে একই কলেজে দু'জনে পড়ে।"

"ভাল ছাড়া মন্দ কী হতে পারে, মাসিমা?" আমি মৃদু চাপ দিই প্রণবেন্দুর মায়ের ওপর।

"এই ধরো, ধরে-বেঁধে আমি খোকাকে মেয়ে দেখতে পাঠালাম। খোকা গেল, কিন্তু মেয়ে পছন্দ হলো না। তখন কী মুশকিল ভাবো তো। এখনও অনেকগুলো মাস দু'জনকে একসঙ্গে ক্লাশ করতে হবে।"

"আমাদের আপিসে বলে নো রিস্ক নো গেন! একটু ঝুঁকি না নিলে কী ভাবে লাভ হবে, মাসিমা?"

"তুমি তো বলে বসলে। কিন্তু মেয়ের আত্মীয়রা সে দায়িত্ব কেন নেবেন?"

"অনুমতি যদি করেন, সব কথা সোজাসুজি বলে নেবো। ওঁদের সঙ্গে আমার একটু জানাশোনা আছে। আলোচনা হবে উইদাউট প্রেজুডিস।"

"সে আবার কী জিনিস বাবা?" মাসিমা জানতে চান।

"উকিলবাড়িতে কাজ করেছি তো মাসিমা। উইদাউট প্রেজুডিস শর্তটা কথায়-কথায় এসে যায়। অর্থাৎ আলোচনা হচ্ছে-হচ্ছে, কিন্তু ব্যর্থ হলেও কোনো পক্ষের কোনো দায়দায়িত্ব থাকবে না।"

মাসিমা খুশি হলেন, কিন্তু বললেন, "দেখো বাবা, এই বিয়েশাদির ব্যাপারে আবার উকিল মোক্তার ডেকে এনো না!"

"উকিল ব্যারিস্টারের নামগন্ধ থাকবে না, আপনি দেখে নেবেন। আর ওই যে রিস্কের কথা বলছিলাম ওটা 'নিল', কারণ আপনি স্যাংশন করবার পরে প্রণবেন্দু যাকে দেখবে তার নির্বাচিত না-হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।"

এর পরে পূর্ণ উৎসাহে দৌত্যকার্য চালাতে হয়েছে আমাকে। সুবিস্তারিত রিপোর্টের জন্য পরের দিন প্রণবেন্দু আমাকে পাকড়াও করেছে। আমি বলেছি, "দাঁড়াও, আগে নমিতার কাছ থেকে একটা ফটো যোগাড় করি। ম্যারেজ ফটোগ্রাফি এক ভীষণ জিনিস। নাইনটি-নাইন পার্সেন্ট মেয়ের ভাগ্য ওখানেই সীলমোহর চাপা পড়ছে!"

আমার বন্ধুটি এই কয়েক মাসেই চালু হয়ে উঠেছে। সে বললো, "নমিতাকে এখনই নার্ভাস করে দিও না। ওর একটা ছবি, যেটা আমার কাছে আছে সেটাই সাপ্লাই করছি।"

ফটো চালাচালি হওয়া মানে তো কেস অনেকখানি এগিয়ে যাওয়া। প্রণবেন্দু একটু লজ্জা পেলো, কিন্তু বললো, "ভুল করে ছবিটা আমার কাছে রয়ে গিয়েছে।"

একই ভুল করে অন্য কোথাও প্রণবেন্দুর একটা ছবি রয়ে গিয়েছে, এটা আন্দাজ করা নিশ্চয় অন্যায় হবে না।

দৌত্যকর্মের সমস্ত রিপোর্ট যে নমিতা চ্যাটার্জির কাছে চলে যাচ্ছে, তা নমিতার চাহনি দেখেই বুঝতে পারলাম। আমার সঙ্গে তার তেমন পরিচয় নেই। কিন্তু ক্লাশে বেশ কয়েকবার সে আমার দিকে তাকালো।

শেষ ক্লাশের আগে প্রণবেন্দু বললো, "ছবির কথা শুনে নমিতা একটু নার্ভাস হয়ে আছে। তুমি তো ছবি নিয়ে এখনও মায়ের সঙ্গে দেখা করোনি।"

"যে ছবি দেখে তুমি গুলিবিদ্ধ হয়েছো সেই ছবিটাই তো মায়ের কাছে যাচ্ছে, সুতরাং চিন্তার কী আছে?" আমি প্রণবেন্দুকে সাহস যোগাই।

"শোনো, নমিতা আরও কয়েকটা ছবি এনেছে। তুমি নিজেই সিলেক্ট করে নাও। আমি নমিতাকে বলেছি, মা, মাসি, কাকিদের মন বুঝতে তোমার জুড়ি নেই!"

অন্য কেউ শুনলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়তো, কিন্তু আমার পক্ষে কথাটা মিথ্যে নয়। সমবয়সিনীদের সান্নিধ্য থেকে আমি দূরে থাকতে চাই, ওই সব ব্যাপারে কোনো ঝুঁকি নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি বলেছি, "এমন ছবি দাও, যেখানে সখীভাবটা কম এবং গৃহলক্ষ্মীভাবটা প্রবল। 'অতীব শান্তস্বভাবা' রূপটি যেন ভাবী শাশুড়ীর মনের মধ্যে সেঁটে যায়।'

সিলেকশনের দায়িত্ব তবু আমার ওপর থেকে যাচ্ছে। আমি বললাম, "তিনটে ছবিই থাক, হাল বুঝে তাস ফেলবো।"

যা ভেবেছিলাম তাই। একখানা ছবি দেখে মাসিমা বললেন, "খুবই শান্তভাব মনে হচ্ছে। বাপ-মা বাড়ি থেকে যে বেশি বেরোতে দেয় না তা ছবি দেখেই বোঝা যাচ্ছে!'

ঈশ্বর তা হলে মুখ তুলে চাইছেন! মাসিমা হঠাৎ "কিন্তু" শব্দটি উচ্চারণ করে আমাকে নার্ভাস করে তুললেন।

ছবি থেকে চোখ সরিয়ে মাসিমা বললেন, "খোকার স্বভাব জানো তো, একটু স্মার্ট মেয়ে চায়। একবার এক রাইফেলশুটার মেয়ের ছবি বেরিয়েছিল কাগজে, খোকা ওর মাসতুতো বোনকে বলেছিল, এই রকম মেয়ে আমি বিয়ে করতে চাই।"

"তীরন্দাজ এবং গোলন্দাজ হিসেবে প্রত্যেক মেয়েই সুপারদর্শিনী", এরকম কথা একবার একটা গল্পে লিখেছিলাম। কিন্তু সেকথা মাসিমাকে এখন বলা চলবে না।

বললাম, "রাইফেল শুটিংও করে না, সিনেমা শুটিংও করে না এই মেয়ে। কিন্তু সব রকম কাজে যাকে বলে কিনা এক নম্বর। বাড়িতে, অফিসে, কলেজে সব জায়গায় সুনাম।"

"দেখো বাবা ! মেয়েদের আবার খুব সুনাম হওয়াটা ভাল নয়। বেশি নাম হলে, শ্বশুরবাড়িতে মন বসতে চায় না।" মাসিমা মোক্ষম একটি নৈতিক বক্তব্য রাখলেন।

আমি বললাম, "রাখুন ওসব কথা। কত ভাগ্য করলে তবে এ-বাড়িতে বউ হিসেবে কেউ আসতে পারবে।"

মাসিমা বললেন, "একটু ভেবেচিন্তে চলতে হবে আমাদের। এমন একটা ছবি দেখাতে হবে যাতে ওর মনে ধরে।"

আমি সুযোগ বুঝে এবার একটি স্মার্ট নমিতাচিত্র মাসিমার সামনে রাখলাম। "বাঃ, বেশ চালাক-চতুর মনে হচ্ছে। এই ছবিটাই খোকাকে দেখাতে হবে। অন্য ছবি তুমি ফেরত নাও।"

পরের দিন নমিতা আমার দিকে আবার তাকাচ্ছে। প্রাথমিক চিত্র নির্বাচনে মাসিমার কাছে অনার্স নিয়ে পাস করার সংবাদ যে তার কানে পৌঁছে গিয়েছে তা তার মুখ দেখেই আমি বুঝতে পারছি।

এর পরে দৌত্যকর্মের গতি আরও দ্রুত হয়েছে। নমিতা একদিন তার বাবাকে পাঠিয়ে দিয়েছে আমার অফিসে।

নমিতার বাবা বললেন, "চাকরি করলে ছেলেরাও যা মেয়েরাও তা। কতবার ওর মা ওকে বলেছে, কাগজে বিজ্ঞাপন দিই, ঘটক লাগাই। কিন্তু মেয়ের কোনো আগ্রহ নেই। এখন আপনাদের আশীর্বাদে যদি কিছু একটা হয়। আমি শুনলাম, এই সম্বন্ধের পিছনে আপনি প্রধান।"

আমার লোভ হলো, একবার বলি, "একজন শিখ ট্যাক্সি ড্রাইভার থেকে আরম্ভ করে অনেকেই ঘটকালিতে ইন্ধন যুগিয়েছেন, আমি নিমিত্ত মাত্র।" কিন্তু মেয়ের বাবাদের মুখের ওপর এরকম কথা বলা যায় না।

ছেলের কথাও চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করলেন নমিতার বাবা। "একেবারে ডায়মণ্ড পার্টিকল, হীরের টুকরো বলতে যা বোঝায়", আমি আশ্বাস দিই।

"আমার মেয়েও কম যায় না", গর্ব করলেন নমিতার বাবা।

আমি বললাম, "পাত্র হচ্ছে সেই ক্লাশের, যাদের বিবরণ কাগজের পাত্রপাত্রী কলমে বেরুলে প্রথম সপ্তাহেই আটশো চিঠি আসে। আর কয়েক মাস অপেক্ষা করে বি-এ পরীক্ষার ফলাফল বেরুলে কত চিঠি আসতে পারে তা আন্দাজ করুন।"

নমিতার বাবাকে কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন বিষয়ে রিহার্সাল দেওয়ানো হলো। ভদ্রলোক মেয়ের প্রশংসায় দু'একবার বাউন্ডারি হাঁকালেও, স্বীকার করলেন, "এসব আমি কিছুই বুঝি না, মশাই। মেয়ের সঙ্গে তার মায়ের কী সব কথা হয়েছে তা আমার

জানা নেই। আমার উপর কড়া অর্ডার, আপনি যা নির্দেশ দেবেন তা আমাকে মানতে হবে। আপনি দয়া করে এই দায় থেকে আমাকে উদ্ধার করুন।"

উচ্চপর্যায়ের আলোচনার সময়ে শান্তস্বভাবের ওপর দু'পক্ষই গুরুত্ব অর্পণ করেছেন। মাসিমা বলেছেন, "আপনার মেয়েটি যে স্বভাব-লাজুক এবং শান্তস্বভাবা তা ছবি দেখেই বুঝতে পেরেছি।"

"নিজের মেয়ে, কী বলি! তবে সব অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেবার জন্যে তৈরির চেষ্টা করেছেন আমার স্ত্রী। কিন্তু ওই যে বলেছেন, ভীষণ লাজুক এবং শান্তস্বভাবা।"

"আমার ছেলেটিও ভীষণ লাজুক। কতবার বলেছি, চলো, নিজে পাত্রী দেখো। আজকালকার যুগ, নিজেরা পছন্দ করে নিলে বাপমায়ের দায়িত্ব অনেক কমে যায়। চুপচাপ কথা শুনবে, কোনো উত্তর দেবে না। এই ছবি দেখাতেই আমার কষ্ট হবে। সামনেই তো বন্ধু রয়েছে, ওকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।"

আমার বুকের মধ্যে তখন হাতুড়ি পড়ছে। সৌভাগ্যক্রমে নমিতার বাবা আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। বরং মাসিমার প্রশস্তিতে বললেন, "আমি তো গাছ দেখে গেলাম, সুতরাং ফল কী রকম হবে তা আমাকে আর বলে দিতে হবে না।"

এবার মাসিমাও খুশি হয়েছেন। "আমার আর কী চাই বলুন? যারা বিয়ে করবে তারা সুখী হোক, তা হলেই আমরা সুখী।"

"হীরের টুকরো ছেলে, হীরের টুকরো মেয়ে--সুতরাং সুখী না-হওয়ার কোনো কথাই ওঠে না যদি পিতৃপুরুষের আশীর্বাদ থাকে পিছনে।"

নমিতার বাবা যে ডায়ালগগুলো চমৎকারভাবে আয়ত্ত করেছেন তার প্রমাণ পেয়ে আমিও বেশ উল্লসিত।

এরপর ব্যাপারটা দ্রুত এগিয়েছে। মাসিমা একদিন নমিতাদের বাড়ি গিয়ে পাত্রী পছন্দ করে এসেছেন। পাত্র তার মাকে ব্লাংক চেক দিয়েছে, সে আর আসেনি। ছুটির দিনে গল্প লেখা বন্ধ রেখে আমাকে দু'পক্ষের মধ্যে হাইফেনের কাজ করতে হয়েছে।

মাসিমা সন্তুষ্ট হয়ে বলেছেন, "খোকার পাত্রীর জন্যে আমি বিশ্বভুবন তোলপাড় করছি, আর মেয়ে রয়েছে খোকাদেরই কলেজে। একেই বলে ভবিতব্য!"

ভবিতব্য তো বটেই। না-হলে শেষ পিরিয়ডের আগে বাস স্ট্যান্ডে হঠাৎ সর্দারজীর ট্যাক্সি হাজির হবে কেন, আমি মনে-মনে ভেবেছি।

মাসিমা বলেছেন, "এ সম্বন্ধের কথা প্রথম ভাবলো কে?"

নমিতার বাবা-মা নার্ভাস হয়ে আমার দিকে তাকালেন। গুরু দায়িত্বটুকু আমাকে নিতে হলো। মাসিমা বললেন, "তোমার মাথায় অনেক বুদ্ধি খেলে তো।"

আমি উত্তর ঠিক করতে পারছিলাম না। মাসিমা নিজেই বললেন, "তুমি ঠিক করেছো। আমি তো দেখা হলেই তোমাকে বলে যাচ্ছি বন্ধুর জন্যে একটা কিছু করো। সময় বয়ে যাচ্ছে।"

আর সময় বয়ে যাবার উপায় নেই যেখানে দু'পক্ষের এতো আগ্রহ। বি-এ পরীক্ষা দিতে এখনও অনেক দেরি, তার জন্যে এই বিয়ে আটকে রাখার কোনো মানে হয় না। মাসিমা এ-বিষয়ে যে নির্দেশ দিলেন তাই অপরপক্ষ মাথা নেড়ে গ্রহণ করলো।

ঈশ্বরও সহায় হলেন। একটাই চিন্তা ছিল—কলেজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে। সহপাঠী-পাঠিনীর বিয়েটা এদেশে নতুন নয়, কিন্তু ছাঁদনাতলার ব্যাপারটা সাধারণত হয় কলেজ ছেড়ে আসবার বেশ কিছুদিন পরে। কলেজে পড়তে-পড়তেই স্বামী-স্ত্রীতে রূপান্তরের ঘটনা আমার জানা নেই। মস্ত এই ধাক্কা সামলানো বেশ শক্ত হবে। ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক মহলে এর কী প্রতিক্রিয়া হবে তা আন্দাজ করা যাচ্ছে না।

কিন্তু সেই পুরনো কথা, যেখানে ইচ্ছে আছে সেখানে পথও আছে। কলেজের দীর্ঘ ছুটিটা বেশ কাজে লেগে গেল। যেদিন কলেজ বন্ধ হলো সেদিনই বিয়ে, সুতরাং কলেজে কাউকে জানানোর প্রয়োজন হলো না, আর যখন কয়েক সপ্তাহ পরে আবার কলেজ খুললো তখন হনিমুন ইত্যাদি সেরে ব্যাপারটা বেশ পুরনো হয়ে গিয়েছে। নমিতা চ্যাটার্জির গোত্রান্তর এবং সিঁথিতে সামান্য একটু সিঁদুরের দাগ ছাড়া কোথাও কোনো পরিবর্তন হয়নি।

আমি বললাম, "বিয়ে করে টেকস্‌ট্‌ বইয়ের খরচ তোমরা কমিয়ে ফেললে। পতির পাঠে সতীর পাঠ এবং সতীর পাঠে পতির পাঠ একসঙ্গেই চলবে।"

বেচারা প্রণবেন্দু। সে এখন দোর্দণ্ড শাসনে পড়ে গিয়েছে। অমন বেপরোয়া সিংহ এখন বিনম্র গৃহপালিত জীবে পরিণত হয়েছে।

প্রণবেন্দুর আরও দুঃখ, "টাকাকড়ির ব্যাপারে ও ভীষণ স্ট্রিক্ট! বাড়ি ফিরবার সময় একদম ট্যাক্সি করতে দেয় না। বলে, বাসে-ট্রামে হাজার-হাজার লোক যাচ্ছে, তুমি-আমি পারবো না কেন?"

হনিমুন অধ্যায়ের পরে ছুটির মধ্যেই আমি নিমন্ত্রণ পেয়েছি প্রণবেন্দুর বাড়িতে। নমিতা আমার সঙ্গে এখন প্রাণ খুলে আলাপ করতে চায়।

মাসিমা বললেন, "বউমা তো তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। লেখাপড়া ছাড়া কোনোদিকে নাকি তোমার নজর নেই। এতো চাপের মধ্যে তুমি আবার কী করে খবরের কাগজে লেখো তা মেয়েরা বুঝতে পারে না।"

আমি খুশি হয়েছি আমার দৌত্যকর্ম সফল হয়েছে বলে। মাসিমাও খুশি। তাঁর বক্তব্য, "সব দিক দিয়ে গুণের বউ হয়েছে। শুধু বড্ড লাজুক, এই যা। তা আমি খোকাকে বলেছি, লাজুক হওয়া ভাল। যা বেহায়ার যুগ এটা। ভাল-ভাল ছেলের মাথা খাবার জন্যে যেখানে-সেখানে রাক্ষসী সব ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

আমি অবশ্যই মাসিমার কথায় সায় দিচ্ছি। আর নমিতা বলছে, "কিন্তু পড়াশোনা

করছে না আপনার বন্ধু। একটু মন-না-বসালে আমার মুখ থাকবে কোথায় বলুন তো ?"

প্রণবেন্দুর মুখে শুনেছি, "নমিতা বলছিল, ক্লাশের মেয়েরা অনেকেই তোমার প্রশংসা করে।"

পড়াশোনায় আমি এক নম্বর নই। সুতরাং একমাত্র গুড কনডাক্ট ছাড়া আর কী পুরস্কার আমি পেতে পারি আমার সহপাঠিনীদের কাছ থেকে ?

আগে আমি সোজাসুজি বলতাম, "সহপাঠিনীদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেবার সময় নেই আমার। নির্দিষ্ট একটা কাজের জন্যে আমি এখানে এসেছি, তার বাইরে কোনো কৌতূহল নেই আমার।" এখন আমি চালাক হয়ে গিয়েছি। লোকে ভুল বোঝে, আমার পারিবারিক দায়দায়িত্ব কতখানি গুরুতর তা তারা বুঝতে পারে না। আমি এখন তাই প্রকাশ্যে নমিতাদের বলি, "কী সৌভাগ্য আমার ! সহপাঠিনীদের সার্টিফিকেটের থেকে মূল্যবান কী থাকতে পারে এই জীবনে ?"

নমিতা আমার কথা শোনে এবং বলে, "আর অভিনয় করতে হবে না। মেয়েদের যে আপনি তোয়াক্কা করেন না তা মেয়েরা বুঝতে পারে।"

তোয়াক্কা ! আমি তো আমার প্রত্যাশার ঊর্ধ্বলোকে রেখেছি ওঁদের। এ-সংসারে সবাই তো প্রণবেন্দুর মতো ভাগ্যবান হয় না।

নমিতা আমার জন্যে ভাবে। সে বলে, "অমূল্য সুযোগ নষ্ট করবেন না। সুদৃশ সুকুমারী গুণবতীরা সামনেই রয়েছেন। ভাব করার এই সুযোগ যখন হাতছাড়া হবে তখন হয়তো আফসোসের শেষ থাকবে না।"

নমিতা বলেছে, "গুণবতীদের জন্যে অলিখিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগে রয়েছে সর্বত্র গতবারে শেফালি চৌধুরী বলে একটি মেয়ে তো অর্থনীতির তরুণ অধ্যাপককেই বিয়ে করলো। শুধু বিয়ে নয়, তারপরেই অধ্যাপকমহাশয়কে আই-এ-এস পরীক্ষায় বসালো, সুসংবাদ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, শেফালি চৌধুরী অধ্যাপকগৃহিণী না হয়ে এখন ম্যাজিসট্রেট সায়েবের ঘরনী হচ্ছে। একেই বলে, আসল পাথর চিনে নেবার ক্ষমতা। এতো চেনাশোনা থাকতে, শেফালি চৌধুরী কেন নন্দন বসুকেই নির্বাচন করলো ?"

বিয়ের পরে নমিতার সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা অনেক বেড়েছে। আমার রোমান্টিক জীবন সম্পর্কে কোনো কৌতূহল সজাগ হলেই আমি বলি, "একটা ঘটকালি করতে গিয়েই আমার পাঁচ বছরের সমস্ত এনার্জি ব্যয় হয়েছে। এখন আর প্রজাপতির পিছনে ছোটাছুটি নয়।"

নমিতা বলেছে, "নিজের মাথা নিজে কামানো যায় না। আপনার বেলায় ছোটাছুটি করবে অন্য লোক। আপনি শুধু একবার গ্রীন সিগন্যাল দিন।"

"লালবাতি ছাড়া আমার অন্য কোনো বাতিই নেই।" আমি নমিতাকে শুনিয়েছি

"রাখুন ওসব বাজে কথা। আপনার অনেক সুবিধে। একটু সাহস কম আপনার, ন্তু আজকালকার অনেক মেয়ে অতিমাত্রায় আগুয়ানদের সম্বন্ধে সাবধানী হয়ে য়।"

আমি নির্বাক ভূমিকা গ্রহণ করেছি। নমিতা বললো, "মলিনা মৈত্রর তো আপনার ম্বন্ধে খুব ভালো ধারণা।"

নামেই মলিনা। কিন্তু আসলে গৌরী। একসময় বোধ হয় এয়ার হোস্টেস ছিল। খন কিসের খেয়ালে বি-এ ডিগ্রি নিতে এসেছে। অফিসের গাড়ি রোজ পৌঁছে দিয়ে য় মলিনা মৈত্রকে। কে একজন বললো, "মলিনার বাবারও গাড়ি আছে। মাঝে-ঝে মেয়েকে কলেজ থেকে নিতে চলে আসে সেই গাড়ি।"

হতেই পারে, যদি গাড়ি থাকে কেন আসবে না মাঝে-মাঝে তুলে নিতে?

"মলিনা কী বলেছে জানেন?" নমিতা আমার কৌতূহল বাড়ানোর চেষ্টা রলো।

নিশ্চয় আমার অগোছালো চুলের নিন্দা করেছে, আমি আন্দাজ করি। প্রণবেন্দু তবার বলেছে, পকেটে একটা চিরুনি রাখো। কিন্তু হয়ে ওঠে না।

নমিতা বললো, "যার চুল সে বুঝবে! ও-নিয়ে মেয়েমহলে কোনো মাথাব্যথা ই। মলিনা বলছিল, আপনার মুখ-চোখে নাকি একটা স্বপ্ন আছে। যারা জীবনে বড় হতে চায় তাদের মধ্যে এ-রকম থাকে।"

আমি হাসলাম। "কোনো রকমে প্রাণধারণ করে ভাইবোনগুলোকে মানুষ করা ড়া আমার এখন আর কোনো স্বপ্ন নেই।"

নমিতা বললো, "মলিনা বলছিল, গল্প না-লিখে আপনার এবার উপন্যাসে হাত ওয়া উচিত। মলিনার ধারণা, উপন্যাস ছাড়া সাহিত্যে নাম করা খুব শক্ত।"

"দামী কথা। আমি মনে রাখবো।"

"যদি সত্যিই কখনও নাম-টাম হয় তখন কিছুই মনে রাখবেন না। তখন হয়তো জ্ঞেস করবেন, হু ইজ মলিনা মৈত্র?"

নমিতার দিকে তাকিয়ে আমি হেসেছি। "রাত কলেজে যারা আমরা পড়তে এসেছি ারই নিশ্চয় কিছু একটা সমস্যা আছে। না-হলে মানুষ কেন রাত্রে পড়তে আসবে? ব্যথীদের ভোলা খুব শক্ত কাজ, নমিতা।"

নমিতা বলেছে, "আপনার দুঃখ আছে। পড়াশোনার প্রবল ইচ্ছে সত্ত্বেও কয়েকটা র নষ্ট হয়েছে। কিন্তু মলিনার তাতে কোনো দুঃখ নেই। কেবল খেয়াল আছে। ভাল কাজ করে, ভাল ইংরিজী বলে, দেখতে ভাল, বি-এ ডিগ্রির কোনো দরকার ই ওর। তবু ছুটে এসেছে খেয়ালের বশে। কত লোক ওর সঙ্গে কথা বলতে পারলে া হয়ে যায়, আর আপনি এমনই নার্ভাস যে ওর সঙ্গে সাহিত্য আলোচনাতেও জি নন!"

আলোচনার যোগ্য সাহিত্য যে আমার ঝুলিতে নেই, তা আমার থেকে বেশি কেউ জানে না।

নমিতা বলেছে, "মলিনা কবিতা লেখে ইংরিজীতে। বোধ হয় বাংলাতেও লিখতে পারে একটু অনুপ্রেরণা পেলে।"

এর পরে এক-একটি মেয়ের বিচিত্র গুণাবলীর কথা নমিতা মাঝে-মাঝে বর্ণনা করেছে। "আপনাকে বলছি, শুনছেন না। তপতী মজুমদার এখন ফোর্থ ইয়ারের মানস ভট্টাচার্যের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করছে। মানস ভট্টাচার্য এবং তপতীকে একই বাসরুটে বেহালা যেতে হয়।"

তপতী মেয়েটি যে সর্বগুণান্বিতা ছিল তাও আমাকে শুনতে হলো। যে-মেয়ে দিনে চাকরি করে রাত্রে পড়ে সে যে রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারে তা আমাদের অকল্পনীয় ছিল। একদিন তপতীর ছবি দেখলাম বেতার জগতে। গানও শুনলাম, সত্যি ভাল গায়।

"এখন গান ভাল লাগলে কী হবে? টু লেট। মানস ভট্টাচার্যের সঙ্গে তপতী মজুমদার ইজ গোয়িং স্টেডি।"

খুব দুঃখ করতে লাগলো নমিতা। "যার গান ভাল লাগে তারই বন্ধুত্ব হাতের গোড়ায় ছিল। ক'দিন আগে মুখ ফুটে বললেন না কেন?"

প্রণবেন্দু আমাকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা চালালো। "ও তো শুধু তপতী মজুমদারের গানের প্রশংসা করেছে। গান ভাল লাগলেই যে গায়িকাকে ভাল লাগবে এমন কোনো আইন তো নেই।"

"রাখো তোমার তর্ক। গানের ফোয়ারা আয়ত্তের মধ্যে থাকলে যখন তখন গান শোনার কত সুবিধে বলো তো?"

প্রণবেন্দু বলেছে, "সেবার ইডেন গার্ডেনে তুমি তো আমাকে গান শোনালে। কিন্তু বিয়ের পর তুমি ক'বার আমার রিকোয়েস্ট রেখেছো?"

"আমার রিকোয়েস্টটি রেখে আগে পরীক্ষার জন্যে তৈরি হও। ভালভাবে পাস না করলে শ্বশুরবাড়িতে আমার মুখ থাকবে না।" বকুনি লাগালো নমিতা। স্বামীকে শাসন করবার সহজাত ক্ষমতা নিয়েই মেয়েরা বোধ হয় জন্মগ্রহণ করে। অথচ বিয়ের আগে দেখলে তাদের এই ক্ষমতার কথা বোঝা যায় না।

মাসখানেক পরেই নমিতা আমাকে বলেছে, "কারুর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হতে চলেছে। মানস ভট্টাচার্যের সঙ্গে তপতী আর এগোচ্ছে না। মানস তো ইতিমধ্যেই বদলি নিয়ে কলকাতার বাইরে চলে গিয়েছে। অডিট ডিপার্টমেন্টের চাকরির ওই সুবিধে।"

"কী হয়েছিল?" জানতে চায় প্রণবেন্দু।

"সে জেনে আর কী হবে? তবে দোষটা যে মানসের সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।" নমিতা বললো।

তপতীকে দূর থেকে দেখতে যে আমার ভাল লাগতো এ-কথা এতদিন পরে স্বীকার করে লাভ নেই। কিন্তু এ-বিষয়ে এগিয়ে যাবার মতো মনের অবস্থা তখন মার ছিল না।

আমাদের ক্লাশের সেরা ছাত্র কাশীনাথ মজুমদারের দিকেই তখন তপতীর নজর ড়লো। নমিতা বললো, "আপনারা তো কোনো কর্মের নয়। এখন যুদ্ধটা বাধবে শীনাথকে নিয়ে।"

কাশীনাথ যে ক্লাশের সেরা ছাত্র সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সায়েন্সে একটা গ্রি থাকা সত্ত্বেও কাশীনাথ বিশেষ কোনো খেয়ালে আবার এসেছে একটা ডিগ্রি তে। কাশীনাথ ইতিমধ্যেই কলেজের সব ক'টি পরীক্ষায় প্রফেসারদের প্রশংসা অর্জন রছে।

কাশীনাথ ইতিমধ্যেই বড় চাকরি করে। গেজেটেড অফিসার কেন শখ করে আবার লজে পড়তে এসেছে আমরা বুঝতে পারতাম না।

কাশীনাথের সঙ্গে আমি এক বেঞ্চিতে বসতাম। কাশীনাথ বলতো, "বাবার াড়নায় বি-এস-সি অনার্স পড়েছি। চাকরিও জুটেছে। এবার আমি নিজের তাড়নায় রিজী পড়তে এসেছি।"

"একটা ডিগ্রিই যখন যথেষ্ট, তখন আবার দ্বিতীয় ডিগ্রির মোহ কেন?" কেউ-উ জানতে চাইতো।

কাশীনাথ বলতো, "চোখের সামনে অধ্যাপক দেবজ্যোতি বর্মণের আদর্শ রয়েছে। য় এক ডজন বিষয়ে এম-এ ডিগ্রি সংগ্রহ করেছেন।

দু'একজন হিংসুটে বলতো, "কতকগুলো ছাত্রীর মানসিক বিপর্যয় ঘটাবার জন্যেই ই সব লোককে ভগবান নাইট কলেজে পাঠিয়ে দেন।"

কাশীনাথ মজুমদারের কানে অবশ্য এসব কথা পৌঁছতো না। চাকরিবাকরির জন্যে জেটেড অফিসারের ক্যারাক্টারের সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হলে আমরা কাশীনাথের রণাপন্ন হতাম।

নমিতা বলতো, এই কাশীনাথই মেয়েদের স্পেশাল টারগেট।

এ-বিষয়ে ছাত্রমহলেও নানা গুঞ্জন। "হাতের গোড়ায় বি-এস-সি অনার্স গেজেটেড ফিসার পেলে কে আন্ডার গ্র্যাজুয়েটের দিকে হাত বাড়াবে? মেয়ে হলে তুমিও ই করতে!" এমন মন্তব্যও আমার কানে এসেছে।

মেয়েদের নিয়ে নানা গুজব রটতো। রমলা সিকদার ও কাশীনাথকে নাকি একদিন ট্রো সিনেমায় দেখা গিয়েছে। রমলা সিকদার নাকি বলেছে দেখা হওয়াটা নিতান্ত কস্মিক। আফটার অল মেট্রো সিনেমায় দু'জন মানুষ আলাদা-আলাদাভাবেই কিট কাটতে পারে এবং শোয়ের শেষে তাদের দেখা হয়ে যেতে পারে।

প্রতিমা বিশ্বাস ও তপতী মজুমদারের নামও উঠেছে। সবিস্তারে সেসব কাহিনী বর্ণনা শোনানোর জন্যে নমিতা আমার সামনে প্রস্তুত হয়েছে। এমনকি প্রণতি সি সম্বন্ধেও সন্দেহ করা হয়েছে। নমিতা বলেছে, "কাশীনাথবাবু যদি বুদ্ধিমান হন তাহ প্রতিমা বিশ্বাস অথবা তপতী মজুমদারের মধ্যে কাউকে নির্বাচন করবেন। যদি প্রণতি সিংহর খপ্পরে পড়েন তাহলে অনেক দুঃখ আছে কপালে।"

"কেন, প্রণতি সিংহ কী দোষ করলো ? সে তো কারও সাতে-পাঁচে নেই। চুপচ ক্লাশ করে বাড়ি ফিরে যায়। একটু ভাল রেজাল্টও করতে পারে।"

"প্রণতি স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন। বিয়েটা গোলমাল হবার পরেই কলেজে পড় এসেছে। এখনও ডাইভোর্স পায়নি। এই অবস্থায় নতুন প্রেম করা খুব রিস্কি

"প্রেমে তো সব সময় রিস্ক।" মন্তব্য করে বিপদে পড়লো প্রণবেন্দু। বউয়ের বক খেতে হলো।

"ডাইভোর্স হবার আগে নতুন প্রেম করা যায় না, জেনে রাখো মশাই। দু'জ বিপদে পড়ে যেতে পারে।"

আমি স্বীকার করলাম, নমিতা যা বলছে তাই ঠিক। হাজার হোক, আমি কিছু আদালতের উকিলের নথিপত্র বহন করে এসেছি।

আমি এবার জিজ্ঞেস করে বসলাম, "কাদম্বিনীর খবর কি ?"

এবার প্রণবেন্দু আমাকে বকুনি লাগালো। "তুমি একটি অপদার্থ ! সেই যে দু' হাওড়া স্টেশনে গেলে তারপর কোনো খবরাখবরই করলে না। এখন আবার জান চাইছো কাশীনাথের সঙ্গে জানাশোনা হয়েছে কি না ? অর্থাৎ তুমি চাও কাদম্বি ভাল হোক, অথচ তুমি জড়িয়ে পড়তে রাজি নও।"

নমিতা হাসলো। "এতো ভীতু হলে কোনোদিন তো সাকসেসফুল প্রেমিক হ পারবেন না। আপনার আর একটা মস্ত ভুল, মেয়েরা সব সময় স্বামীর আ সচ্ছলতা চায়। মনের মতন মানুষ পেলে মেয়েরা অনেক দুঃখ-কষ্ট মেনে নিতে র থাকে। কারণ কষ্ট চিরকাল থাকে না। অনেক কষ্ট দু'জনের চেষ্টায় কাটিয়ে ওঠা যায়

আমি তর্ক করিনি। আমি তো স্বীকার করে নিয়েছি, মেয়েদের সঙ্গে মেশবার সা আমার এই মুহূর্তে নেই।

নমিতা বলেছে, "ওই কাদম্বিনীর কোনো চান্স নেই কাশীনাথ মজুমদারের স যদিও কাদম্বিনীকে ক'দিন দেখলাম কাশীনাথের সঙ্গে পড়ার ব্যাপারে কীসব আলো করতে।"

নমিতার মতামতের মূল্য দিই আমি। সে যখন বলছে অনেক সহপাঠিনীর ন এই কাশীনাথের দিকে তখন নিশ্চয় কাদম্বিনীর সম্ভাবনা সেখানে কম।

এর পর কিছুদিন আমি কলেজ থেকে ডুব দিয়েছি। তখন একটা বই লেখার সু

এসে গিয়েছে। কয়েকমাস কামাই করে আমি এই সুযোগটার সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করেছি। প্রণবেন্দু এ ব্যাপারেও সহায়। হাজিরার ব্যাপারটা ও ম্যানেজ করে দিয়েছে। বলেছে, "ওটা সামান্য ব্যাপার, তুমি লেখাটা ভালভাবে করো। ক্লাশের নোট্স আমি আর নমিতা তোমাকে দিয়ে দেবো।"

নমিতা বলেছে, "কাউকে কিছু বলার দরকার নেই, বই লেখার কাজে এগিয়ে যান। তারপর দেখুন না কী কাণ্ড হয়!"

সময়ের সঙ্গে এইভাবে লড়তে-লড়তে ফাইনাল পরীক্ষার সময় এসে গিয়েছে। লেখার কাজটাও মাথা থেকে তখনও নামাতে পারিনি। ব্যাপারটা যত সহজ হবে ভেবেছিলাম তত সহজ নয়।

প্রণবেন্দু বলেছে, "প্রথম বইটা মেয়েদের ফার্স্ট ডেলিভারির মতোই কঠিন।" প্রণবেন্দু কেন এখন প্রায়ই মাতৃত্বের তুলনা দিচ্ছে তা নিশ্চয় আন্দাজ করতে পারছেন। নমিতা মা হতে চলেছে। বেচারা এবার পরীক্ষা দিতে পারবে না। প্রণবেন্দুর মা বলেছেন, "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষা প্রত্যেক বছর হয়, সুতরাং চিন্তা কী?"

আমি এর পর পরীক্ষায় বসেছি। এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদে এতো অবহেলা সত্ত্বেও পাস করে গিয়েছি। আমার পাস করাটা উচিত হয়নি, কারণ অধ্যয়নে কোনো সময়ই দিতে পারিনি। কিন্তু পরীক্ষার দেবতা বড় খেয়ালী, তিনি কখন যে কার ওপর কৃপাবৃষ্টি করেন তার ঠিক নেই।

তারপর আমরা কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছি। যে যার কাজে ডুব দিয়েছি আমরা। নমিতার কথাই ধরুন। সে তার ছেলে আনন্দকে নিয়েই সারাক্ষণ ব্যস্ত। চাকরি, পরীক্ষা সব মাথায় উঠেছে। নমিতা বলেছে, "আনন্দর ওপর সারাক্ষণ কড়া নজর রাখতে হবে, বুঝতেই পারছেন। কার ছেলে দেখতে হবে তো! একটু নজর আলগা হলেই লেডিজম্যান হয়ে উঠবে!"

বেচারা প্রণবেন্দুর এখন শোচনীয় অবস্থা। প্রাকবিবাহ পর্বের প্রতিটি অ্যাডভেঞ্চারের জন্য এখন সুদসহ মূল্য দিতে হচ্ছে।

আর আমি ডুব দিয়েছি হাজার কাজে। বি-এ সার্টিফিকেটের জোরে কার্যক্ষেত্র কয়েকবার পরিবর্তন করেছি। মিসেস রায় ঠিকই বলেছিলেন, সামান্য একটা পরীক্ষা পাসের কাগজ অনেক সম্ভাবনার সিংহদ্বার খুলে দিতে পারে।

তাছাড়া রয়েছে আমার নতুন ভালবাসা—লেখা। আমি সেই দুর্লভ সৌভাগ্যবানদের একজন, যার প্রথম প্রচেষ্টাই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমার এখন পিছন দিকে তাকাবার সময় নেই। আমার প্রথম সাফল্য যাতে জীবনের শেষ সাফল্য না হয় সে-বিষয়ে এক দূরদর্শী লেখক আমাকে সাবধান করে দিয়েছেন।

অর্থাৎ আমি এখন সম্পূর্ণ নতুন এক জগতে। সাহিত্যপ্রচেষ্টা এবং সেই সঙ্গে জীবনসংগ্রামে আমাকে এমনই ব্যস্ত রেখেছে যে বছরের পর বছর সময় যে কীভাবে কেটে যাচ্ছে তার কোনো হিসেব নেই।

একমাত্র নমিতার সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন প্রণবেন্দু মাঝে-মাঝে রাত কলেজের কথা তোলে। কিন্তু নমিতাও আজকাল লাজুক হয়ে গিয়েছে, বাড়ন্ত ছেলের সামনে সেইসব পুরনো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করবার সাহস পায় না। আমি নিজেও একবার ভেবেছিলাম, ওই পাঞ্জাবী ড্রাইভারের ট্যাক্সিটা নিয়ে একটা গল্প লিখবো, কিন্তু নমিতার কথা ভেবে তা আর করিনি। লেখাটা তো মানুষকে আনন্দ দেবার জন্যে, কাউকে বিপদে ফেলবার জন্যে তো কথাসাহিত্যের সৃষ্টি হয়নি।

এরই মধ্যে প্রণবেন্দু এক-আধবার জিজ্ঞেস করেছে, "তুমি রাত কলেজের ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা উপন্যাস লিখবে না?"

নমিতা বলেছে, "ওর মধ্যে অভিনবত্ব কী আছে? কতকগুলো ছেলেমেয়ে একসঙ্গে জড়ো হয়েছিল। ক'দিন হৈ চৈ করেছে, তার পর সময়ের স্রোতে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। কেউ পাস করেছে, কেউ করেনি। শুধু ওই বেঞ্চিগুলো পড়ে রয়েছে এবং সেখানে আবার নতুন ছাত্রছাত্রী ভিড় করছে। এর মধ্যে কোনো নাটকীয়তা নেই, শুধু ধারাবাহিকতা আছে।"

নমিতার এসব বলার অধিকার আছে, কারণ নিয়মিত গল্প-উপন্যাস পড়ার অভ্যাসটা সে এখনও রেখে দিয়েছে।

আমিও ভেবেছি, জানাশোনা এতোগুলো ছাত্রছাত্রীর মধ্যে একটিমাত্র বিয়ের ফুল ফুটলো. এ-নিয়ে গল্প লেখার কোনো মানে হয় না। আর সব ছাত্রছাত্রীকে ঠিকমতো চেনার সুযোগ পেলাম না। একজন কাদম্বিনীর সঙ্গে দেড়ঘণ্টায় পদযাত্রায় একখানা উপন্যাস গড়ে ওঠে না। আর কী আছে? কয়েকটি বিভিন্ন প্রকৃতির রমণী। তাদের কেউ সুদর্শনা অথচ মাথামোটা, কেউ ডাইভোর্সের জন্যে অপেক্ষা করছে, কেউ বিধবা, আর কয়েকজন রমণী সুযোগ্য পাত্রের সন্ধান পেলে বিবেচনা করতে প্রস্তুত আছে। সর্বত্র সাবধানতা আছে, শালীনতা আছে, কোথাও বিন্দুমাত্র ব্যস্ততা নেই

লেখকজীবনের মস্ত সুবিধে, কোনো ঘটনাই চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যায় না। যারা অনেকদিনের জন্যে চোখের আড়ালে ছিল তারাই অনেক সময় অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে আসে চোখের সামনে।

সেবার কলকাতা থেকে ছোট্ট একটা শহরে গিয়েই সে অভিজ্ঞতা হলো। সভা উদ্যোক্তারা বলেছিলেন, তাঁরা ধনী নন, কোনোক্রমে প্রতিকূল পরিবেশে সাহিত্যের দুর্বল শিখাটি দূর দেশে জ্বালিয়ে রেখেছেন। সুতরাং আমি যদি তাঁদের সঙ্গে এক কষ্ট করতে রাজি হই...

এসব কষ্ট মাঝে-মাঝে খারাপ লাগে না। তাছাড়া সাহিত্য ও সচ্ছলতাকে তো কখনও একাসনে বসাতে আমরা অভ্যস্ত নই।

স্টেশনে পৌঁছতেই উদ্যোক্তারা বললেন, "মিসেস মজুমদার আপনার খোঁজ করেছেন। তাঁর ইচ্ছে আপনাকে তাঁর ওখানেই নিয়ে যাওয়া হোক।"

কে এই মিসেস মজুমদার ? আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। উদ্যোক্তাদের একজন বললেন, "আপনি মনে করতে পারছেন না, আর মিসেস মজুমদার বললেন আপনার খুব পরিচিত।"

আমরা ততক্ষণ সাইকেল রিকশ চড়ে সবুজ সাহিত্য সঙেঘর এক-কামরা ঘরে এসে পৌঁছেছি। সেখানে শুনলাম, একজন ভদ্রলোক একখানা চিঠি নিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

মিসেস মজমুদার আমার সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চান। উদ্যোক্তাদের একজন বললেন, "মিসেস মজুমদারের ইচ্ছে আপনি ওঁর ওখানে গেস্ট হোন। কিন্তু আপনার মতামত না জেনে আমরা কথা দিইনি। অনেক শিল্পী কারও বাড়িতে অতিথি হতে চান না, তাতে ওঁদের অসুবিধা হয়।"

এ-বিষয়ে আমার কোনো মতামত নেই। আমি সেই রুশী প্রবাদে বিশ্বাসী, যেখানে বলা হয়েছে, গেস্ট হচ্ছেন হোস্টের ক্রীতদাস ! তাঁর সমস্ত হুকুম তামিল করতে তিনি বাধ্য।

"সকালবেলায় সাহিত্য সভা সেরে আপনি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে আসুন", বললেন উদ্যোক্তারা। আমি তাতেই একমত।

ছুটির দিনে প্রভাতী সাহিত্য সভা যখন শেষ হলো তখন বেলা এগারোটা। সভার শেষেই শুনলাম, চাপা উত্তেজনা, স্বয়ং মিসেস মজুমদার অনেকক্ষণ এসে গিয়েছেন। মিস্টার মজুমদার এখানকার এক পাবলিক সেক্টর কোম্পানির কর্ণধার।

এই কর্ণধার কথাটা আমাকে বেশ আনন্দ যোগায়। সবার কান ধরে কাজ বের করে নেবার অশেষ শক্তি যিনি ধারণ করেন তিনিই কর্ণধার।

সভাসমিতিতে কিছু বলতে গেলেই আমার উদ্বেগ বাড়ে। যতক্ষণ না বক্তৃতা শেষ হচ্ছে ততক্ষণ কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারি না। আর যখন বক্তৃতা করি তখন কোনোদিকে আমি তাকাতে পারি না, ফলে কে এসেছে, কে শুনেছে, কে বিরক্ত হয়ে চলে যাচ্ছে তা আমার কিছুই নজরে পড়ে না। বক্তৃতার শেষে আমি এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাই। তারপর যেন আমার সংবিৎ ফিরে আসে।

আমার বিশ্রামকক্ষের দিকে মিসেস মজুমদার স্বয়ং এগিয়ে আসছেন, তাই অগ্রিম উত্তেজনা। মিসেস মজুমদার যে সাহিত্য সম্বন্ধে এতো আগ্রহী তা উদ্যোক্তাদের জানা ছিল না।

"চিনতে পারা যাচ্ছে ?" চোখের সানগ্লাস সরিয়ে রহস্যময় কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন মিসেস মজুমদার।

আমি প্রথমে হাত তুলে নমস্কার করলাম। তারপর হঠাৎ বলে উঠলাম, "কাদম্বিনী না ? আপনি, এখানে ?"

কাদম্বিনী এবার জোর পেয়ে গিয়েছে। "কাদম্বিনী কি না সন্দেহ থাকলে আর একবার ভাল করে দেখে নেওয়া হোক !"

না, আমার কোনো সন্দেহ নেই, এই কাদম্বিনীকেই আমি একদিন হ্যারিসন রোডের জ্যাম ঠেলে হাওড়ায় পৌঁছে দিয়েছিলাম।

আমার সমস্ত সামাজিকতার প্রোগ্রাম তোলপাড় হয়ে গেল। কাদম্বিনী এখনই আমাকে নিয়ে যাবে। সে বললো, "আমার জ্বর চলছে। তাই ভেবেছিলাম চিঠি পাঠিয়েই বিশিষ্ট অতিথিকে বাড়িতে আনানো যাবে। কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম, বিশিষ্ট সাহিত্যিকরাও এখন প্রটোকলের বন্দী। পুরনো বন্ধুর চিঠিতেও বরফ গলে না। তাই চলে এলাম, নিজের চোখে দেখতে, লেখক কত বড় হয়েছেন। পুরনো অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছেন কি না।"

আমার আর একটা আসর আছে সন্ধ্যায়। তার আগে পর্যন্ত আমি ফ্রি। কিন্তু এবার সত্যিই বন্দী হলাম।

কাদম্বিনীর নির্দেশে আমি তার গাড়িতে এসে উঠলাম। কাদম্বিনী উদ্যোক্তাদের বললো, "আপনাদের লেখক নিরুদ্দেশ হচ্ছেন না, মিটিংয়ের দশ মিনিট আগেই তিনি এখানে চলে আসবেন।"

কাদম্বিনী নিজেই ড্রাইভ করছে। গাড়িতে চড়েই তার সুর পাল্টে গেল। যতদূর মনে পড়ছে, পরস্পরকে আমরা 'আপনি' বলেই সম্বোধন করেছি।

কিন্তু আজ কাদম্বিনী হঠাৎ বলে উঠলো, "তুমি যে আমাকে চিনেছো. এই আমার ভাগ্য !"

আমারও সাহস বেড়ে যাচ্ছে, সময় বোধ হয় এইভাবেই অনেক দূরত্ব মুছে দেয়। আমি বললাম, "হোয়াট এ প্লেজেণ্ট সারপ্রাইজ ! তোমাকে যে এইভাবে ফিরে পাবো তা ভাবিনি।"

"তোমার মিষ্টি-মিষ্টি কথা রাখো। আমি নিজে ছুটে না-এলে দেখাই হতো না।" একটু অভিমান করছে কাদম্বিনী।

"আমি কেমন করে জানবো, আমার কলেজের বান্ধবীরা দূর-দূরান্তে এইভাবে রাজত্ব করছে ?"

"ইচ্ছে থাকলে সব জানা যায়। আমরা তো জেনে বসে আছি, ক্লাসের পিছনের দিকে যে-মানুষটা চুপচাপ বসে থাকতো, কোনো সাতে-পাঁচে থাকতো না, কোনো

মেয়ের সঙ্গে যার যোগাযোগ ছিল না, সে-ই কখন চুপিচুপি কেষ্ট-বিষ্টু লেখক হয়ে উঠেছে।"

"লেখক কিংবা গাইয়ে-বাজিয়ে হবার ওইটাই সুবিধে, কাদম্বিনী। কোনো কিছুই গোপন থাকে না।"

"গোপন রাখার চেষ্টা করেছিলে তুমি, ছদ্মনামে লিখে। কিন্তু সেবার কোথায় যেন সাহিত্য সভায় তোমার ছবি দেখলাম। তারপর মলিনা মৈত্রের সঙ্গে বাগডোগরা এয়ারপোর্টে দেখা হয়ে গেল। ওঁর সঙ্গে আমি একটা কনফারেন্সে যাচ্ছিলাম দার্জিলিঙে, আর মলিনা যাচ্ছিল বরের সঙ্গে বেড়াতে। ক'দিন খুব হই-চই করা গেল, তখনই খবর পাওয়া গেল, নমিতার পর-পর তিনটে ছেলে হয়েছে ! হবে না, সারাক্ষণ ছেলেদের পিছনে যারা ঘুরে বেড়িয়েছে তাদের বিয়ের পরে শুধু ছেলেই হয় ! অনেক বন্ধু-বান্ধবীর খবর পেলাম। রমলা সিকদারের নাকি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। স্বামী সুইসাইড করেছিল। প্রতিমা বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত কাউকেই বিয়ে করেনি।"

"আহা, প্রতিমা এখনও বিয়ে করেনি !"

"আমার একটুও দুঃখ নেই। আমাকে খুব জ্বালিয়েছিল। ভেবেছিল, ফ্যাটফেটে সাদা রঙ দেখলেই ছেলেরা আর কিছু চাইবে না।"

"তোমার রঙ-ও তো ফর্সা," আমি কাদম্বিনীকে মনে করিয়ে দিই সরসভাবে।

"প্রতিমার তুলনায় আমার রঙ কিছুই ছিল না। তবে বিয়ের পর একটু ঘষামাজা হয়েছে, এখন অন্তত আমাকে কালো বলতে পারবে না।"

কাদম্বিনী বললো, "প্রতিমার ওপর আমার একফোঁটা দয়া নেই। আমাদের সম্পর্কটা রুইন করে দেবার চেষ্টা করেছিল। উঃ কীসব চিঠি লিখেছিল আমার কর্তাকে ! কত ন্যাকামো ! অথচ ও জানে, আমরা তখন অনেকটা এগিয়ে গিয়েছি। সেসব চিঠি আমি এখনও রেখে দিয়েছি। ইচ্ছে হয়েছিল, যখন প্রতিমা বিয়ে করবে তখন ওর বরকে রেজিস্ট্রি করে পাঠিয়ে দেবো !"

"এসব করে কী হলো ? আমি তো কিছুই জানি না !"

"জানবে কী করে ?" কাদম্বিনী আজ নিজের সব কথা বলে মনটা হাল্কা করতে চায়। "তুমি তো শেষ বছরটা প্রায় ক্লাসই করলে না, সারাক্ষণ অন্য কাজে ব্যস্ত থাকলে। আমরা তো ভেবেছিলাম পরীক্ষাই দেবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দিলে এবং পাস করলে।"

"ওটা ভবিতব্য। পাস করার কথা নয় আমার," আমি অকপটে স্বীকার করি।

"দু'দিন পরে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং লেকচারার হবে তখন ঐসব কথা বোলো, ছাত্ররা মজা পাবে। আমরা তো সে সুযোগ পাবো না। আমার দুঃখ রয়ে গেল, বি-এ'টা পাস করা হলো না।"

কাদম্বিনী কি তা হলে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দেয়নি ? পড়াশোনায় সে তো বেশ ভাল ছাত্রী ছিল। কোথায় গোলমাল হলো ? কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সাহস হচ্ছে না।

"ঐ প্রতিমা বিশ্বাসই আমার শনি বলতে পারো। ভেবেছিল, আধো-আধো বুলি, আর শরীর দেখিয়েই যা-খুশি তাই করে যাবে। ভেবেছিল, কাদম্বিনীটা কোনো কর্মের নয়।"

আমরা মস্ত বড় এক বাংলোর সামনে হাজির। সামনে সশস্ত্র দারোয়ান দাঁড়িয়েছিল, মেমসায়েবকে সেলাম করলো।

কাদম্বিনী তখন বলছে, "আমি যা চেয়েছিলাম, তা আমি আদায় করে ছেড়েছি।"

কাকে চেয়েছিল কাদম্বিনী ? এ-কথা মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করা যায় না।

কাদম্বিনী তখন বলছে, "কারও ভাগ্যের দিকে কু-নজর দিতে নেই, এইটাই হচ্ছে শিক্ষা। রমলা, মলিনা, প্রতিমা তখন সবাই জানে ওর সঙ্গে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি। আমার এমন অবস্থা যে আমি ওর কথা ছাড়া কিছুই ভাবতে পারি না। ওকে না পেলে আমার কিছু একটা হয়ে যাবে। যারা আমার অবস্থা দেখেছে তারা মায়ায় পড়ে আমার পাকা ধানে মই দিতে আসেনি। আর ঐ প্রতিমা বিশ্বাস আমার ব্যাপারটা জেনেও তখন ফাঁদ পাতছে। ওর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছে এবং সেবার কী একটা কাজের ছুতোয় ওর অফিসে গিয়ে হাজির। তারপর শুরু হয়েছে পত্রাবলী। মানুষ যত পাজী হয় অনেক সময় তার চিঠি তত সুন্দর হয়।"

"তুমি দামী কথা বলেছো, কাদম্বিনী। এটা কোথাও লাগিয়ে দেবো।"

"তোমার যা খুশি কোরো। যদি তুমি মেয়েরা কত ন্যাকা অথচ সেয়ানা হতে পারে তা দেখাতে চাও তা হলে প্রতিমা বিশ্বাসের সমস্ত চিঠিগুলি ছেপে দিতে পারো. একটুও খাটতে হবে না তোমাকে।"

প্রতিমা বিশ্বাসের কেসটা আমি জানি না, সে বেচারাও আমার সঙ্গে পড়েছে। সুতরাং আমার উচিত নয় কোনো অশালীন মন্তব্য করা।

কিন্তু কাদম্বিনীর রাগ এখনও যায়নি। সে বললো, "যদি কখনও দেখা হয় ওই প্রতিমা বিশ্বাসের সঙ্গে, দিও আমাদের সম্বন্ধে রিপোর্ট। বোলো, তোমার সমস্ত অপচেষ্টা সত্ত্বেও কাদম্বিনী রাজরানী হয়ে বসে রয়েছে। শুধু আমার বি-এ পাস করাটা হলো না। কিন্তু আমি যেভাবে চেয়েছি সেভাবেই আমার স্বামীকে তৈরি করে নিয়েছি অনেকে মাটির পুতুলকে রাজপুত্তুর সাজিয়ে নিতে জানে, আবার অনেকে রাজপুত্তুর পেয়েও তাকে মাটিতে ফেলে রাখে।"

অনেকদিন পরে দেখা। আমার সঙ্গে তেমন অন্তরঙ্গতাও ছিল না। কিন্তু কাদম্বিনী যে এইভাবে কথা বলতে পারে তা আমাকে একটু অবাক করে দিচ্ছে।

কাদম্বিনী নিজেই বললো, "রাগ করছো না তো? এই মরুভূমির মধ্যে বন্দী হয়ে থাকি। লোক খুঁজে পাই না পুরনো দিনের কথা বলার।"

"জেলখানা কই? এ তো প্রাসাদ, কাদম্বিনী।"

হাসলো কাদম্বিনী। "নিজের চোখেই সব দেখে যাও। ইংরেজরা প্রয়োজন হলে প্যালেসকেও জেলখানায় চেঞ্জ করতো— যেমন আগা খাঁ প্যালেস, পুণা।"

আমি চুপচাপ থাকতে চাই। মেয়েদের মুখের ঢাকনা একবার খুললে, কিছুটা গ্যাস বেরিয়ে যেতে সময় দিতে হয়।

কাদম্বিনী বললো, "তুমি তো আমার কোনো খবরই রাখো না। সেই যে আমার সঙ্গে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত গেলে, কলেজের মাস্টারমশায় ছাড়া আর কারও কথাই তুললে না।"

"তখন আমি খুব বিব্রত, কাদম্বিনী। বাড়ির জন্যে রোজগার করা ছাড়া আমার তখন অন্য কোনো কাজই নেই। কিন্তু নমিতার কাছে তোমার সব খবর তো শুনেছি।"

"কী শুনেছিলে?"

"বাঃ! তোমার মা অসুস্থ, তাই তোমার দিন কলেজে পড়া হলো না। তোমার জন্যে নমিতা দুঃখ করেছে, সমস্ত দুপুর মাকে তুমি সেবা করতে, যতক্ষণ না বাবা ফিরে আসতেন।"

"না, আমার কোনো দুঃখ নেই। রাত্রে না পড়লে তোমাদের সঙ্গে দেখাই হতো না। আর দেখা না হলে এই সরকারী কোম্পানির একনম্বর বাংলোর মেমসায়েবও হওয়া যেতো না।"

"আমি যেবার তোমাকে গঙ্গার ওপারে পৌঁছে দিয়ে এলাম সেবার ভেবেছিলাম একবার তোমাকে মায়ের কথা জিজ্ঞেস করবো। কিন্তু সাহস হলো না। ভয় হলো, তুমি যদি হঠাৎ প্রশ্ন করো কোত্থেকে এসব জানলেন? প্রণবেন্দু তখন এইসব খবর সংগ্রহ করছে মিস নমিতা চ্যাটার্জির কাছ থেকে, আমরা ভায়া প্রণবেন্দু সেকেণ্ড হ্যাণ্ড খবর পাচ্ছি।"

"আমি ভেবেছিলাম, আমরা দু'জন সেদিন দু'জন সম্পর্কে অনেক খবরই জানতে পারবো। কিন্তু তোমার গোমড়া মুখ দেখে আমিও কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলাম না।"

"অভাব-অনটন মানুষকে বড় গোমড়া করে দেয়, কাদম্বিনী। সংসারে সবার মুখে হাসি ফোটাতে ফোটাতে কোন সময়ে যে প্রৌঢ় বয়সে হাজির হলাম তার খেয়াল নেই। আর প্রৌঢ়দের হাসির কোনো মূল্য নেই, কে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখে? কে তাদের নিয়ে মাথা ঘামায়? ঋতু একটাই আছে তার নাম বসন্ত. কিন্তু বড্ড সেনসিটিভ সময়, বড্ড অপলকাণ্ড বটে।"

"তুমি আমাদের নিয়ে যখন গল্প লিখবে তখন এই কথাগুলো বসিয়ে দিও। আমরা এর মূল্য বুঝবো।"

আমি বললাম, "যাদের সঙ্গে পড়াশোনা করেছি তাদের নিয়ে গল্প না-লেখাই ভাল।"

"বা রে। যাদের সঙ্গে পড়েছো তাদের জীবনে যদি গল্প থাকে তা হলে তুমি কী করবে? ঐ প্রতিমা বিশ্বাসকেই দেখো না। ও জানে, একটা মানুষের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। এক আপিসে আমি কাজে ঢুকেছি।"

"তুমি তো কাজ করতে না কাদম্বিনী।"

"সে তো থার্ড ইয়ারের গোড়ায়। তারপর তুমি কোনো খবর রাখোনি। মা যখন চলে গেলেন তখন পুরনো বিদ্যাটা কাজে লেগে গেল। আমি অফিসে ঢুকলাম। ওমা ইণ্টারভিউ নিচ্ছেন যিনি তিনি আমার সঙ্গেই কলেজে পড়েন। প্লেজেণ্ট সারপ্রাইজ স্টেনোর চাকরিটা হয়ে গেল। স্পেশাল এক অবস্থা। যিনি প্রভু তিনিই সহপাঠী রসিক লোকও বটে। মাঝে-মাঝে বলতেন, কলেজের পরীক্ষায় মিস সিংহরায় আপনি যদি আমার থেকে ভাল করেন তা হলে আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে।"

"আশা করি অমন কোনো বিপদে ফেলবার পরিকল্পনা তোমার ছিল না।"

"ইচ্ছে থাকলেও, ক্ষমতা কোথায়? যা সাফ মাথা। একবার শুনলেই ব্রেনে সাজানো হয়ে যায়। পরীক্ষায় ওঁকে ছাড়িয়ে যাবার কোনো মতলবই ছিল না আমার আমি চাইতাম উনি সব ছাত্র থেকে ভাল করুন। কিন্তু বিপদ বাধালো তোমার ওই প্রতিমা বিশ্বাস। আমি তখন ওখানে মন দিয়ে ফেলেছি, দিন রাত ভগবানকে ডাকছি ঈশ্বর মুখ তোলো, দয়া করো।"

"কিন্তু এই পৃথিবী দয়ার জায়গা নয়। প্রতিমা বিশ্বাস ছিনেজোঁকের মতো ওঁর পিছনে লেগে রয়েছে। অফিস টাইমে কয়েকবার টেলিফোনও গিয়েছে। সেই কল যে আমি ওঁর ঘরে দিয়েছি প্রতিমা তা বুঝতে পারেনি।"

"আমি একবার ভেবেছি, ক্লাশের মেয়েদের কাছে খবরটা লিক করে দিই। কিন্তু মেয়েদের সম্মান মেয়েরা রাখবে না তো কে রাখবে, এই ভেবে ওকাজ করিনি।

কাদম্বিনীর নিজের অবস্থাও তখন যে ভাল নয় তা বুঝতে পারছি।

"ক্রমশ মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠছে। সারাদিন অফিসে দেখি, বিকেলে কলেজে দেখি তবু ছুটির দিনগুলো অসহ্য মনে হয়।

প্রতিমা বিশ্বাস আমার পাশেই বসতো। সে জানে, কার জন্যে আমার এই অবস্থা কিন্তু সব জেনেও সেই লোকের সঙ্গে সে ভাব করেছে। ইলা ভাদুড়িকে সে তো বলেছিল, 'ওই লোককে জিততেই হবে আমাকে'!"

"তারপর?" আমি আগে হলে জিজ্ঞেস করতে পারতাম না।

কাদম্বিনী বললো, "যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যে হয়। বস্ গিয়েছেন মিটিংয়ে। কাজের সন্ধানে ওঁর ঘরে ঢুকতেই দেখি প্রতিমা বিশ্বাসের লম্বা চিঠি। ইনিয়ে-বিনিয়ে কত প্রেমের কথাই লিখেছে, ভাবলে গা রি-রি করে ওঠে!"

"আমি এসব কোনো খবরই তখন রাখিনি।"

"রাখবে কী করে? তুমি তখন তো কলেজ থেকে উধাও। আবার যখন শুনলাম, প্রতিমা বিশ্বাস একদিন বসের গাড়িতে বিকেলে লিফট নিয়েছে তখন আমার কী দুশ্চিন্তা!"

"সামান্য লিফট নেওয়ায় কী দুশ্চিন্তার আছে?"

"রাখো রাখো! ভাবছো, নমিতা ও প্রণবেন্দুর ব্যাপারটা কেবল তুমিই জানো। নমিতা নিজেই আমাদের বলেছে, কোনো ছেলে সম্বন্ধে খুব সিওর না হলে কখনও বাড়ি ফেরার সময় তার সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠবে না। যদি নেহাত আটকে যাও তা হলে বাঙালী ড্রাইভার পাশে ক্লিনার রয়েছে এমন ট্যাক্সি দেখবে!"

"আর এই প্রতিমা বিশ্বাস কী ভেবে লিফট নিচ্ছে বলুন তো? আমি এক অফিসে কাজ করি, আমি কখনও তো ওর ট্যাক্সি শেয়ার করিনি। আর অফিসের গাড়ির তো কথাই ওঠে না, সমস্ত অফিসে টি-টি পড়ে যাবে।"

কাদম্বিনী বললো, "আমিও শেষ পর্যন্ত প্রতিমা বিশ্বাসের হ্যাংলামো দেখে মরিয়া হয়ে উঠছি। ওকে একটা উচিত শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।"

"আরও চিঠি আসছে?" আমি জানতে চাই।

"অবশ্যই আসছে। এবং ভদ্রতা করে দু'একটার উত্তরও দিচ্ছেন উনি। চিঠির উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে উনি সায়েবলোক, চরম শত্রু চিঠি দিলেও উনি উত্তরে ধন্যবাদ জানাবেন।"

কাদম্বিনী বললো, "অথচ প্রতিমা বিশ্বাসকে কলেজে দেখলে মনে হবে ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। আমার বস্-কে যেন চেনেই না!"

"ব্যাপারটা ফাইন্যাল পরীক্ষা এলেই হয়তো কেটে যেতো। প্রতিদিনের সাক্ষাৎ না থাকলে অনেক ইচ্ছার স্রোত দুর্বল হয়ে পড়ে।"

কাদম্বিনী বললো, "আমিও তাই ভেবেছিলাম। বি-এটা পাস করবার ইচ্ছে আমার এবং বস্-এর দু'জনেরই ছিল।

কিন্তু একদিন একখানা চিঠি দেখে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। স্টেনো হিসেবে সব চিঠি পড়বার অধিকার আমার আছে কি না আমি জানি না, কিন্তু প্রতিমা বিশ্বাসের ওই পাকানো-পাকানো হাতের লেখা দেখে আমি আর মাথা ঠিক রাখতে পারলাম না।"

কাদম্বিনী বললো, "মোক্ষম টোপ ফেলেছে প্রতিমা বিশ্বাস। লিখেছে, আগামী শনিবার সকালে ডায়মন্ড হারবার বেড়াতে যাবার পরিকল্পনা রয়েছে একা-একা।

সেকেন্ড স্যাটারডে সরকারী অফিস ছুটি। বুঝে-সুঝেই কোন ট্রেন কখন ছাড়ে, কোথায় বিশ্রাম নেবে সব লেখা।"

"আমার তখন মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছে। আমি দেখলাম, ব্যাপারটা বড্ড এগিয়ে যাচ্ছে, প্রতিমা বিশ্বাসের সাহস বড্ড বেড়ে যাচ্ছে। আমি তখন আপনার একটা গল্পে যেরকম পড়েছিলাম সেই অনুযায়ী প্রস্তুত হলাম। এমন ডেলিকেট ব্যাপার কাউকে পরামর্শও করা যায় না।"

"গল্পও তা হলে মানুষের গাইড হয়, কখনও কখনও কাজে লাগে!"

"অবশ্যই লাগে!" কাদম্বিনী বললো। "গল্পে যেসব শিক্ষা পাওয়া যায় তা ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারলে অন্য কোনো বন্ধুর প্রয়োজন নেই।"

"যা বলছিলাম," আবার শুরু করলো কাদম্বিনী। "আমি তখন বেপরোয়া। আমি তখন যতই নিজেকে বিশ্লেষণ করছি ততই মনে হচ্ছে আমি ওঁকে যতো ভালবাসি তার থেকে অপছন্দ করি ওই প্রতিমা বিশ্বাসকে। শরীরখানার গর্ব বড্ড বেশি মেয়েটার, যেন ধারণা, মেয়েদের রঙ ছাড়া আর কিছুই পুরুষ মানুষের নজরে পড়ে না।"

আমি নীরবে কাদম্বিনীর কথা শুনে যাচ্ছি। সে বললো, "আমি তখন ম্যাগাজিনে সদ্য প্রকাশিত আপনার গল্পখানা বার বার পড়ে চলেছি। আর এদিকে লক্ষ্য করলাম, বস্-ও শনিবারে অফিসে আসবার একটা সম্ভাবনা এড়িয়ে গেলেন। কাজটা প্রয়োজন হলে রবিবারে করতে রাজি তিনি। আমি অঙ্কটা ছকে ফেলেছি। আমার মাথায় তখন অন্য কোনো চিন্তা নেই। আমি শুক্রবার সকালে মোক্ষম চাল দিলাম। অফিসের বেয়ারা রমেনকে দিয়ে একটা টেলিফোন করালাম ওই প্রতিমা বিশ্বাসের অফিসে। রমেন তুখোড় ছেলে, এক সময়ে সি-আই-ডি'তে কাজ করেছিল। সোজা মেসেজ দিলো প্রতিমা বিশ্বাসকে, সায়েব এই শনিবার কলকাতায় থাকছেন না। পরের শনিবার অবশ্যই থাকবেন।

প্রতিমা বিশ্বাস ততক্ষণে টেলিফোন নামিয়ে দিয়েছে। আর কাদম্বিনী ভাবছে, সে জোর করে বলতে পারে, প্রতিমা বিশ্বাসকে শনিবার সকালে ৭-৪৫-এর ডায়মন্ড হারবার লোকালে দেখা যাবে না।

আমি যে গল্পটা লিখেছিলাম তার আলোকে পরবর্তী দৃশ্য কী হতে পারে তা ভেবে শঙ্কিত হচ্ছি।

আমার গল্পে আছে, দুই প্রতিদ্বন্দ্বিনী নায়িকার একজন অপরজনকে ঠকিয়ে নির্দিষ্ট গোপন স্থানে অপেক্ষা করতে লাগলো। নায়ক একজনের আমন্ত্রণে সেখানে উপস্থিত হয়ে অপরজনকে সেখানে দেখে বিস্মিত হলেও নিজেকে সামলাতে পারলো না। নায়ককে পরিপূর্ণ বন্দী করার জন্যে চরম মূল্য দিয়েও প্রতিদ্বন্দ্বিনীর ওপর কঠোর প্রতিশোধ নিলো নবীনা নায়িকা।

তারপর সব গল্পে যেরকম হয়ে থাকে। নায়কের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল নবীন

নায়িকার, যদিও এই প্রতিশোধের এবং বঞ্চনার ব্যাপারটা দীর্ঘদিন অপ্রকাশিত থেকে গেল। যৌবন বয়সের অপরাধের কথা বার্ধক্যে স্বীকার করলে কোনো গ্লানি থাকে না।

কাদম্বিনী আমাকে চিন্তায় ফেলে দিচ্ছে। যা আমি কল্পনা থেকে লিখেছিলাম, তা লেখার পরে সত্যি হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা লক্ষ্য করে আমি চিন্তিত হয়ে উঠলাম।

কাদম্বিনী বললো, "যা ভেবেছি তাই! প্রতিমা বিশ্বাসের কোনো দেখা নেই। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ট্রেনে চড়লেন আমার প্রাণেশ্বর।

এরপর ঠিক অঙ্কের মতো স্টেপগুলো মিলে গেল। আমার সঙ্গে ওঁর দেখা হলো ডায়মন্ড হারবার স্টেশনে। আমি একা একা উইক এন্ড ট্যুরে বেরিয়ে পড়ি শুনে খুব অবাক হলেন। আমি বললাম, 'আমার প্রিয় জায়গা 'অবসারিকা' লজ। ওইখানেই একটু বিশ্রাম নিই প্রয়োজন হলে।'

তারপর তোমায় নিশ্চয় বলতে হবে না। তোমার লেখা থেকেই তো মতলবটা আমি নিয়েছি। অবসারিকা লজে আমি চরম প্রতিশোধ নিয়েছি ওই প্রতিমা বিশ্বাসের পর। চিরদিনের মতো মানুষটাকে বেঁধে ফেলেছি শনিবারের সেই অপরাহ্ণে।"

আমি শুনছি আর শিউরে উঠছি। "তুমি ভীষণ ঝুঁকি নিয়েছিলে কাদম্বিনী। গল্পের নায়িকাদের যা মানায় তা কলেজের মেয়েদের মানায় না অনেক সময়। এখনকার পুরুষমানুষ বড় বিপজ্জনক। একদিন বিকেলের চরম মূল্যেও অনেক সময় তাকে বাঁধা যায় না, বরং নিজেরই বিপদ বেড়ে যায়।"

"বা রে! তুমিই না লিখেছো, নো রিস্ক নো গেন। যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েছি, যথেষ্ট লাভও হয়েছে। আমাকে চাকরি ছাড়তে হয়েছে, কিন্তু আমি স্বামী পেয়েছি। মনের মতন স্বামী। অসুস্থ শরীরে ওই প্রতিমা বিশ্বাসের সঙ্গে আবার দেখা হবে এই ঘেন্নায় আমি কলেজ ছেড়ে দিয়েছি।"

"আর তোমার স্বামী?"

"পত্রপাঠ ওর-ও রাত কলেজ বন্ধ করে দিয়েছি। আমি ওকে বলেছি, সায়ান্সের লোক আর্টসের পণ্ডিত হয়ে কোনো লাভ নেই। তুমি বরং কস্টিং-এর শেষ পরীক্ষাটা দাও। অনেক কদর হবে!"

আমাকে আপ্যায়ন করবার জন্যে চায়ের অর্ডার দিতে কাদম্বিনী এবার একনম্বর হলের ভিতরে ঢুকে গিয়েছে। আমি দেখলাম, ফায়ার প্লেসের ওপর দু'খানি রঙিন ছবি শোভা পাচ্ছে। একখানি অবশ্যই কাদম্বিনীর, সেই যেরকম কলেজে দেখেছিলাম, তার পাশেই যার ছবি সে আমাদের কলেজের সেরা ছাত্র কাশীনাথ মজুমদার।

ওদের বিবাহবন্ধনের পর অনেক সময় বয়ে গিয়েছে। সৌভাগ্যবতী কাদম্বিনী আরও কর্সা হয়েছে, সেই সঙ্গে শরীরের ওজনও একটু বেড়েছে, যদিও তা বিপদসীমা অতিক্রম করেনি। কাদম্বিনী এখন অনেক স্মার্ট হয়েছে।

আমার চায়ের ব্যবস্থা করে কাদম্বিনী ফিরে এসে বললো, "বি-এ পরীক্ষা না দি
ওর কোনো ক্ষতি হয়নি, বরং কস্টিং-এ পরীক্ষাটা খুব কাজে লেগে গেল। ধাপে
ধাপে ও এগিয়ে গিয়েছে। এখন একটা পুরো ডিভিশনের কর্তা—এখানকার এ
পাবলিক সেকটর কোম্পানির মুকুটহীন সম্রাট বলতে পারো। ও যখনই সাহিত্যে
জন্যে দুঃখ করতো তখনই আমি বলতাম, ঘরে বসে যত খুশি আমার স
শেক্সপীয়ার, শেলী, কীটস, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র আলোচনা করো, কিন্তু ওই রা
কলেজে তোমাকে আর ফিরতে দিচ্ছি না।"

কাদম্বিনী এবার গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করলো, "আমাদের বিয়ের পরই ও
কেরিয়ারের পথটা তর তর করে খুলে গেল। আমি ঠিক করেছিলাম, আমার য
কষ্টই হোক, ওকে কলকাতায় রাখবো না। কলকাতা মানেই তো ওই প্রতিমা বিশ্বাসে
হাতের গোড়াতে থাকা। আমি সারাক্ষণ অফিসে থাকছি না যে টেলিফোন এবং চিঠি
ওপর কড়া নজর রাখবো।"

কাদম্বিনী জানালো, ওর পরামর্শমতোই কাশীনাথ সরকারী অফিস থেকে এ
সরকারী কোম্পানিতে বদলি নিয়েছে। এবং তারপরেই সৌভাগ্যের পথ খুলে গিয়েছে
"আমার গাইডেন্সে। কাশীনাথ যদি একটা নাটক হয় তা হলে বলতে পারো আমি
তার পরিচালিকা, প্রযোজিকা এবং সুরকার।"

কাদম্বিনীর বলার অধিকার আছে, কারণ নতুন এই সরকারী কোম্পানিতে ঢোকবা
পর থেকেই অবিশ্বাস্য উন্নতি করেছে কাশীনাথ এবং এখন এই একনম্বর বাংলো
বাসিন্দা হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।

"কোথায় শ্রীমান কাশীনাথ?" আমি জিজ্ঞেস করি। "এতোদূরে এসে তার স
দেখা না হলে দুঃখের শেষ থাকবে না।"

কাদম্বিনী জানালো, "ওর কথা আর বোলো না। ও জানে তুমি আসছো, আ
ওকে বলেছি, দু'জনে মিলেই আমাদের গল্পটা বলবো যাতে সামনের পূজোর সম
আমাদের সহপাঠী-সহপাঠিনীরা সবাই কোনো পত্রিকায় গল্পটা পড়তে পারে। ও এক
লজ্জা পাচ্ছিল, কিন্তু এসব বিষয়ে আমিই জেনারেল ম্যানেজার এবং তোমার ব
আমার একজন অ্যাসিসটেন্ট ছাড়া কিছুই নয়। সমস্ত সিদ্ধান্ত আমিই নিতে পারি।

কাদম্বিনী বললো, "ও বেচারা নিজেই তোমাকে স্টেশনে পাকড়াও করতে যে
কিন্তু হঠাৎ এখান থেকে ষাট মাইল দূরে মাইনসে কী এক শ্রমিক গোলযোগ হয়ে
অমনি ছুটতে হলো। খুব দুঃখ করলো যাবার আগে, তোমার কাছে অ্যাপলজি চাইবে
কিন্তু আমি ওকে বলেছি, অফিসের হাঙ্গামা পেলে তোমার আনন্দের সীমা থাকে ন
তুমি ওই সবেই ডুবে থাকতে ভালবাস। শেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ, বউ, কোনো কিছুতে
আগ্রহ নেই তোমার আজকাল!"

কাদম্বিনীর সরস কথাবার্তা শুনে আমি আনন্দ পাচ্ছি। বললাম, "তোমার আন্ডারে কাশীনাথের এখন সুখের শেষ নেই এটা বুঝতে পারছি।"

চোখ দুটো বড়-বড় করলো কাদম্বিনী। "একটা ব্যাপারে খু-উ-ব দুঃখ। আমি বলেছি, অফিসে যতক্ষণ ইচ্ছে কাজ করো, যেখানে খুশি ট্যুর করো, কিন্তু লেডি স্টেনো আর রাখা চলবে না। কিছুতেই না।"

"নিজে একজন লেডি স্টেনো হয়ে এইভাবে নিজের শ্রেণীস্বার্থে ঘা দিচ্ছ তুমি! এটা কি ঠিক কাদম্বিনী?" আমি গম্ভীরভাবেই প্রসঙ্গটা উত্থাপন করি।

"ও ব্যাপারে যা বলেছি তা ফাইন্যাল, আমি কোনোরকম ঝুঁকি নেবো না। আমি নিজে এই কোম্পানিতে এসে ওর পার্সোনাল স্টেনো সিলেকশন করেছি। অফিসে ওই গুঁফো রামনারায়ণ চক্রবর্তীকে নিয়েই মিস্টার কাশীনাথ মজুমদারকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে ফর দি রেস্ট অফ হিজ লাইফ।"

"বড়-বড় অফিসারের বউরা ভীষণ একগুঁয়ে হয়। তাদের সঙ্গে তর্ক করে লাভ হয় না, শুনেছি।" আমার কথা শুনে কাদম্বিনী খুব হাসলো।

ঠিক সেই সময়ে ঘরে একটি আট ন'বছরের ফুটফুটে ছেলে ইস্কুলের ড্রেস পরে ঢুকলো। ছেলেটির মুখে কাশীনাথের ছায়া এমনই প্রবল যে বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই সে কে। আমাকে একটা প্রণাম করেই সে টুক করে বিদায় নিলো।

কাদম্বিনী সস্নেহে বললো, "ডায়মন্ড হারবারের স্মৃতি এই সেই শ্রীমান, যার আগমনের জন্যে আমার বি-এ পরীক্ষা দেওয়া হলো না। এর জোরেই আমি কাশীনাথকে পেয়েছি।"

আমি জানতে চাইলাম, "ওর কী নাম রেখেছো?"

কাদম্বিনী সগর্বে বললো, "তখন তো আর সাহস করে নামের জন্যে সাহিত্যিকের কাছে যেতে পারিনি। ভেবেচিন্তে নিজেই একটা নাম দিয়েছি। পবিত্রকুসুম মজুমদার—ছোট হয়ে ওর কর্মক্ষেত্রে হয়ে যাবে পি কে মজুমদার। নামটা একটু সেকেলে-সেকেলে বটে, কিন্তু আমার খু-উ-ব ভাল লাগে," এই বলে আমার সহপাঠিনী কাদম্বিনী মজুমদার মনের সুখে হাসতে লাগলো।

রাত কলেজের সময় পিছনে ফেলে অনেক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন আমি সাহিত্যজীবনের সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েছি।

আমার বয়সও বেড়েছে। আমি দু'একবার বিদেশেও ঘুরে এসেছি। সেই সব অভিজ্ঞতার কাহিনী এখানে ওখানে কিছুটা লিপিবদ্ধ করেছি আমার বিদ্যাবুদ্ধিমতন।

বিদেশে একবার পদার্পণ করলেই বিদেশ মানুষের ঘাড়ে চেপে বসে। স্বদেশে ফিরে এলেও মানুষটা একা থাকে না। কোথায় যেন পরিবর্তন এসে যায়। সাধে কি আর কালাপানি পেরুনো সম্পর্কে আমাদের দেশে পুরাকালে এতো নিয়মকানুন ছিল।

বিদেশে যদি কিছু বন্ধু বা আত্মীয়স্বজন থেকে যায় তা হলে তো কথাই নেই। আমার দাদা, কাকা, জ্যাঠা কেউ বিদেশে নেই; সুতরাং পিছুটানের কথা না-ওঠাই উচিত। কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদে দু-একটি ভাগ্নী আছে। তারা এক-একজনই একশো। এরাই আমার যোগসূত্র সাগর পারের সঙ্গে। এদের এড়ানো যায় না। বিশেষ করে বাড়িতে যদি একটা টেলিফোন থাকে। এই টেলিফোন আমাকে রাখতে হয়েছে ভাগ্নীদের ইচ্ছা অনুযায়ী, যাতে সময়ে-অসময়ে মর্জি অনুযায়ী, তারা আমাকে জ্বালাতন করতে পারে সুদূর বিদেশ থেকে।

সেবার আমেরিকার নিউজার্সি থেকে সাগর পারের টেলিফোন বার্তা পেয়ে প্রথমেই যার কথা আমার মনে পড়েছিল তার নাম রমাপতি কর্মকার। অথচ রমাপতি দু'দিন আগে যখন আমার বাড়িতে এলো তখন আমি তার সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বললাম না।

রমাপতি কর্মকার আমার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বসেছিল। দোষটা পুরোপুরি আমার নয়। রমাপতি আমাকে তার আগমন পরিকল্পনা আগে থেকে জানায়নি। সময়ের অভাব যতই প্রকট হচ্ছে ততই বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে যখন-তখন মানুষের সঙ্গে দেখা করাটা কষ্টকর হয়ে উঠছে, বিশেষ করে রবিবারের সকালবেলায় যখন জীবনযাত্রার হাজার হাঙ্গামা বেমালুম ভুলে গিয়ে একমনে কাগজকলম নিয়ে একটু লিখতে বসি।

কিন্তু যে-পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছি এবং অর্ধ-শতাব্দীর সীমারেখা অতিক্রম করেছি সেখানে রবিবারের সকালটা অপচয় করার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছিল। আমাদের পরিচিত

হলে আগাম ঠিকঠাক করে কেউ কখনও কারও সাক্ষাৎপ্রার্থী হতো না। রেশনের
ালের মতন সময়কে কেউ মেপে-মেপে ব্যবহার করে না। সময়ের কাছ থেকে কারও
কোনো প্রত্যাশাও ছিল না। কোনোরকমে দিন কাটলেই মানুষ সন্তুষ্ট। হিসেবনিকাশের
খাতায় বন্দী হয়ে জীবনযাপন প্রায় সকলেরই অজানা।

রমাপতি কর্মকারও নিশ্চয় সেই মনোবৃত্তি নিয়েই আমার সঙ্গে সকালবেলা কথা
বলতে এসেছিল। লেখায় যত বাধাই পড়ুক, গল্পের বুননে সাময়িক যতই জট পাকুক,
রমাপতির সঙ্গে আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে দেখা করতেই হবে। কারণ আমার স্ত্রী,
বন্দনা ইতিমধ্যেই টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে একাধিকবার উদ্বেগ প্রকাশ করে
গিয়েছেন : "একটা মানুষ এই সকালে কত দূর থেকে কষ্ট করে বাড়িতে এসেছেন ;
তোমাকে খবর পাঠানো হয়েছে, আর তুমি চেয়ার ছেড়ে উঠছোই না!"

স্ত্রীকে আমি বহুবার সবিনয়ে নিবেদন করেছি, "লেখার কাজে মনোসংযোগ লাগে ;
ট করে উঠবো বললেই ওঠা যায় না। যে জটিল প্যারাগ্রাফটা সামলাতে নাস্তানাবুদ
খাচ্ছি সেটা শেষ না করে উঠে পড়লে খেই হারিয়ে যেতে পারে।"

স্ত্রী ধৈর্য সহকারে আমার বক্তব্য শোনেন। কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস করেন না যে
মিনিট কারুর সঙ্গে সৌজন্যের বিনিময় করলে মহাভারত রচনায় অসম্পূর্ণ থেকে
াবে, তা ছাড়া সামাজিক মানুষ হিসেবে আমার সুনাম সংরক্ষণ সম্পর্কেও গৃহিণী
র্বদা সচেতন। মানুষ যদি ভুল বোঝে যে আমি নিজে গুরুত্ব জাহির করার চেষ্টায়
নিজেকে দুর্লভ করে তুলছি তা হলে দ্রুত বদনাম রটাবে এবং আমার সামাজিক ভাবমূর্তি
কলঙ্কিত হবে।

রমাপতির সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে আমাকে বিস্তারিতভাবে অনেক কথা
লিখতে হবে। কিন্তু আপাতত মার্কিনমুলুকের নিউজার্সি শহরের ফোন, যা ভারতীয়
বিদেশ সঞ্চার নিগমের মাধ্যমে এখানে এসেছে, তা সেরে ফেলা যাক।

টেলিফোনের অন্য দিকে রয়েছে আমার ভাগ্নী, সুচরিতা ওরফে খুকু যে দীর্ঘকাল
প্রবাসিনী, যাদের ইদানীং নামকরণ হয়েছে অনাবাসিনী। এইরকম শ্রুতিকটু শব্দ ভারত
সরকার কী করে সৃষ্টি করলেন এবং বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের উপহার দিলেন
। আমার চিন্তার অগম্য।

"হ্যালো মামা, তুমি একদম আমাদের ভুলে গেলে!"

"দিদির মেয়েকে কি ভোলা যায়? ইচ্ছা থাকলেও আইন অনুযায়ী ভাগ্নীদের
ইভোর্স সম্ভব নয়, খুকু।"

"ওঃ মামা! ভাগ্নীবিচ্ছেদ নয়। ভুলেও খোঁজখবর করো না—বাড়িতে টেলিফোনটা
ন রয়েছে?"

টেলিফোন তো রয়েছে কিন্তু প্রতি সেকেন্ডে ভাবের আদানপ্রদানের জন্যে

টেলিফোন আপিস থেকে যে টাকার বিল আসবে তার কথা ভাবলে মাথা লাট্টুর মতে ঘুরতে থাকে।

আমেরিকায় বসবাস করলে অতি অর্ডিনারি বাঙালীও ভীষণ ইনটেলিজেন্ট হয়ে যায়। সাগর পারের সুচরিতা আমার মনের অবস্থা আন্দাজ করেই বললো, "তোমাকে সেবারে পই-পই করে বললাম, কালেক্ট কল্ করবে।"

কালেক্ট কল্ মানে, ফোনের বিল আমি দেবো না, মহাসাগরের ওপারে যে ফোন ধরবে সে বিলের বোঝা বইবে। আমাদের কম বয়সে আমরা অনেককে ডাকটিকিট না এঁটেই বেয়ারিং চিঠি পাঠিয়েছি। বেয়ারিং ট্রাঙ্ককল্ ভীষণ লজ্জাজনক, যদিও সুচরিতা বলছে, ওটা সামান্য ব্যাপার। দেশ থেকে একটা ফোন পেলেই সামান্য বিল দেওয়ার সব দুঃখ মুছে যায়।

গড়-গড় করে খবরাখবর নিয়ে যাচ্ছে সুচরিতা। আজ কলকাতায় গরম রয়েছে কি না, বৃষ্টি হচ্ছে কি না, কতক্ষণ লোডশেডিং চলেছে, চীফ মিনিস্টার অতো চমৎকার লোক হয়েও কেন লোডশেডিং বন্ধ করছেন না, মামীমা যেন খুব সাবধানে চালের কাঁকর বাছেন, এই বয়সে মামার দাঁতের বারোটা বাজলে ভাগ্নীরা খুব কষ্ট পাবে এটসেটরা, এটসেটরা।

ট্রাঙ্কলের পিছনে ট্রাঙ্কলবিল নামক একটা দৈত্য আছে তা যেন খুকু ভুলেই গিয়েছে। অসহায় আমি ধৈর্য সহকারে প্রতিটি বিষয়ের উত্তর দিয়ে যাচ্ছি। আমেরিকায় ডালে ছোলায়, গমে, চালে কেন কাঁকর থাকে না এই রহস্যটা আমার কাছে তিনবার বিদেশ গিয়েও পরিষ্কার হয়নি।

"কারণটা খুব সোজা, মামা। আমাদের এখানে কেন্দ্রে বলো, রাজ্যে বলো, কোথাও খাদ্যমন্ত্রী নেই। এতো খাদ্য মাঠ থেকে উঠছে যে চাষীদের চোখে ঘুম নেই—কী করে বাড়তি দুধ, বাড়তি চিকেন, বাড়তি গম নিয়ে বুঝে উঠতে পারছে না।"

"খুকু, তোর টেলিফোন-বিল কিন্তু বাড়ছে।" মামা হিসেবে এটা মনে করিয়ে দেওয়া কর্তব্য বলে মনে করলাম, না হলে খুকুর মা দুঃখ করবেন আমি তাঁর অনাবাসী মেয়ে-জামাইয়ের টাকা নষ্ট করিয়ে দিচ্ছি।

"মামা, তুমিও যেমন! আমি অন্য বাড়ি থেকে ফোন করছি, ওদের কাজেই আমি যতক্ষণ ইচ্ছে ফোন করতে পারি, কারণ জরুরী বিজনেস রয়েছে তোমার সঙ্গে।

বিজনেসটা এবার জানা গেল। মিস্টার জেকব মার্কাস কলকাতা আসছেন। জেকব মার্কাস ও-দেশের একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক। উনচল্লিশ বছরেই যথেষ্ট সুনাম করেছেন। ইংরিজী ছোটগল্পের পোকা হিসেবে খুকু অনেক লম্বা-লম্বা চিঠি লিখেছে মার্কাসকে—পত্রবিনিময় থেকেই আলাপ এবং পরিচিতি।

মার্কাস সম্প্রতি কিছুদিন নিউজার্সিতেই বসবাস করছেন। সেই সূত্রেই খুকুর সঙ্গে পরিচয় নিবিড়তর হয়েছে।

সেবার যখন আমেরিকায় গেলাম তখন খুকুর দয়াতেই মার্কাসের সঙ্গে কিছুক্ষণের ন্য আলাপ হয়েছিল। মার্কিন লেখকদের সময়ের মূল্য অনেক। তবু আমার সঙ্গে ছু সময় অতিবাহিত করেছিলেন জেকব মার্কাস। ভদ্রলোক তখন কোনো বিষয়ে পশাল পড়াশোনা করছেন। পশ্চিমী লেখকরা কোন বিষয়ে খোঁজখবর করছেন, কাজ করছেন, সব গোপন রাখেন। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কয়েক দিন পরেই নি নিউজার্সি থেকে অদৃশ্য হলেন।

খুকু বলেছিল, "অজানা দেশে চলে গেলেন জেকব মার্কাস। ইংরিজী গল্প-পন্যাসের বাজারে এখন প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা—সব লেখক অজানা কাহিনী, অচেনা রিবেশ এবং অচেনা দেশের পিছনে ছুটছেন। এমন কি, যাঁরা রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনী খেন তাঁরাও তাঁদের পরিচিত নায়কদের নিয়ে যাচ্ছেন বিদেশে। কোনো জটিল হস্যের উন্মোচনের জন্য নিউইয়র্কের ডিটেকটিভ হয়তো ছুটছেন গ্রীসে। এই গল্পের ট বাঁধা খুবই সহজ—কারণ যে-মানুষটি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেবার জন্য আমেরিকান টেকটিভ মহোদয় এথেন্সে তৎপর তিনি একজন আমেরিকাপ্রবাসী গ্রীক। এঁর ব্যবসা উইয়র্কে বাড়ি তৈরির। অনাবাসী গ্রীকদের ইনি নানাভাবে সাহায্য করে থাকেন এবং ম্প্রতি তাঁর আশ্রয়ে একজন গ্রীক স্বদেশ থেকে এসে পাঁচ সপ্তাহ বসবাস করেছিলেন। াকটি যেদিন গ্রীসে ফিরে গেল সেদিন সকালেই নিউইয়র্কের রহস্যময় হত্যাকাণ্ডটি ংঘটিত হয়েছে বলে গোয়েন্দার সন্দেহ।

জেকব মার্কাস সেবারে চুপি-চুপি কোথায় গিয়েছিলেন তা জানা গেল এক বছর া যখন নাইজিরিয়ার পটভূমিকায় ওঁর উপন্যাসটি প্রকাশিত হলো। নাইজিরিয়া াটি সম্পর্কে চমৎকার ধারণা পাওয়া গেল। সেই সঙ্গে মিষ্টি একটা গল্প রিপাওনা।

মার্কাসের বইতে কত নতুন জনপদের নাম জানা গেল—আপকালিকী, আদোওদো, দেসাদু, ইবেতো, পামবেগুয়া, কুকাওয়া। সেই সঙ্গে একটি নদীর নাম গলা—অনেকটা আমাদের গঙ্গার মতন। একটি পর্বতমালার চমৎকার বর্ণনা রছেন জেকব মার্কাস যার নাম মন্দারা।

খুকু স্বভাবতই টেলিফোনে খুবই উৎসাহ বোধ করছে। 'ইজন্ট ইট গ্রেট মামা ং জেকব মার্কাস কলকাতায় যাচ্ছেন কলকাতার তিনশো বছর উপলক্ষে। যাগটার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে।"

সব ব্যাপারেই আমার ভাগ্নীর প্রচণ্ড আগ্রহ। ওর মায়ের অভিযোগ আমি াজীবনই ওর তালে তাল দিয়ে এসেছি।

জেকব মার্কাসের ব্যাপারেও আমি আগ্রহ দেখালাম। তবে বললাম, "এক জার্মানি খক ইদানীং আমাদের খুব দাগা দিয়ে গিয়েছেন, খুকু। কলকাতার কোথায় কোন য়েদের বাথরুমে স্যানিটারি ন্যাপকিন পড়ে আছে সে-নিয়ে এক কাহন লিখে

ফেলেছেন। মস্ত বড় লেখক। কিছু বলবার নেই। আগের যুগে মিস মেয়ো যখ
ভারতবর্ষের খারাপ দিক নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিল তখন বলা হতো, স্যানিটারি
ইন্সপেক্টার্স রিপোর্ট। এখন জার্মান সায়েবকে স্যানিটারি ন্যাপকিনস ইন্সপেক্টর এ
সম্মানে ভূষিত করতে হবে।"

সুচরিতা বললো, "মামা, সঙ্গদোষে মানুষ খারাপ হয়। কী দেখানো হয়ে
ভদ্রলোককে তা তুমিও জানো না, আমিও জানি না। সুতরাং মিস্টার মার্কাসের জন
তোমাকে একজন খুব ভাল গাইড ঠিক করতে হবে। মনে রেখো, জেকব মার্কা
তিন দিন মাত্র কলকাতায় থাকবেন।"

"তিন দিনে তিনশো বছরের কলকাতাকে বোঝবার দুঃসাহস একমাত্র আমেরিকা
সাহেবদেরই হতে পারে, খুকু।"

"ওসব কথা ছাড়ো, মামু। সায়েবকে পাঠাচ্ছে এখানকার এক ম্যাগাজিন। সুতরা
খরচাপাতি নিয়ে ওঁর চিন্তা নেই। তুমি একটা বিচক্ষণ লোকের ব্যবস্থা করে দিও
যিনি শহরটা জানেন। সারাক্ষণের গাড়ি ভাড়া করা থাকবে। যা পয়সা লাগে মিস্টা
মার্কাস দেবেন। যদি পারো তুমিও একটু খোঁজখবর রেখো, আর একদিন মামী
রান্না খাইয়ে দিও। ফর ইওর ইনফরমেশন, সায়েব ভীষণ ঝাল খান। মাইল্ড, স্ট্র
হট বললেও ওঁর মন ভরে না! উনি যে-ঝাল পছন্দ করেন, এখানকার রেস্তোরাঁ
তার নাম 'সুইসাইড'।"

খুকু তো সমস্ত বিবরণ দিয়ে দিলো। জেকব মার্কাস শেষ পর্যায়ে ফোন ধরে নিজে
বললেন, "হাই শংকর! ফর দ্য গ্রেট সিটি অফ ক্যালকাটা আই নিড্ এ 'পন্ডা'!
শেষ শব্দটা বুঝতে পারছিলাম না। খুকু প্যারালাল লাইন থেকে ব্যাখ্যা করলে
"বুঝতে পারছো না কেন? সায়েবের কাছে কলকাতা হলো মন্দিরের মতন উনি
তাই খুঁজছেন 'পান্ডা', যেমন আমরা পুরীতে খুঁজি।"

আজকালকার চালু সায়েবদের নিয়ে এই হচ্ছে মুশকিল। 'ব্রাহ্মণ', 'আত্মা', 'সঙ্গম
'গোলমাল', 'চোলছে চোলবে' ইত্যাদি বাঘা বাঘা দিশী শব্দগুলো টপাটপ নিজেদে
স্টকে তুলে নিচ্ছেন। এখন 'পান্ডা' কথাটাও আমাদের হাতছাড়া হলো।

"দরকার হলে কালেক্ট কল্ কোরো, একটুও লজ্জা কোরো না," এই বলে খু
ফোন নামিয়ে দিলো। আর আমি পড়লাম অথৈ জলে। মার্কাস সাহেবকে নিয়ে কী
করবো তা এই মুহূর্তে পঞ্চান্ন বছরের পাকা মাথাতেও ঢুকছে না।

নিজের বাড়িতে এনে জেকব মার্কাসকে একদিন ডিনারে আপ্যায়ন করবো? সঙ্গে
হলে, বিখ্যাত ইংরিজী কাগজের এক-আধজন সহকারী সম্পাদককে খবর দিতে হবে
সায়েব লেখকদের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান করতে এবং এঁদের সম্বন্ধে ফলাও ক
লিখতে এঁদের বিপুল আগ্রহ। হাতের গোড়ায় সাদা চামড়ার ইংরেজী লেখকদের পে
এঁদের মাত্রাজ্ঞান থাকে না। জেকব মার্কাস অবশ্যই এঁদের সঙ্গে পরিচিত হবেন

কিন্তু আমি নিজে কোনোক্রমেই মার্কাসের সামনে মুখ খুলছি না। একরকম কথা শুনে নোটবইতে আরেকরকম টুকতে সাহেব লেখকরা আজকাল তুলনাহীন। কোথায় কী নোংরা পড়ে রয়েছে, কোথায় একবার টানলে বাথরুমের ফ্লাশ কাজ করে না, এসব নজর করতে এঁরা সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকবেন। খ্যাতনামাদের সঙ্গেও মার্কাসের পরিচয় করিয়ে দেবার ব্যাপারে আমি বিশেষ উদ্যোগী হবো না। কারণ বিখ্যাত ওই জার্মান সাহিত্যিকের সঙ্গে সরল মনে কথা বলে কলকাতায় অনেকেই ইদানীং বিপদে পড়েছেন। সোজা কথার বাঁকা অর্থ করে দুনিয়ার হাটে ভারতবর্ষকে ছোট করতে সাম্প্রতিক সায়েব-লেখকেরা তুলনাহীন। আপনি যদি ভেবে থাকেন জার্মান ভাষায় যা-খুশি লিখুক আমাদের কী এসে যায়? কে এখানে জার্মান পড়ছে? তা হলে খুব ভুল করছেন। ইংরিজী দৈনিক কাগজের সহকারী সম্পাদকরা উঁচিয়ে আছেন স্যানিটারি ন্যাপকিন থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত সকল জনের সম্পর্কে সায়েবের প্রতিটি তির্যক মন্তব্যের ইংরিজী অনুবাদ বড়-বড় টাইপে রঙীন ছবিসহ ছাপবার জন্যে। সুতরাং জেকব মার্কাস কলকাতায় যা কিছু করবেন তা নিজের দায়িত্বে করবেন, আমি শুধু একজন নামগোত্রহীন গাইড যোগাড় করে দেবো যে এই শহরের সবকিছু জানে অথচ নিজে বিখ্যাত নয়। কলকাতা শহরে সারাক্ষণের জন্যে ভাড়া গাড়ি পাওয়া যায়। সুতরাং সায়েব যখন খুশি যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াতে পারেন। কলকাতা শহরের মহত্ত্ব—এখানে কিছুই লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয় না; ভাল মন্দ সব কিছু সকলের চোখের সামনে রয়েছে। নিজের রুচিমতন তুমি খবর তুলে নিতে পারো। পৃথিবীতে দুটো-তিনটে দেশের বাইরে এমন ঢালোয়া স্বাধীনতা পরিব্রাজকরা বোধ হয় কোথাও উপভোগ করেন না। তাছাড়া কোনোরকম কুৎসা ও নিন্দা কলকাতার গায়ে লাগে না। সায়েবদের শতরকম অত্যাচার সহ্য করবার জন্যেই তো তিনশো বছর আগে হুগলী নদীর তীরে কলকাতা শহরের পত্তন হয়েছিল। কলকাতার যত দোষই থাক, এখানকার নগরবাসীদের সহ্যশক্তি নেই একথা এখন আর বিশ্বনিন্দকও বলতে পারবে না।

কিন্তু সময় বেশী নেই। জেকব মার্কাসের দায়িত্ব কার হাতে দেওয়া যায় তা আমার মাথায় ঢুকছিল না। এমন সময় রমাপতি কর্মকারের কথা আমার মনে পড়ে গেল। এই তো গত রবিবারেই আমি যখন একটু একান্তে মা সরস্বতীর মানভঞ্জনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি, তখন গৃহিণী সংবাদ দিলেন একটা নোংরা শার্টপরা পাকানো চেহারার কালো লোক আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছে। যেহেতু ওই ঘরে তখন টি ভি চলছে সেহেতু গৃহিণী ও এই পরিবারের সকল সভ্যের আন্তরিক ইচ্ছা আমি মুহূর্তের সময় অপচয় না করে দর্শনার্থীকে আমার পাঠাগারে স্থানান্তরিত করি।

এই দেশে পাকানো চেহারার শ্যামবর্ণ মানুষের অভাব নেই এবং নোংরা শার্টের সংখ্যা পরিষ্কার শার্টের সংখ্যা থেকে সহস্রগুণ বেশী। আমার এই তির্যক মন্তব্য শুনে গৃহিণী একটু বিরক্তভাবেই সংযোজন করলেন, লোকটি লম্বাও নয় বেঁটেও নয়, চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে এবং মুখটা তেলচকচকে।

এই বাড়তি বিবরণেও আমার বিশেষ সুবিধা হলো না। এই ঘামের দেশে সব মানুষই কমবেশী তেলচকচকে। আমি এই মুহূর্তে লুঙি জড়িয়ে গেঞ্জি পরা অবস্থায় সরস্বতীর চরণচর্চায় ব্যস্ত। আমি কোনো অচেনা অজানা লোকের সঙ্গে দেখা করার জন্য বিন্দুমাত্র উৎসাহী নই।

এবার গৃহিণীর নিবেদন : আগন্তুকের পরিচয় তাঁর জানা নেই, কিন্তু লোকটি অপরিচিত নয়। কয়েকবার তাঁকে এই বাড়িতে আমার সান্নিধ্যে দেখা গিয়েছে এবং প্রতিবারেই আমি নাকি লোকটিকে পড়ার ঘরে নিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলেছি। এবার রহস্যটা কিছুটা পরিষ্কার হচ্ছে।

গৃহিণী বললেন, "ভদ্রলোক চায়ে চার চামচ চিনি খান। গতবার দিতে হয়েছিল," গৃহিণী ভোলেননি। বাড়তি চিনির ইঙ্গিতেই আমি বুঝলাম, লোকটি রমাপতি কর্মকার ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

অগত্যা গেঞ্জির ওপরে পাঞ্জাবিটা চড়িয়ে বাইরের ঘরে এসে রমাপতিকে আমার পড়ার ঘরে নিয়ে এলাম। বিনয়ে বিগলিত রমাপতির হাতে একটি জবা ফুল। সেটি আমার হাতে তুলে দিয়ে সে বললো, "ঠনঠনে কালীবাড়িতে মায়ের পায়ে ঠেকিয়ে আপনার জন্যে নিয়ে এলাম। এমন শুভদিন আপনার জীবনে।"

আজ আমার জন্মদিনও নয়, বিবাহবার্ষিকীও নয়, আমার দুই মেয়েদের কারও জন্মদিনও নয়। আমি ব্যাপারটা কী তা বুঝবার চেষ্টা করছি।

রমাপতি একগাল হেসে বললো, "আমাদের মতন পাঠকদের পক্ষে মস্ত দিন থার্টিফোর ইয়ারস্ আগে এই দিন দেশ পত্রিকায় আপনার 'কত অজানারে' বইয়ের প্রথম পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়েছিল। বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম' বেরিয়েছে তার আগে। জরাসন্ধের 'লৌহকপাট' প্রথম পর্বও তদ্দিনে দেশ পত্রিকায় বেরিয়ে গিয়েছে।"

সাহিত্যের ব্যাপারে আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি এই মানুষটার। সাহিত্য বিষয়ক সমস্ত দিনক্ষণ জিহ্বাগ্রে। রমাপতি হুড়হুড় করে লিষ্টি দেয় "বঙ্কিমের জন্ম ২৬শে জুন ১৮৩৮ আর মৃত্যু ৮ই এপ্রিল ১৮৯৪। মাইকেল মধুসূদনের জন্মদিন ২৫শে জানুয়ারি ১৮২৪। শরৎ চাটুজ্যের ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৬, আর শরদিন্দু ব্যানার্জির ৩০শে মার্চ ১৮৯৯। ওঁর মৃত্যু ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০। বিমল মিত্রের বার্থডে হলো...।"

রমাপতি তারপরেই স্মরণ করবে, "আমার বিয়েতে তিনখানা কত অজানারে এবং পাঁচখানা সাহেব-বিবি পেয়েছিলাম। একখানা করে রেখে বাকিগুলো টাইটেল পে

ছুঁড়ে অন্য লোকের বিয়েতে উপহার দিয়েছিলাম। অনেকের আবার এমন বিশ্রী অভ্যেস বইয়ের ভিতরে সই করে গ্রহীতার নাম লেখে। সেসব বই সেকেন্ড-হ্যান্ড মার্কেটে কোনো কাজে লাগে না। আমার এই কথা শুনেই তো সাহিত্যিক নগেন পাল স্টাইলফে নাম সইকরা ছেড়ে দিয়ে ভিতরের পাতায় অটোগ্রাফ করা শুরু করলেন। উপহারের শাড়িতে ওই অসুবিধে নেই; তাই লোকে শাড়ি পছন্দ করে। একখানা উপহারের শাড়ি যদি এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি, সেখান থেকে আরেক বাড়ি—এমনি করে দশ হাত ফিরি হয় তা হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যত অপছন্দের শাড়ি তত হাত ফিরি—আপনি গ্রেশহামের আইনকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে কোনো বইতে ব্যাপারটা লাগাতে পারেন। লোকে এনজয় করবে।"

রমাপতির মুখের দিকে তাকালাম। আগে যা দেখেছিলাম তার থেকে কিছুটা শুকিয়ে গিয়েছে মানুষটা। "কী ব্যাপার রমাপতি? শরীর ভাল তো?"

রমাপতি শান্তভাবে বললো, "জানেনই তো, রাত্রে আমার ঘুম আসতে চায় না। ঘুমের ওষুধগুলোর যা দাম বাড়িয়ে যাচ্ছে, সব সময় খেতেও পারি না। শুনলাম, যে-কোম্পানি ভ্যালিয়াম তৈরি করে তারা অবিশ্বাস্য মুনাফা লুটবার জন্যে গরমেন্টের হাতে ধরা পড়ে গিয়েছে। ওদের কথাই আলাদা—সায়েব কোম্পানিকে সায়েবরাই ধরিয়ে দিচ্ছে। আমাদের গরমেন্টও নাকি সুইস কোম্পানির কাছ থেকে মোটা টাকা ফেরত চাইবে—কিন্তু তাতে আমাদের আর কী লাভ হবে? যাদের ঘুম আসে না তারা কি আর নগদ টাকা হাতে ফেরত পাবে? এখানকার সরকারই সব মেরে দেবে।"

রমাপতির মুখের দিকে তাকাচ্ছি আর আমার মনে পড়ছে, রমাপতির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়েছিলেন সাহিত্যিক শিবতোষ চট্টোপাধ্যায়। শিবতোষবাবুর জীবনের তখন শেষ পর্ব। আমাকে খুব ভালবাসতেন, গল্প করতেও প্রচণ্ড উৎসাহ ছিল। সুস্থ অবস্থায় সমস্ত কলকাতা শহর চষে বেড়াতেন। শয্যাশায়ী হয়ে আমাদের দেখতে চাইতেন। শিবতোষদাকে দেখতে গিয়েই রমাপতি কর্মকারের সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছি।

শিবতোষদা বোধহয় বুঝেছিলেন তিনি আর লিখতে পারবেন না। সজল চোখে বললেন, "আমার দিন তো শেষ, শংকর। তুমি বরং রমাপতির সঙ্গে আলাপ করে রাখো। যদি পারো ওকে কাজে লাগিও। রমাপতির খুব ইচ্ছে, আমার অবর্তমানে তোমার সঙ্গে একটু কাজকর্ম করে।"

আমি ভেবেছিলাম, রমাপতি জীবনবীমার দালাল। তাই বললাম, "এই বয়সে আর নসিওর হয় না, শিবতোষদা। তাছাড়া আমারও ব্লাডপ্রেসার আছে। ঘণ্টা আষ্টেক নানা কাজ করলেই মাথা ধরে যায়।"

"ঘণ্টা আষ্টেক মন দিয়ে লিখলে বিশ্বশ্রী মনোতোষ রায়েরও মাথা দপদপ করবে!" এল মন্তব্যটি রমাপতির। মানুষটিকে স্নেহপ্রবণ মনে হচ্ছে।

শিবতোষদা বললেন, "তোমার ভয় নেই, জীবনকে নিরাপদ করে তোলার কোনো

ব্যবসাতেই রমাপতি নেই ; বরং জীবনটাকে নিরাপত্তার বাইরে রেখেই চলতে ভালবাসে আমাদের রমাপতি। "কী রমাপতি ? ঠিক বলছি তো ?" শিবতোষদা রোগশয্যা থেকেই জিজ্ঞেস করলেন।

খুব লজ্জা পেলো রমাপতি। "আমার লাইফে উল্লেখ করার মতন কোনো ব্যাপারই নেই, স্যার। আপনি বারওয়েল সায়েব, স্যাটা বোস, জীমূতবাহন সেন, নটবর মিত্তির কত বড়-বড় ক্যারেক্টার দেখেছেন। আমি একজন নগণ্য সাহিত্যসেবক।"

শিবতোষবাবু বললেন, "দুনিয়া থেকে যাবার সময় তোমাকে মিথ্যে কথা বলবো না। আমার বিখ্যাত উপন্যাস 'দিন তুমি রাত নয়' যার জন্যে আমি রবীন্দ্র পুরস্কার পেলাম তার মূল স্টোরিটা সাপ্লাই করেছিল এই রমাপতি।"

রমাপতি খুব অস্বস্তিতে পড়ে গেল। "আপনিও কম মহানুভব নন। পুরস্কারটা পেয়ে আমাকে নিজে থেকে ডেকে আড়াইশো টাকা বোনাস দিলেন। আপনার দেওয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না।"

"অত লজ্জা পাচ্ছেন কেন, রমাপতিবাবু ? বলুন, সাহিত্যিক উমাশঙ্কর হালদারের ব্যাপারটা।" শিবতোষ উসকে দিলেন রমাপতিকে।

রমাপতি কিছু তো বললোই না, বরং মাথা নিচু করে রইলো। তখন শিবতোষদা মুখ খুললেন, "আমিই বলছি ব্যাপারটা। উমাশঙ্কর হালদারের আকাদমী পাওয়া উপন্যাসটার গল্পও সাপ্লাই করেছিলেন রমাপতি। কিন্তু ভীষণ কিপ্টে ছিলেন উমাশঙ্কর হালদার—তিরিশ টাকার বেশি কখনও হাত থেকে গলতো না। তবু উমাশঙ্কর যদ্দিন বেঁচে ছিলেন তদ্দিন রমাপতিবাবু ওঁকেই গল্প সাপ্লাই করতেন। উনি দেহ রাখার পরে আমার সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ। কেন মিথ্যে কথা বলবো, আমি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি।"

হাঁ-হাঁ করে উঠলেন রমাপতি। "কাদামাটি সাপ্লাই করা আর কুমোরের ঠাকুর গড়া এক জিনিস নয়। খোদায়ের মার্বেল পাথর তো অনেকেই সাপ্লাই করতে পারে কিন্তু মাইকেল অ্যাঞ্জেলো ক'জন হয় ?"

আমি রমাপতিবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম কিছুক্ষণ। বিনয়ে বিগলিত রমাপতি বললো, "কাদার তাল আর রমেশ পালের প্রতিমা মূর্তি এক জিনিস নয় এই ধরুন, সাহেব-বিবি-গোলামের কথা। কাদার তালটা হলো : এক স্বামী-সোহাগিনী মহিলা মাতাল স্বামীকে নিজের কাছে রাখবার জন্য মদ ধরলো এবং নিজেও মাতাল হলো, তারপর পাকে-চক্রে পড়ে সে খুন হলো এবং কঙ্কালটা রয়ে গেল ভিটেবাড়ির মাটির তলায়। এই ঘটনাটা আর সাহেব-বিবি-গোলাম উপন্যাস কি এক জিনিস ? দুনিয়ার লোককে জিজ্ঞেস করুন। তবে একটা ভাগ্য বলতে পারেন, দেবতার মূর্তি গড়তে গেলেও কাদামাটির প্রয়োজন হয়। মহৎ সৃষ্টির জন্যে বড়-বড় লেখকদের একটা ঘটনা, একটা গপ্পো প্রয়োজন হয়। তবেই তাঁরা সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে নিমগ্ন হ

পারেন। এই ধরুন, জেনারেটরের কথা। আপনি ঢাললেন চটচটে ডিজেল তেল, কিন্তু তৈরি হলো দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করা আলো। কী জিনিস থেকে কী জিনিসের যে সৃষ্টি হয়!"

শিবতোষদার দেহরক্ষার পর রমাপতির সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক নিবিড় হয়েছে। আধময়লা সাদা ফুল শার্ট পরে অনেকবার সে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।

রমাপতি বলেছে, "সাহিত্যিক শিবতোষ আর উমাশঙ্করের মধ্যে অনেক পার্থক্য।"

উমাশঙ্কর চাইতেন সলিড ঘটনা, যার জন্য রমাপতিকে ঘন ঘন ফৌজদারি আদালতেও ঘোরাঘুরি করতে হতো।

"দু'চারজন চেনা মুহুরির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখলেই উমাশঙ্করবাবুর পছন্দমতন গপ্পো পাওয়া যেতো। আর সাহিত্যিক শিবতোষ চাইতেন গপ্পো প্লাস চোখা-চোখা ডায়ালগ। শিবতোষবাবুর গপ্পো আদালতে পাওয়া যেতো না। এর জন্যে আমার প্রধান ভরসা ছিল মদনবাবুর লেডিজ হোস্টেল। রাত্রে ডিনার টেবিলে ওরা যখন খেতে বসবে তখন কান থাকলে প্রত্যেক দিন একটা-না-একটা ঘটনা পেয়ে যাবেন। মদনবাবু সুরসিক, একসময় যাত্রা করতেন, আমাকে ভালওবাসতেন খুব। গপ্পোগুলো আমাকে সাপ্লাই করতেন। শিবতোষবাবু খুব খুশি হতেন, নোট করে নিতেন। শিবতোষবাবু বলতেন, দেখো রমাপতি, নাম হওয়া মানে নিজের জালে নিজেই বন্দী হওয়া। এই আমি একসময় কত হোস্টেলে, কত মেসে, কত চায়ের দোকানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটাতাম। ডুব-সাঁতার দিয়ে নিজেই তুলে আনতাম গল্পের হীরে জহরৎ। ওই যে নার্সের প্রেমের উপন্যাসটা লিখলাম এবং এতো নাম হলো, ওটা কোথায় পেলাম? স্রেফ নার্স হোস্টেলের একটি মেয়ের কাছ থেকে। এখন নাম হয়ে খুব মুশকিল হয়েছে। লোকে আর সেইভাবে সমান লেভেল থেকে মন খুলে কথা বলে না। এখন লোকে খাতির করে। মেয়ে হোস্টেলে গেলে তো হৈ-চৈ পড়ে যাবে, অটোগ্রাফের খাতা চলে আসবে। কিন্তু আমি ওই খাতির নিয়ে কী করবো? আমার চাই গল্পের যোগান। বুঝলেন স্যার, শিবতোষবাবুর যেখানে যাবার ইচ্ছে অথচ যেতে পারছেন না সেই সব জায়গায় পাঠাতেন এই অধমকে, রমাপতির সবিনয় সংযোজন।"

শিবতোষ স্মৃতি যেন শেষ হতে চায় না রমাপতির। চোখ বড়-বড় করে সে বললো, "একবার সকালে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। উনি পকেটে দশ টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন, এখনই কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসের তেতলায় চলে যান। সারাদিন ওখানে বসে থাকবেন, কফি পকৌড়া যতবার খুশি খাবেন, আর নোট করবেন ছেলেমেয়েরা নিজেদের মধ্যে কী ভাষায় কথাবার্তা বলছে। সারাদিন ওখানে কাটিয়ে সোজা

শিবতোষবাবুর বাড়িতে এসেছি। উনি দেড়ঘণ্টা ধরে অনেক ডায়লগ নোট করলেন, আমাকে আরও দশ টাকা দিলেন। আগেকার দশ টাকার পুরোটা খরচ হয়নি, আমি সাড়ে তিন টাকা ফেরত দিতে গেলাম, উনি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, নিলেন না। তারপরেই তো কফি হাউসের পটভূমিকায় ওঁর বড় গল্প 'সান্নিধ্য' পত্রিকায় বেরিয়ে বাজিমাত্ করলো। উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের কথাবার্তার স্টাইল, এমনকি ভাষ প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পাল্টে যায়, স্যর। শিবতোষবাবু কখনও ওসব ব্যাপারে ঝুঁকি নিতেন না, তাই ওঁর গল্পগুলো অতো তাজা মনে হতো। 'সান্নিধ্য' পড়ে আমি নিজেই তাজ্জব, মনে হলো লেখক যেন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ওই কফি হাউসে কাটিয়েছেন।"

"ওই গপ্পোটা নিয়ে সমালোচনাও হয়েছিল রমাপতি। যদ্দূর মনে পড়ছে, পত্রিকায় অভিভাবকদের চিঠি বেরিয়েছিল।"

"ওঃ! আপনার স্মৃতি-শক্তি খুবই প্রখর। কোথায় কি নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে সে খবর আপনি রাখেন। শুনুন স্যর। আমি 'সান্নিধ্য'-র মেইন গপ্পোটা সাপ্লাই করিনি—ওটা শিবতোষবাবু নিয়েছিলেন মদন বসাকের কাছ থেকে। সাহিত্যিক কমলেশ গাঙ্গুলীর রগরগে গপ্পোগুলো যে সাপ্লাই করতো। শুঁড়িখানায় সারাক্ষণ পড়ে থাকতো মদন বসাক, মসলাদার গপ্পোর ওখানে ছড়াছড়ি। মদন বসাকই শিবতোষবাবুকে সেবার সাপ্লাই করলো। আর উনিও আধুনিক হবার তাগিদে লিখে ফেললেন পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ অধ্যাপক এবং একুশ বছরের ছাত্রীর রোমান্স। আমার দায়িত্ব ছিল শুধু ডায়লগ সাপ্লাই করা, ওতে একটি কাঠি কিংবা একটি কাঁকর পাবেন না, একেবারেই ঝাড়াই-বাছাই মসলা।"

রমাপতির কাছেই জানা গিয়েছিল, 'সান্নিধ্য' গল্পের কফি হাউস ডায়লগগুলো সবই সংগ্রহ করেছিল রমাপতি। "আমি তো স্যর, সাপ্লাই করেই খালাস, তারপর সোনার অলঙ্কারের ওপর ওগুলো হীরে-জহরতের মতন বসিয়েছিলেন শিবতোষ চট্টোপাধ্যায়। পাকা জহুরী, সেই সঙ্গে অদ্ভুত পালিশের কাজ। গপ্পো পড়ে কে বলবে মদন বসাক এবং রমাপতি দু'জনেরই কাঁচামাল একটা গল্পে মেশানো হয়েছে!"

রমাপতি এরপর মাঝে-মাঝে গপ্পো নিয়ে এসেছে, আমি কয়েকবার গপ্পো কিনেওছি ওর কাছ থেকে।

রমাপতি সেবারে এসে বললো, 'একটা চমৎকার গপ্পো রয়েছে, নেবেন নাকি? আপনি তো একটু আদর্শ-টাদর্শ পছন্দ করেন, আপনার হাতে খুলবে ভাল। আদর্শও বটে আবার অদ্ভুত প্রতিশোধের গপ্পোও বটে। এক ভদ্রলোক পুরনো জমিদারবাড়ির ছেলে, এই কলকাতা শহরেই থাকেন। একজন উঠতি বড়লোক ওঁর বন্ধুত্বের মাধ্যমে বাড়িতে আসা-যাওয়া করতো, সেই সুযোগে একদিন ওঁর কমবয়সী ভাইঝিকে কোলে

ছুতোয় বাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়ে ফুসলোবার চেষ্টা করেছে। সে খবর তো শান্তশীলবাবুর কানে পৌঁছেছে। তারপর একদিন উনি আট-দশজন বন্ধু এবং ওই উঠতি রঞ্জিত মজুমদারকেও বাড়িতে খেতে ডেকেছেন। বলেছেন, খাবার পরে কিছু স্পেশাল শো হবে। প্রচুর খাওয়া-দাওয়া হলো, তারপর রঞ্জিত মজুমদার উঠতে গেলেন, তখন শান্তশীল রায় বললেন, যাবেন কোথায় ? বসুন, এখনই স্পেশাল শো হবে। সবাই বসার ঘরে জমা হয়েছে, তখন কোমরের বেল্ট খুলে পেটাতে লাগলেন ওই উঠতি বড়লোক রঞ্জিত মজুমদারকে। শান্তশীল বলতে লাগলেন, 'শুনুন, এই শুয়োর-কা-বাচ্চার কথা ! বাড়িতে বউ আছে, ছেলে আছে, বয়স হয়েছে, অথচ ছুঁক-ছুঁক ভাব যায়নি। বিশ্বাস করে আমার বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছিলাম, তার যোগ্য প্রতিদান দিয়েছে।' তারপর সে যে কী মার, আপনাকে কী বলবো ! অথচ পনরো মিনিট আগে খাওয়ার সময় রঞ্জিত মজুমদারকে কী আদর-আপ্যায়ন ! একেবারে কনট্রাডিকশন। ঠিকমতন খেলালে, আপনার হাতে গপ্পোটা যা খুলবে স্যর।"

এই গল্পের জন্য চল্লিশ টাকা পেয়ে রমাপতি বলেছিল, "অন্য কেউ হলে কুড়ি টাকার বেশি পেতাম না : আমিও নিতাম না। কিন্তু চল্লিশ টাকার কমে একটা চটি হবে না। চটিটা খুব দরকার। চটির দোষ নেই, সমস্ত শহর চষে বেড়াই, একটু বেশি ধকল পড়ে।"

এই গপ্পোটা লিখে খুব সুনাম হয়েছিল আমার। তখনকার পুলিসের আই-জি ফোন করে জানতে চেয়েছিলেন, আইডিয়াটা কী করে মাথায় এলো ? আমি বলেছিলাম, "সাপ্লায়াররা দিয়েছে।" উনি হাসতে লাগলেন। ভাবলেন আমি রসিকতা করছি।

অল্প ব্যবধানে দুটো তিনটে ভাল ভাল প্লট সাপ্লাই করেছে রমাপতি। আমি যতটা পারি পুষিয়ে দিয়েছি ওকে। রমাপতি টাকা নেয়, কিন্তু ভীষণ লজ্জা পায়। আসলে সাহিত্য সম্বন্ধে ওর নিবিড় ভালবাসা। নিজের শোনা অথবা সংগ্রহ করা প্লটটা লেখকদের হাতে কেমন বিকশিত হয়ে ওঠে তা দেখতে সে খুব ভালবাসে। সম্ভব হলে রমাপতি হয়তো টাকা নিতো না। কিন্তু চাকরির রোজগার সীমিত। কোন এক হিন্দী বিত্ত সমাচার পত্রিকায় কাজ করে। এই কাগজে শেয়ারবাজারের ওঠা-নামার খবরাখবর থাকে। অতি সামান্য কিছু গ্রাহক—সাধারণ লোক এ-কাগজ চোখেও দেখেনি, নামও জানে না।

রমাপতি বলেছে, "আপনি বাইরে এতো শান্ত লোক, কিন্তু প্রতিহিংসার দৃশ্যটা লেখায় আপনি যা চমৎকার ফুটিয়েছিলেন। আপনি আরও প্রতিশোধের গপ্পো লিখবেন, স্যর ?"

"মারধোর আমি ঠিক ম্যানেজ করতে পারি না, রমাপতি। ওসব পড়ে মানুষের কী মঙ্গল হবে ?"

হেসেছে রমাপতি। "ওই বারওয়েল সায়েব এবং বিবেকানন্দ আপনার খুব ক্ষতি

করেছে। আপনার স্বপ্ন, প্রত্যেকের বুকের মধ্যে যে প্রদীপটা রয়েছে সেটা জ্বালিয়ে মানুষের ভিতরের অন্ধকার দূর করা। এ-যুগের গপ্পো উপন্যাসে এটা প্রায় অসম্ভব, ও-কাজটা এখন কেবল গানের মধ্যে হতে পারে। শিবতোষবাবু তো বলতেন, মানুষ যতই সাধু সাজুক সে যে আসলে একটি হাড়-হারামজাদা এইটাই আমি বার বার দেখাতে চাই। তুমি ওইরকম গপ্পো আমাকে সাপ্লাই করে যাও।"

আমি রমাপতির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। "সবাই সব জিনিস পারে না এ-পৃথিবীতে, রমাপতি।"

রমাপতি জানালো, "আমি একবার একজন ভাল লোকের গপ্পো বললাম। শিবতোষবাবু কিন্তু লাস্ট প্যারাগ্রাফে পাল্টে ওই ভাল মানুষটাকেই হাড়-হারামজাদা করে দিলেন। পৃথিবীতে ভাল মানুষ আর জন্মাতে পারে না, এইটাই ওঁর শেষ জীবনের বক্তব্য।"

রমাপতির ইচ্ছা, ওই সমস্ত গল্পই আমি নিই। আমি রাজি হইনি।

চায়ের দোকানে বসে, রাস্তায় ঘুরে অচেনা-অজানা মানুষের সঙ্গে কথা বলে রমাপতি কত রকমের প্লট সংগ্রহ করে, সব আমার চিন্তার সঙ্গে মেলে না। আরও দু-একজন লেখকের সঙ্গে ওর যোগাযোগ থাকা উচিত। তা হলে রমাপতির কিছু রোজগার হবে।

অভাবের মাথায় রমাপতি দু'একবার সমস্যারও সৃষ্টি করেছে। একই ঘটনা দু'জন লেখকের কাছে বর্ণনা করেছে, এবং পূজো সংখ্যায় দু'জন লেখকই ওই প্লটের ওপর নির্ভর করেছেন।

সে এক গুরুতর পরিস্থিতি! রমাপতি কিন্তু মিথ্যাবাদী নয়। ব্যাপারটা সে স্বীকার করেছে। বলেছে, দোষটা পুরোপুরি তার নয়। তখন খুব আর্থিক টানাটানি চলছে। সাহিত্যিক প্রতুল গাঙ্গুলীর কাছে রমাপতি গপ্পোটা বলেছে। নেশার ঘোরে ছিলেন প্রতুল। ব্যাপারটা শুনছেন কিন্তু হ্যাঁ-না কিছুই বলেননি। পরের দিন রমাপতি বাধ্য হয়ে সুধাপদ মুখার্জির কাছে গিয়ে একই গপ্পো বলেছে। সুধাপদ গপ্পোটা সম্বন্ধে উৎসাহ না দেখালেও রমাপতিকে কিছু টাকা দিয়েছেন। তারপর প্রতুল গাঙ্গুলীর সঙ্গে যখন কয়েক সপ্তাহ পরে দেখা তখন তিনি রমাপতিকে খবর দিয়েছেন গপ্পোটা তিনি ব্যবহার করেছেন।

সে ভীষণ এক সমস্যা—রমাপতি দু'রাত ঘুমোতে পারেনি। আমার কাছে ছুটে এসেছে। আমি খুব বকুনি দিয়েছি। বলেছি, "লেখকদের এইভাবে বিপদে ফেলবার কোনো মানে হয় না।"

রমাপতি একবার ভেবেছে, দু'জনের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা বলবে, ক্ষমা চাইবে। কিন্তু সাহস পায়নি। পূজোর সময় কী কাণ্ড হবে ভেবে বেচারা পাগলের মতন হয়ে

উঠেছিল। বলেছিল, জীবনে এমন কাজ আর কখনো করবে না।

সেবার মহালয়ার দিনে রমাপতি আবার এসেছিল। বললো, "আমার সাধ্যে কুলোয় না তবু টাকা ধার করে বাহাত্তর টাকায় দু'খানা পূজো সংখ্যা কিনেছি। আমার অশেষ ভাগ্য—প্রতুল গাঙ্গুলী গপ্পোটা বম্বের পটভূমিকায় নিয়ে গিয়েছেন, আর সুধাপদবাবু চলে গিয়েছেন মালদহের পটভূমিকায়। সুধাপদবাবু মেয়েটাকে করেছেন হাফ গেরস্ত, আর প্রতুলবাবু করেছেন বম্বে ফিল্মের একস্ট্রা। সুধাপদবাবুর নায়িকা শেষ পর্যন্ত সুইসাইড করেছে, আর প্রতুলবাবু দেখিয়েছেন মিলন। কারণ চিত্রতারকা মিসেস সেন ওই গপ্পোটাকে সিনেমায় কিনে নিতে পারেন। উনি আবার সুইসাইড পছন্দ করেন না। যাই হোক, আমি কোনোক্রমে বেঁচে গিয়েছি। ডুবতে-ডুবতে পায়ের তলায় মাটি পাওয়া, ভগবানের অশেষ করুণা।"

এরপরেও রমাপতি এসেছিল। ভীষণ টাকার দরকার। ওর কাছে নাকি একটা ভাল গপ্পো আছে।

"দুর্দান্ত গপ্পো স্যর। মুচিপাড়া থানার এক দারোগার মুখ থেকে গরম গরম শোনা। নাম দিতে পারেন ক্রোড়পতি ও পতিতা। ক্রোড়পতি এক পরিচিতা পতিতাকে অবহেলা ও অপমান করেছে। প্রতিশোধ নেবার জন্যে সে যা করলো আপনি ভাবতে পারবেন না। অর্ডিনারি লোকে ভাববে, ক্রোড়পতির বউকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিল। তা নয় কিন্তু। নেভার। আগে প্রদীপ যেমন দপ করে জ্বলে ওঠে সেইভাবে অনেক মায়াজাল বিস্তার করে ক্রোড়পতির বাইশ বছরের ছেলেকে ওই পতিতা নিজের অতিথি করলো। ভাবতে পারবেন না স্যর। আমি নিজেও বিশ্বাস করতাম না। যদি না মুচিপাড়া থানার দারোগা আমাকে সমস্ত ব্যাপারটা বলতো।"

রমাপতি বলেছে, "আপনি গপ্পোটা রাখুন স্যর। পরে আরও অনেক ডিটেল এনে দেবো। আমি বুঝছি, ওই নষ্ট মেয়েটা কীভাবে ক্রোড়পতির পুত্রকে ধীরে-ধীরে আকর্ষণ করলো তা মাথা খাটিয়ে বার করা যায় না, আসল ব্যাপারটাই আপনাকে জানতে হবে।"

রমাপতির অবস্থা বুঝে বাধ্য হয়েই আমাকে কিছু টাকা দিতে হয়েছে। তারপর অনেকদিন ওর খবরাখবর নেই।

শেষে গত রবিবারে যখন কাজ করছি সেই সময় ময়লা শার্ট এবং নীল রঙের টেরিলিন প্যান্ট পরে রমাপতি হাজির।

রমাপতি বললো, "অনেক দিন আসতে পারিনি স্যর।"

আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমার বিরক্তি প্রকাশিত হলো। "ওই যে মুচিপাড়া থানার ঘটনাটা হাফ কামানো অবস্থায় রেখে তুমি চলে গেলে। পূজোর সময় মাসিক 'বিষাদ' পত্রিকায় ওটা লিখবো ঠিক করেছিলাম। কিন্তু হলো না। সম্পাদকের কাছে ছোট হতে হলো।"

খুব লজ্জা পেলো রমাপতি। "আমার দোষে আপনি শুধু-শুধু অসুবিধেয় পড়লেন। আসলে মুচিপাড়া থানার ওই মেয়েটা বিপদে ফেলে দিলো, স্যর, আমার জানাশোনা দারোগা যেমনি থানা থেকে বদলি হয়ে গেল অমনি ওই বেশ্যা অন্য মূর্তি ধারণ করলো। কী করে ওই কোটিপতির ছেলেকে নিজের ঘরে টেনে এনেছিল তা কিছুতেই ফাঁস করলো না। বোধহয় কিছু তুকতাক আছে ওদের, কিন্তু কিছুতেই তা স্বীকার করবে না।"

রমাপতি জানালো, "তাছাড়া আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, স্যর। দু'দিনের বেশী ওই বেশ্যার পিছনে ছুটতে পারিনি।" রমাপতি এবার আমাকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা চালালো। "আরও অনেক প্রতিশোধের গপ্পো হাতের গোড়ায় আসছে। আমি একের পর এক আপনাকে সাপ্লাই করে যাবো। আপনার একটা বড় বই হয়ে যাবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো, এই বই থেকে আপনার নাম-যশ উমাশঙ্কর হালদারকেও ছাড়িয়ে যাবে।"

"আমি কাউকে ছাড়িয়ে যেতে চাই না, রমাপতি। আমি কেবল নিজের মতন থাকতে চাই।"

"এটা আপনার বিনয়। ভগবান আপনাকে চিরকাল বিনয়ী রাখুন, কিন্তু আমার প্লটগুলো আপনার দক্ষ হাতে পড়লে আপনি অনেককে ছাড়িয়ে যাবেন এ-কথা শিবতোষবাবু পর্যন্ত বলে গিয়েছেন।"

আমি ওসব কথায় কান দিতে এই মুহূর্তে আগ্রহী নই। রমাপতি বললো, "আমার চেনাশোনা দারোগা হেড আপিসে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আগামী সপ্তাহে মুচিপাড়া থানায় ফিরে আসছে। তখন ওই বেশ্যা আমাকে আর অবহেলা করবে না, সুড়সুড় করে সব বলে দেবে। আপনি দুটো সপ্তাহ সময় দিন আমাকে।"

আমি কোনো মন্তব্য করছি না। রমাপতি জানালো, "প্রতিশোধ নিতে গেলে সবসময় ভাল হয় না, স্যর। আঘাত দিতে গেলেই আঘাত পেতে হয়। আপনাকে ভীষণ ভাল গপ্পো দিতে পারি। এটা আপনার উপন্যাস হয়ে যাবে। ঘটনাটা আমি রেখে দিয়েছিলাম। বেচবার কোনো ইচ্ছে ছিল না।"

আমি একটু গম্ভীর হয়ে বললাম, "রমাপতি, তুমি তো জানো, সবে পূজো শেষ হয়েছে। এখনই লেখার তেমন চাপ নেই। তাছাড়া আমি এখন খবরের কাগজে বিদেশভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখছি।"

"ভ্রমণকাহিনীতে আপনাদের অনেক সুবিধে, বুঝতে পারি। ট্রাভেল স্টোরিতে মেয়েমানুষের চরিত্র থাকলেও-বা কি না-থাকলেও বা কি! পরিণতিতে মিলন অথবা বিচ্ছেদের, জয় অথবা পরাজয়ের বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই—লোকে ধরেই নিয়েছে মানুষটা যখন একটা অজানা দেশে ঢুকছে তখন একদিন তার ভ্রমণ শেষ হবেই, সে আবার নিজের দেশে ফিরে আসবে।"

"ভ্রমণকাহিনী আজকাল বহুলোক খুব মন দিয়ে পড়ে, রমাপতি।"

"পড়বেই তো স্যর—দেড় টাকা খরচ করে প্রতি রবিবার আমেরিকা ঘুরে আসতে পারলে মানুষ কেন নিজেকে বঞ্চিত করবে ? তবে কি জানেন স্যর, উপন্যাস ইজ উপন্যাস। বাঙালীর রক্তের মধ্যে ওই নেশাটা ঢুকে গিয়েছে। নিজের ঘরসংসারে যাই ঘটুক, নায়ক এবং নায়িকার কী পরিণতি হবে তা জানবার জন্যে বাঙালীরা ব্যাকুল হয়ে উঠবে। বিশেষ করে জীবন থেকে আহরণ করে আনা ঘটনা। এই যে আপনি বানিয়ে-বানিয়ে চরিত্র আঁকেন না, এতে আপনার পয়সা খরচ হয়, সময় খরচ হয়, খোঁজখবর করতে হয়, লেখার পরিমাণ কমে যায়—তবু আপনার লাভ শেষ পর্যন্ত। লোকে জেনে গিয়েছে, আপনার গল্পগুলো গপ্পো নয়, নিশ্চয় কোথাও কোনোদিন ওইরকম ঘটেছিল। যা ঘটেছে অথচ কেউ চাপা দিয়ে রেখেছে, তা জানবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠছে।"

আমি বুঝতে পারছি রমাপতি আজ আমাকে ছাড়বে না। স্পেশাল কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আমাকে একটা গপ্পো শোনাবেই। এখন লগনসার বাজার নয়, নগদ দাম দিয়ে গপ্পো তুলে নেবার লেখক কম।

রমাপতি বললো, "সামনেই তো বুক ফেয়ার রয়েছে। লিখুন না একটা উপন্যাস, যা কোনো পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত না-হয়েই গ্রন্থাগারে বইমেলা উপলক্ষে গরম-গরম প্রকাশিত হবে।"

গল্পের অনেকটা শুনতে হলো আমাকে। শেষে বললাম, "আমার ভ্রমণকাহিনীর কিস্তি আজ দিতেই হবে। আর গপ্পো শোনা ঠিক হবে না। নতুন কিছু মাথায় ঢুকলেই আমার পুরনো ভাবনাচিন্তাগুলো অনেক সময় তালগোল পাকিয়ে যায়।"

কিছু টাকার যে প্রয়োজন রমাপতির তা বুঝতে পারছি। চাহিদা পূরণ করে তখনকার মতন বিদায় দিলাম রমাপতিকে।

রমাপতি নিজের দারিদ্র্য সম্পর্কে কিছুই বলে না। কিন্তু আজকাল সাধারণ মানুষের যে কী অবস্থা তা বুঝতে পারি। খরচ আর কত কমানো যাবে ? সুতরাং নানাভাবে রোজগার বাড়ানোটাই একমাত্র পথ। রমাপতি সৎপথে খেটেখুটে রোজগার করে। আমি এক-একবার বলেছি, "এইভাবে গপ্পোগুলো অপরের হাতে তুলে না দিয়ে নিজে লেখো না কেন ?"

হা-হা করে হেসেছে রমাপতি। "ভাগ্যচক্রে মানুষ কত প্রিয় জিনিস অপরের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়। সে তুলনায় এসব গপ্পো কী আর জিনিস ! তাছাড়া সাহিত্য সৃষ্টি করা অতো সহজ জিনিস নয়, স্যর। আমার যোগাড় করা ঘটনাগুলো আপনাদের কলমের মাধ্যমে চিরকাল বেঁচে থাকবে ভাবতে খুব ভাল লাগে। এই সিনেমাওয়ালাদের বা টিভিওয়ালাদের কথা ধরুন—ওদের কাছে গেলে পয়সা দুটো বেশী পাবো হয়তো, কিন্তু গপ্পের মাথামুণ্ডু থাকবে না। ঘটনার পরিণতি ওরা যে কী করে দেবে তার ঠিক

নেই। গল্পের শেষটা আমি যেরকম যোগাড় করে এনেছি সেরকম না থাকলে আমার মনটা খারাপ হয়ে যাবে। ভগবানের চেয়ে বড় গল্পকার তো আর কেউ হতে পারে না!"

সেদিন রমাপতি চলে যাবার পরে আশ্চর্য মানুষটার কথা অনেকক্ষণ ভেবেছি। রমাপতি যে-গল্পটা মুখে মুখে শোনাতে শুরু করেছিল তাও মাথার মধ্যে ঘুরছে।

রমাপতি যখন গপ্পোগুলো বলে তখন আমি মাথা নিচু করে লিখে যাই না; আমি ওর মুখের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করি। লোকটার মুখের মধ্যে একটা হারিয়ে যাওয়া যুগের ছায়া আছে। এ-ধরনের মানুষ যে পৃথিবীতে বেশীদিন থাকবে না তা আন্দাজ করতে পারি। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হলেই অসংখ্য বিচিত্র চরিত্র লোপ পাবে—নতুন যুগের সাহিত্যিকরা তাদের কোনো সন্ধান পাবে না।

এইসব চিন্তার মধ্যেই নিউজার্সি থেকে ফোন এলো জেকব মার্কাস সম্পর্কে একজন বিশ্বস্ত লোককে সঙ্গী হিসেবে দিতেই হবে।

একটু চিন্তার পরেই চট করে আমার রমাপতির কথা মনে পড়ে গেল। রমাপতির অর্থের প্রয়োজন। কয়েকদিন যদি সাহেবের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় মন্দ কী? আর জেকব মার্কাস যদি নাক উঁচু সাহেব-লেখকদের মতন বারংবার রমাপতির বক্তব্য উদ্ধৃত করে কলকাতা শহরের মানুষদের অপদস্থ করেন তা হলেও কিছু এসে যায় না। রমাপতি যখন বিখ্যাত মানুষ নয় তখন তার বক্তব্য নিয়ে সায়েবী কাগজের সহকারী সম্পাদকরাও অতিমাত্রায় উৎসাহী হয়ে উঠবেন না।

তাছাড়া এ-ব্যাপারে রমাপতির থেকে যোগ্য মানুষ আমি কোথায় পাবো? রাধারমণ মিত্তিরের সঙ্গে অনেক আড্ডা দিয়েছে রমাপতি। 'কলিকাতা দর্পণ' থেকে অসংখ্য উদ্ধৃতি দিয়েছে সে। শিল্পী রথীন মিত্রর সঙ্গে কাজে-অকাজে ঘুরে বেড়িয়েছে রমাপতি। এই আশ্চর্য ভদ্রলোক বেশ কয়েক বছর ধরে কলকাতার যেসব ছবি এঁকেছেন সায়েব হলে 'স্যর' হয়ে যেতেন। রমাপতির কাছেও কলকাতা শহরের কোনো কিছুই অজানা নয়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো রমাপতির সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় কী করে? কোথাকার কোন যদুবাবুর মেসে থাকে রমাপতি। ঠিকানাটা একবার যেন দিয়েছিল, কিন্তু সেই কাগজ কোথায় যে রেখেছি এখুনি মনে করতে পারছি না।

আমার হঠাৎ খেয়াল হলো রমাপতি আমাকে এতো খবরাখবর দেয়, কিন্তু আমি রমাপতি সম্বন্ধে খুবই কম জানি। লোকটার যে ঘরসংসার নেই সেটা আমি আন্দাজ করে নিয়েছি। কারণ ঘরসংসার থাকলে লোকে যদুবাবুর মেসে থাকবে কেন? আর থাকলেও মাসে একবার অন্তত দেশে যাবে।

রমাপতি কখনও কলকাতা ছেড়ে কোথাও গিয়েছে বলে শুনিনি। তার সমস্ত গল্পের পটভূমিকা কলকাতা। রমাপতির কাছে এই প্রসঙ্গ তুলেছিলাম। রমাপতি

বলেছিল, "অনেকদিন ধরে জানাশোনা না থাকলে কোনো জায়গা সম্বন্ধে খোঁজখবর পাওয়া যায় না, স্যর। অন্য জায়গায় গেলে আমি দিশেহারা হয়ে যাবো। লোকে ভাববে, আমি স্পাই। আমি যে স্রেফ দুটো পয়সা রোজগারের জন্যে ঘটনার পিছনে, গল্পের পিছনে ছুটি তা লোকে বিশ্বাস করবে না। আপনি তো সাহিত্যিক বরেন্দ্র মিত্রের কথা জানেন। অচেনা পরিবেশে মেয়েদের সম্বন্ধে খোঁজখবর করতে গিয়ে বেশ কয়েকবার হাঙ্গামায় পড়েছেন, লোকে ভুল বুঝেছে। ক'টা পয়সা বাঁচিয়ে ওঁর কী লাভ হয়েছে স্যর ? সহজেই কোনো গল্প-সাপ্লায়ারের কাছে যেতে পারতেন বা তাকে খোঁজ নিতে পাঠাতে পারতেন।"

রমাপতির কথা যতই ভাবছি, একটু অবাকই লাগছে। লোকটি বুদ্ধিমান, পড়াশোনা আছে। তবু কেন এইরকম পড়তি অবস্থা তা আমার খোঁজ করা উচিত ছিল। একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কতদিন ওই যদুবাবুর হোটেলে আছেন ?"

"হোটেল বলবেন না, মালিক খুব দুঃখু পায়। যদিও আসলে হোটেল, তবু মেস বলে সবাই। কবে থেকে যে আছি জিজ্ঞেস করবেন না, তারিখটা নিজেই ভুলে গিয়েছি। অনেকদিন আছি এটাই ঘটনা। যদুবাবু নতুন মেম্বারদের যে সীট রেন্ট এবং খাওয়া খরচ কত বাড়িয়ে দিয়েছেন ভাবতে পারবেন না। আমিই এখন সবচেয়ে পুরনো বোর্ডার, তাই একটু স্পেশাল খাতির আছে। তাছাড়া ওই যে উমাশঙ্কর হালদার, শিবতোষ চট্টোপাধ্যায়, আপনি নিজের হাতে সই করে গল্পের বই দেন এতে আশ্রয়স্থলে একটু স্পেশাল সম্মান হয়। মালিকও খাতির করে।"

সেদিন রমাপতি একটু অদ্ভুত আচরণ করেছিল। "আপনাকে একটা গপ্পো দেবো যার জন্যে কোনো টাকা নেবো না। অনেক পয়সা দিয়েছেন আপনি, ভগবানের দয়ায় কোনো অসুবিধে নেই আমার। একবার আপনাকে কিছু দেবো যা বিনামূল্যে দিতে পারি।"

"কী বলছো রমাপতি !"

"ঠিকই বলছি, স্যর। মরবার পর তো পয়সা আমার সঙ্গে যাবে না। কিন্তু কিছু স্মৃতি আপনাদের লেখার মাধ্যমে বেঁচে থাকবে।"

আমি বুঝতে পারছি রমাপতি কী বলতে চাইছে। রমাপতির ইচ্ছে, গল্পটা আমাকে বিনা পয়সায় সাপ্লাই করবে কিন্তু সে-বইটা যেন ওকে উৎসর্গ করি। এ আর বড় কথা কী ! সহজেই করা যায়।

"বেশ বড় কথা, স্যর।" রমাপতি উত্তর দিয়েছিল। "উমাশঙ্কর হালদার তো আমার সঙ্গে ওঁর যোগাযোগের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন রাখতেন। উনি যে বাজার থেকে গপ্পো কেনেন তা কিছুতেই প্রকাশ করতেন না, পাছে পাবলিকের কাছে তিনি ছোট হয়ে যান। সেই জন্যে কোনো বই উনি সাপ্লায়ারদের উৎসর্গ করেননি।"

"দেখো রমাপতি, আমার ওসব ভয় নেই। আমি হচ্ছি তাঁতীর মতন—আমি সুতো নিজে তৈরি করি না। হাট থেকে যখন যেমন সুতো পাই সেই অনুযায়ী কখনও গামছা কখনও শাড়ি বুনি। আমার কোনো সৃষ্টি-অভিমান নেই; আমার গল্পের ভাণ্ডার রয়েছে পৃথিবীর মানুষদের ঘরে ঘরে।"

রমাপতি চা খেতে-খেতে বললো, "একটা গপ্পো আপনাকে শুনিয়ে রাখতে চাই, স্যর। সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছি। হঠাৎ বুকে একটু চাপ অনুভব করতে লাগলাম। সেই সঙ্গে নিঃশ্বাস নেবার একটু অসুবিধে। ভয় হলো, হঠাৎ না চলে যেতে হয়। অন্ততঃ অফুরন্ত সময় আমার কাছে আর নেই, স্যর। ব্যথাটা কমে যেতেই আপনার কাছে আসবো ঠিক করলাম। একটা গপ্পো আপনাকে উপহার দিয়ে যাই। লিখবেন ভাল করে, স্যর।"

রমাপতি শুরু করলো : "মেন ক্যারেকটারটার নাম আপনি রমাপতিই রাখবেন। বরং গোড়াতেই লিখে দেবেন—এই গল্পের সব চরিত্র কাল্পনিক। কারও সঙ্গে কোনো মিল থাকলে তা নিতান্তই আকস্মিক।"

রমাপতি বলে চলেছে, "আমি ভাবছি, আপনি গল্পটা শেষ করবেন কী করে? আপনি তো আবার শেষটা না বেঁধে গপ্পো শুরু করতে চান না। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি স্যর, যখন জীবনের গপ্পো শুরু হয় তখন শেষটা কী হবে তা নায়ক-নায়িকা কারও জানা থাকে না। শেষটা জানা থাকলে অনেক গল্পের শুরুই হতো না। এই গল্পের রমাপতির কথাই ধরুন না।"

রমাপতি এবার গড়-গড় করে গল্প শুরু করলো। "আপনি অন্য এক রমাপতি কর্মকারের গল্প লিখুন। ধরে নিন, এই রমাপতি আর সেই রমাপতি এক নয়। এই রমাপতির মাথার চুল পাতলা হয়ে গিয়েছে। কপাল তেলচকচকে, জামা প্যান্ট আধময়লা, গেঞ্জি ছেঁড়া, মুখ চোয়াড়ে হয়ে গিয়েছে, মাড়ির দাঁত চারটে নেই। আর সেই রমাপতি প্রতিদিন নতুন ইস্ত্রি করা শার্ট ও প্যান্ট পরতো। মাথায় ঢেউ-খেলানো চুল ছিল, অফিস যাবার আগে পনরো মিনিট ধরে বউ সাজগোজ করিয়ে দিতো। মুখের তেলচকচকে ভাব তুলে ফেলবার জন্যে ল্যাকটো ক্যালামিন মাখতো। এই রমাপতি রান্না জানে, রুটি বেলতে পারে, নিজের জামাকাপড় কাচতে ও ইস্ত্রি করতে জানে, আর সেই রমাপতি চা করতেও জানতো না। সব দায়িত্ব ছিল রাজেশ্বরীর ওপর।"

রমাপতি এরপর অনুরোধ করলো, ছাপাখানার চাপ থাকলেও ওই নামটা আমি যেন পরিবর্তন না করি। অনেকগুলো 'শ্ব' লাগবে, অর্ডিনারি ছাপাখানা কম্পোজ করতে পারবে না।

"গরীব বাড়ির মেয়েকে ওইরকম নাম কে যে দিয়েছিল, স্যর! ওর কোষ্ঠিতে নাকি লেখা ছিল রাজেশ্বরী হবে। কিন্তু অতো সুন্দরী হয়েও রমাপতির হাতে পড়লো। হুগলী

কোন্নগর থেকে এই কলকাতায় এলো স্বামীর ঘর করতে। স্বামী তখন প্রভু বর্মণের কোম্পানিতে কেরানীর কাজ করে। অতি চমৎকার কোম্পানি। প্রভুদয়াল সত্যিই দয়ালু মানুষ—কোম্পানির সবাই ভালবাসেন, ভাল মাইনে দেন। কোম্পানিও ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে, নতুন-নতুন বিজনেস আসছে। সবাই জানে আরও কয়েক বছর গেলে বিড়লা এবং জৈনদের মতন না হলেও বর্মণের কোম্পানিও বেশ বড় হয়ে উঠবে। ছোট থেকে কোম্পানির বড় হয়ে ওঠা অনেক সুবিধে, কারণ ছোট অবস্থার লোকেরাও সেই সঙ্গে বড় হয়ে ওঠে।"

"অন্ততঃ রাজেশ্বরী ওইরকম ভাবতো, জানেন স্যর। রাজেশ্বরী সুন্দরী, বাঙালীদের তুলনায় দীর্ঘাঙ্গিনী, দুধে-আলতা রঙ। বাংলা ছাড়াও হিন্দি জানতো সুন্দর। কোন্নগরে ওদের বাড়ির পাশে হিন্দুস্থান মোটরের কারখানা, ওদের অনেক হিন্দিভাষী পরিবার ছিল। রাজেশ্বরী তার স্বামীকে বলতো, তুমি সন্ধ্যেবেলায় কস্টিং পড়ো, পরে উন্নতি করতে পারবে। অথচ এই রমাপতির মতন সেই রমাপতিও স্রেফ গল্পের বই পড়তে ভালবাসতো। অঙ্কে ভীষণ উইক ছিল সেও। অমন লোক কী করে কস্টিং অ্যাকাউনটেন্ট হবে বলুন তো?"

"রমাপতির কোম্পানিতে দু'নম্বর ছিল প্রভুদয়ালজীর ছেলে কুমারমঙ্গল বর্মণ। "হ্যাঁ স্যার, দেখতে সুপুরুষ—একেবারে রাজপুত্তুরের চেহারা বলতে যা বোঝায়। কাশ্মীরী আপেল যেন একটি। কী মিষ্টি ব্যবহার, কী সুন্দর কথাবার্তা, আপনাকে কী বলবো!"

"প্রতিদিন ওই রমাপতি বাড়িতে এসে আপিসের গপ্পো করতো। ফলে আপিসের সতীশ বেয়ারা থেকে আরম্ভ করে প্রভুদয়ালজী, কুমারমঙ্গল বর্মণ সবাই কে কী করে, কখন আপিসে আসে, কী খায়, ক'টার সময় যায়, কখন আপিস ছাড়ে, ছেলের ওপর বাপের কত টান সব জানতো রাজেশ্বরী।"

"রাজেশ্বরী নামে এবং ভাবনায় রাজেশ্বরী। যেহেতু গণকঠাকুর কোষ্ঠিতে লিখেছেন, জাতিকা একদিন ধনবতী হবে, বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে সে বসে থাকবে, সেহেতু ব্যাপারটা সে গুরুতরভাবে নিয়েছে। রাজেশ্বরী সাজগোজ করে, শাড়ি কেনে, নিজেকে সুন্দরী রাখার জন্যে যেসব প্রসাধনী প্রয়োজন তা যোগাড় করতে চায়।"

"এই এক মুশকিল। ভগবান সুন্দরীদের ভীষণ পলকা করেছেন, স্রেফ সুন্দরী থাকবার জন্যে যথেষ্ট মেহনত করতে হয়। একটু অবহেলা হলেই সৌন্দর্য উবে যায় ছিপি খোলা সেন্টের মতন।"

রমাপতির কিছু বলবার নেই। পয়সা কিছুটা আসে রাজেশ্বরীর পিত্রালয় থেকে। মেয়ে পিতৃদেবের আদরিণী। বাপের বাড়ির পয়সায় নিজের সাধ-আহ্লাদ মেটালে স্বামীর কী বলবার থাকতে পারে? রমাপতি নিজে ওসবের মধ্যে নেই—সে নির্ব্বিবাদী মানুষ, ধরে নিয়েছে সামান্য চাকরি করেই জীবন কাটাতে হবে। আপিসের বাইরে যেটুকু সময় তা কেবল বই পড়ার জন্যে। রমাপতির চাপা সাহিত্য-স্বপ্ন ছিল।

রাজেশ্বরী কিন্তু ধরে নিয়েছে তার ভাগ্য পরিবর্তিত হবে। চিরকাল সে এই অখ্যাত অঞ্চলের একটা কামরায় ভাড়াটে থাকবে না। রমাপতির ভাগ্যে যে বড়লোক হওয়া নেই তার ইঙ্গিত কোষ্ঠিতে রয়েছে। কিন্তু রাজেশ্বরী পাত্তা দিচ্ছে না ওই ইঙ্গিতকে। সে জানে, রাজেশ্বরীর ভাগ্য পরিবর্তন হওয়া মানেই রমাপতিরও ভাগ্য পরিবর্তন।

রাজেশ্বরীর পিতৃদেব মৃত্যুর আগে মেয়ের হাতে বেশ কিছু টাকা দিলেন। এই টাকা থেকে রাজেশ্বরী নিজের সাধ-আহ্লাদ মিটিয়ে নানা সম্ভার কিনলো। তারপর তার মাথায় ঢুকলো বেহালাতে সে এক ফ্ল্যাট কিনবে। ওইসব খোঁজখবর সে নিজেই যোগাড় করেছে। আপিসের লোক বলতে বাড়িতে তখন কেবল সতীশ বেয়ারাই আসতো। সতীশের বাড়ি হাওড়ার মাজুতে। বেশ গুছনো লোক। ইতিমধ্যেই দেশে নিজের একটি বাড়ি ফেঁদে বসেছে। বেয়ারার কাজ ছাড়াও সতীশ টুকটাক রোজগার করতো। তার ধারণা, স্রেফ রোজগার করবার জন্যেই পুরুষকে ভগবান এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।

সতীশ প্রথম রমাপতির বাড়িতে এসেছিল শাড়ি বেচতে। হুগলী ধনেখালি থেকে শাড়ি আনিয়ে সে বেচতো। রমাপতি তাকে বলেছিল, শাড়ি পছন্দর ব্যাপারে তার কোনো হাত নেই, এ-ব্যাপারে গৃহিণীর নিজস্ব মতামত আছে। সতীশ ছাড়নেওয়াল নয়, রমাপতির সঙ্গেই একদিন বউদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তারপর সে যেন স্বর্ণভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছিল, কখনও নগদে কখনও ধারে দামী দামী শাড়ি বেচে চলেছে সতীশ। সতীশ চালু সেলসম্যান, বলেছে, "বউদি, এই শাড়িখানা স্রেফ আপনার কথা ভেবেই তাঁতী তৈরি করেছে। আপনাকে ছাড়া আর কাউকে মানাবে না।" বউদি খুব প্লিজড হয়েছেন। এই এক মুশকিল, মেয়েরা প্রশংসা পছন্দ করে মিষ্টি কথায় তারা গলে যায়।

সতীশ এক সময় পারিবারিক পরামর্শদাতা হয়ে উঠেছে। এবং যথাসময়ে রাজেশ্বরীর সঙ্গে ওই বেহালায় বাড়ি কেনার ব্যাপারে আলোচনা করেছে। বাবার টাকায় বাড়িটা হচ্ছে না, আরও কিছু ধার প্রয়োজন। কিন্তু ধারের ব্যাপারে রমাপতির আপত্তি। রাজেশ্বরী বলেছে, "এ-ধার খারাপ নয়। আমরা তো টাকা উড়িয়ে দিচ্ছি না। সম্পত্তি কিনছি।"

রমাপতি তবু উৎসাহী নয়। আপিসে টাকা ধার চাইলেই পাওয়া যায় না। ধার মানেই সুদ—সুদের টাকা গুণতে সে মোটেই আগ্রহী নয়। টাকা শোধ হবে কী করে?

সতীশ বেয়ারা অভিজ্ঞ লোক। দেনা নাকি টুকটুক করে নিজের অজান্তেই শোধ হয়ে যায়। এই তো সতীশের মাজুর বাড়ির দেনা কমতে কমতে শেষ হতে চলেছে। রমাপতি যদি সন্ধ্যেবেলায় দুটো টিউশনি ধরে তা হলে কিস্তি এবং সুদ সম্পর্কে চিন্তা থাকবে না।

কিন্তু আপিসে টাকা ধার দেবার সিস্টেম নেই, জানিয়েছে রমাপতি। এরপর সতীশ

গোপন পরামর্শ দিয়েছে। "ছোটবাবুকে ধরতে হবে"—কুমারমঙ্গল বর্মণের রাজার মন। দেখতেও রাজার মতন। নিজের বাড়ি করার সময় এঁকেই পাকড়াও করেছিল সতীশ। তবে একা নয়, বউকেও আনিয়েছিল।

মন্ত্রের মতন কাজ হয়ে গেল। ছোট সায়েব ভাঙা বাংলায় বললেন, "মা, আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। আপনার স্বামী এতোদিন এখানে কাজ করছেন, নিশ্চয় আপনার বাড়ি হবে।"

সতীশ একেবারে অবাক। গোপনে টাকাটা পেয়েছে। আর, যা কেউ জানে না—অর্ধেক দেনা শোধ করতেই হয়নি। কুমারমঙ্গল সায়েব নিজেই বলে দিয়েছেন, সতীশ, ও টাকা তোমাকে দিতে হবে না।

এরপরেই পরিকল্পনাটা মাথায় এসেছে। অফিস কর্মীদের বার্ষিক নাট্যোৎসবের দিন রাজেশ্বরী রঙমহলে উপস্থিত থাকবে এবং কুমারমঙ্গলের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবে সতীশ। রমাপতি নিজে থিয়েটার করছে। তাছাড়া তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ভিক্ষের ঝুলি এগিয়ে দেওয়ার। যা তার পাওনা নয় তা সে কেন চাইবে? কিন্তু সতীশ ও রাজেশ্বরীর অন্য ধারণা, কষ্ট না-করলে কেষ্টকে পাওয়া যাবে কী করে?

রাজেশ্বরী প্রচণ্ড উৎসাহ দেখিয়েছে, সতীশ সেই উৎসাহে ইন্ধন যুগিয়েছে এবং রমাপতি একমত না হলেও প্রচণ্ড বাধা দেয়নি। বার্ষিক থিয়েটারের দিন স্পেশাল সাজগোজ করেছিল রাজেশ্বরী।

সতীশ দু'মিনিটের জন্যে দেখা করিয়ে দিয়েছিল কুমারমঙ্গলের সঙ্গে। সেই দিন বুদ্ধিমতীর মতন টাকার কথা তোলেনি রাজেশ্বরী, স্রেফ আর একটা সাক্ষাৎকারের সময় ঠিক করে নিয়েছিল। সেই সাক্ষাৎকারের সময় রমাপতির উপস্থিত থাকা উচিত ছিল, কিন্তু সাহসে কুলোয়নি। রমাপতির চরিত্রের এই একটা দোষ—অপ্রিয় সমস্যার মুখোমুখি হতে ইচ্ছে করে না। কুমারমঙ্গল সায়েব যদি হঠাৎ রেগে উঠে বলেন, যা তোমার নিজের বলা উচিত ছিল তার জন্যে কেন ঘরের বউকে লেলিয়ে দিয়েছ? না, ওইরকম একটা পরিস্থিতির কথা রমাপতি ভাবতে পারে না। সতীশই ভরসা দিয়েছে, "আপনার ভরসা না হলে থাকবেন না, বউদি একাই একশো।"

সেদিন দু'জনে একসঙ্গে কুমারমঙ্গলের মুখোমুখি হলে পরিস্থিতিটা হয়তো অন্যরকম হতো। একান্ত সেই সাক্ষাৎকারে কী যে হলো তা ভালভাবে জানাই হয়নি। শুধু রাজেশ্বরী বলেছিল, "এমন চমৎকার মানুষকে তোমার অতো ভয়! টাকার কোনো অসুবিধে হবে না। সুদও লাগবে না বোধহয়। দেখা যাক কী হয়। সতীশ তো বলছে, ওঁর দয়ার শরীর। ঠিকমতন ধরলে, সব টাকা ফেরতও দিতে হবে না।"

এরপর রমাপতিকে কিছুদিন বাইরে থাকতে হয়েছিল। বেনারসের কাছে বর্মণদের ছোট্ট একটা গোডাউন তৈরি হলো তার কাজকর্মের জন্য বাইরে থাকা। পনরো দিন অন্তর রমাপতি ডুন এক্সপ্রেসে কলকাতায় ফিরেছে, বউকে দেখেছে, আবার ফিরে

গেছে। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেনি। ব্যাপারটা যে অমনভাবে গড়িয়ে যাচ্ছে তা তা
স্বপ্নেরও বাইরে ছিল। বাড়তি কিছু রোজগারের লোভে রমাপতি সংসার থেকে দূ
পড়ে রয়েছে, আর মালিকের একমাত্র সন্তানের সঙ্গে কর্মচারীর স্ত্রীর অন্য অধ্যায় শ
হয়েছে। ব্যাপারটা ভাবা যায় না।

রমাপতির অজান্তে এবং তার অনুপস্থিতিতে প্রণয় পর্ব অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে
কুমারমঙ্গল জাপানী টয়োটা গাড়িতে ঘুরে বেড়ায়; বছরে কয়েকবার বিদেশে যা
অবিবাহিত। মানুষ কখন যে কে কোথায় মজে তা বলা শক্ত।

এই পর্যন্ত বলে রমাপতি হাঁপাচ্ছে। একটু দম নিয়ে সে বললো, "এখনও কিছু
বলা হয়নি, স্যর। স্রেফ এইটুকু বলা যায়, ঘর কেনার লোভ করতে গিয়ে ঘ
ছাড়ার বিপদ হাজির হয়েছে রমাপতির জীবনে। রাজেশ্বরী তখন বোধহয় হাতে চাঁ
পেয়েছে। কোষ্ঠিতে রাজরাজেশ্বরী হবার যে ইঙ্গিত ছিল তা এতোদিনে সম্ভব হ
চলেছে।"

একটু থামলো রমাপতি। তারপর দম নিয়ে বললো, "রমাপতির জীবনে যত ব
বিপদই আসুক, পাঠকের চোখে এটা এখনও সামান্য ব্যাপার। মালিকের ছেলের নজ
পড়েছে কর্মচারীর বউয়ের ওপর—নাটকে নভেলে অনেকবার এ কাণ্ড হয়ে গিয়েছে
এতে কিছু নতুনত্ব নেই—কামুক জমিদার প্রজার বউকে ধরে বাংলা গল্পে অনে
টানাটানি করেছে, চা-বাগানের সায়েবরা শ্রমিকের বউয়ের শরীরের দিকে নজর দিয়ে
অনেক নাটকে।"

রমাপতির বক্তব্য : "এখানে ব্যাপারটা একটু আলাদা। গল্পোটার এই সবে শুরু
এখনো অনেক ব্যাপার আছে—সেই সঙ্গে প্রতিশোধ। ওই যে প্রতিশোধ নামে আপন
বড় বইটা সম্পর্কে কথা হচ্ছিল।"

রমাপতি বললো, "ব্যাপারটা অতো সহজে ছেড়ে দেবার ক্যারাকটার ন
রমাপতির। এরপর রাজেশ্বরীর ক্যারাকটারটা কেমন যেন বাঁকতে আরম্ভ করেছে

রমাপতি আমাকে আরও কথা বলতে যাচ্ছিল, এই সময় আমার ঘরে আচম
ঢুকলেন এক ভদ্রলোক। গল্পটা মাঝপথে বন্ধ হলো। আমি একটা খামে কয়েক
নোট ভরে, চুপি-চুপি রমাপতির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, "বুক করা রইলো
আর একদিন বসা যাবে।"

গল্পের মাঝপথে রমাপতি বেচারাকে বিদায় নিতে হলো। তারপর আমার এ
অবস্থা—আমেরিকা থেকে ভারতীয় ভাগ্নীর যোগাযোগ। জেকব মার্কাস আসছে—রমাপতি
সঙ্গে তার যোগাযোগ প্রয়োজন।

ভাগ্যে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে রমাপতি একটা পোস্টকার্ড ছেড়েছিল। গৃহি
খুঁজে-খুঁজে সেই চিঠি বার করলেন। ওখানে রমাপতির মেসের ঠিকানা রয়েছে

এরপরের বুদ্ধিটাও গৃহিণী যোগালেন। "তুমি নিজে যখন পায়ের ব্যথা নিয়ে বেরুতে পারছো না তখন সব ব্যাপারটা জানিয়ে ওঁকে টেলিগ্রাম করে দাও।"

কলকাতার এক পাড়া থেকে আরেক পাড়ায় টেলিগ্রাম। বৈদ্যুতিক টেলিগ্রামের আবিষ্কারকের মস্তিষ্কে এই মতলব নিশ্চয় ছিল না। গৃহিণীর পরামর্শ শিরোধার্য করে দীর্ঘ একটি টেলিবার্তা আর্জেন্ট মার্কা করে রমাপতিকে পাঠানো গেল।

মধ্য কলকাতার সদর স্ট্রীটে মিসেস স্মিথের হোটেলে টেলিফোনে জেকব মার্কাসকে পাওয়া গেল। গ্র্যান্ড হোটেলে না-থেকে জেকব মার্কাস মিসেস স্মিথের হোটেলে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই ছোট্ট হোটেলে অনেক দিকপাল বসবাস করেছেন। হোটেলটির একটা বিশেষ চরিত্র আছে। পাঁচতারা হোটেল মানুষকে বড্ড দূরে সরিয়ে রাখে—লেখার কাজে সুবিধে হয় না।

জেকব মার্কাস বললেন, "হাই শংকর ! গ্রিটিংস ফ্রম এভরিবডি ইন আমেরিকা, স্পেশালি চ্যারিটা।" জেকব বললেন, "ওয়ান মিনিট।" তারপর নোট বই দেখে বললেন, "একটা বড় প্যাকেট বড়ি রেডি রেখো—চ্যারিটা আমাকে ফেরত নিয়ে যেতে বলেছে, ফর মেকিং কারি।"

তারপর জেকবের কাছে জানা গেল, রামা প্যাটির সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। "প্যাটি ইজ এ জেম অফ এ পার্সন। এইরকম লিভিং এনসাইক্লোপিডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবার জন্যে তোমাকে দশ লক্ষ ধন্যবাদ।"

চিকেন প্যাটি, ভেজিটেব্‌ল প্যাটির মতো রামা প্যাটি নয়। সায়েবকে বোঝালাম, পতি মানে স্বামী। হাজবেন্ড অফ রমা অর্থাৎ কিনা লক্ষ্মী, অর্থাৎ কিনা স্বয়ং গডেস অফ ওয়েলথের স্বামী।" খুব হাসলেন জেকব মার্কাস।

"অসংখ্য ধন্যবাদ"—কিন্তু ইতিমধ্যেই চুক্তি হয়ে গিয়েছে। মার্কাস তাঁর প্রদর্শককে প্যাটি বলেই ডাকবেন।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় রমাপতি যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো তখন তাকে চিনতেই পারি না।

নোংরা শার্টের বদলে রমাপতি ঝকঝকে টী শার্ট পরেছে। তাতে বড়-বড় করে লেখা 'আই লাভ' এবং ছোট্ট করে 'নিউ ইয়র্ক'। রমাপতি একেবারে হাল ফ্যাশনের আমেরিকান-কাট ব্যাগি প্যান্ট পরেছে। রমাপতির চোখে মূল্যবান পোলারয়েড সান-গ্লাস। রমাপতির মণিবন্ধে ফরেন ঘড়ি। কাঁধে ক্যামেরা ও টেপ রেকর্ডার। এমন রমাপতিকে দেখার স্বপ্ন আমি কোনোদিন দেখিনি।

রমাপতি বললো, "আরও আছে। স্পেশাল দাড়ি কামানোর ব্লেড। ফোম সোপ-বুরুশ লাগে না কামানোর সময়। আফটার-শেভ লোশন। কামিয়ে ফ্যাঁশ ফ্যাঁশ করে পাম্প করলে শরীর এয়ারকন্ডিশন হয়ে যায়।"

রমাপতি আমার পায়ে হাত দিলো। আমি নাকি তার ভীষণ উপকার করেছি, এমন যোগাযোগ নাকি কেউ ঘটিয়ে দেয় না। সায়েব শুধু টাকা দেননি, অবিরত নানা উপহার দিয়ে চলেছেন।

রমাপতির কাছেই জানা গেল, জেকব মার্কাস কলকাতা সম্বন্ধে বই লিখবেন কিনা ঠিক হয়নি, কিন্তু তিনশো বছরের কলকাতার ওপরে বিখ্যাত ম্যাগাজিনে সুদীর্ঘ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখবেন। বিখ্যাত কথা-সাহিত্যিকরা আজকাল পত্রপত্রিকায় বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করছেন।

রমাপতি আমার জন্যে উপহার এনেছে। চুপি-চুপি বললো, "লিখে নিন স্যর। কোনো পয়সা দিতে হবে না। এই গরীবের প্রীতি-উপহার। গোটা কয়েক ইডিশ প্রবাদ।"

প্রায় হাজার বছর ধরে এইসব প্রবাদ পূর্ব ইউরোপের ইহুদিদের মধ্যে চালু রয়েছে—প্রধানত রাশিয়া, পোলান্ড, রোমানিয়ায়। এইসব প্রবাদবাক্য বিতাড়িত ইহুদিদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত মার্কিন দেশে হাজির হয়েছে। ইহুদিদের শ্রেষ্ঠ লেখকরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন না দিয়ে বৃহৎ আমেরিকান নগরে বসে-বসে এখনও ইডিশ ভাষায় সাহিত্য রচনা করে চলেছেন। এইসব রচনা ইংরিজীতে তর্জমা হয়ে কথা-সাহিত্যে নতুন এক যুগকে ডেকে এনেছে।

রমাপতি বললো, "আমাদের মার্কাস সায়েব দ্বিতীয় প্রজন্মের আমেরিকান ইহুদি। ওঁর বাবা লিথুয়ানিয়া থেকে আমেরিকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন—বহু বছর এক মুদির দোকানে কাজ করেছিলেন। ওঁর মা এক দর্জির দোকানে সেলাইয়ের কাজ করতেন। জেকব মার্কাস কীর্তিমান হয়েছেন—ইংরিজী এবং ইডিশ দুটো ভাষার ওপরেই ওঁর দুর্দান্ত দখল। এযুগের পাঠক ওঁর রচনায় বিগত এক যুগের সন্ধান পায়, তাই তাঁর এতো কদর।"

ফিস-ফিস করে রমাপতি জানালো, "কথায়-কথায় সায়েব ইহুদি প্রবাদ কোটেশন দেয় আর আমি আপনার জন্যে মনে-মনে নোট করে নিই—আপনার কাজে লেগে যাবে কোনো একটা বইতে।"

এরপর টপাটপ বলতে লাগলো রমাপতি, আর আমি লিখে নিতে লাগলাম, 'মদের দোকান ভাল মানুষকে খারাপ করতে পারে না, যেমন সিনেগগ (ইহুদি মন্দির) খারাপ মানুষকে ভাল করতে পারে না।' 'প্রাজ্ঞ মানুষ একটা কথা শুনেই দুটো ব্যাপার বুঝতে পারেন।' 'লোকে পঙ্গুকে ভিক্ষে দেবে, কিন্তু পণ্ডিতকে কিছু দেবে না।'...'গরীব লোক যখন চিকেন খায় তখন হয় লোকটি না হয় চিকেনটি অসুস্থ।' 'ভগবান যদি পৃথিবীতে বাস করতেন তা হলে লোকে তাঁর বাড়ির জানলার সমস্ত কাঁচ ভেঙে ফেলতো। 'যদি কামড়াবার হিম্মত না থাকে তা হলে দাঁত দেখিও না।' 'ভগবান কাউকে স্টুপিড হতে বলেননি।'

"এর পরেরটা খুব মজার। লিখে নিন স্যর—ভগবান অবশ্যই গরীবদের ভালবাসেন, কিন্তু সাহায্য করেন ধনীদের। প্রার্থনা করে যদি ফল হতো তা হলে ধনীরা লোক ভাড়া করে প্রার্থনায় বসিয়ে দিতো।"

রমাপতিই খবর দিলো। "হারশেল অনট্রোপোলিয়ার বলে গোপাল ভাঁড়ের মতন একটি ইহুদি চরিত্র আছে। তার কথা শুনলে আপনি হাসতে-হাসতে অনেক চিন্তার খোরাক পেয়ে যাবেন।"

এরপর জানা গেল, জেকব মার্কাস সায়েব কলকাতা সম্বন্ধে প্রবাদ শুনতে চান। রমাপতি ওঁকে শুনিয়েছে—রেতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকাতায় আছি। সায়েব আরও জানতে চেয়েছেন। রমাপতি তখন বাধ্য হয়ে শুনিয়েছে—মাটি, মেয়ে, মিথ্যে কথা/তিন নিয়ে কলকাতা।

প্রবাদটা খুব ভাল লেগেছে সায়েবের। বার বার বাংলা ছড়া হিসেবে মুখস্থ রাখবার চেষ্টা করছেন।

"তারপর, সায়েবকে আজ কোথায় নিয়ে গেলে, রমাপতি?"

রমাপতি উত্তর দিলো, "আজব সায়েব স্যর। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, রেসের মাঠ, মনুমেন্ট দেখায় কোনো আগ্রহ নেই। পায়ে হেঁটে, শহরের অলিতে-গলিতে অনেকক্ষণ টো-টো কোম্পানি করলো। তারপর আমরা চলে গেলাম সেই উত্তরে কলকাতার মগডালে। বিশ্বাস করবেন না, সায়েব সমস্ত গঙ্গার ঘাট একের পর এক দেখলেন। ভগবানের দয়ায় ওসব ঘাট তো আমার মুখস্থ। ঘাটগুলোর এখন সত্যিই ঘাটে যাবার দশা—কেউ কোনো নজর দেয় না, সব ক'টার শ্বাস উঠেছে।"

"তুমি সব ক'টা ঘাটের খবর রাখো?"

"কী বলছেন স্যর! ওখান দিয়েই তো ওপারে যেতে হবে উইদাউট টিকিটে—ঘাটের খবর রাখবো না! কলকাতায় মাত্র পঞ্চাশটা তো ঘাট। আপনি লিস্টি মিলিয়ে নিন। একেবারে উত্তর দিক থেকে—কাশীপুর প্রামাণিক ঘাট, কাশীপুর শ্মশান ঘাট, রতনবাবুর ঘাট, রাণী দেবেন্দ্রবালা ঘাট, রুস্তমজীর ঘাট, ধনুঘাট, হরিপোদ্দারের ঘাট," হুড়মুড় করে বলে চলেছে রমাপতি। দক্ষিণ দিকে এসে রমাপতি বলে চললো, "চাঁদপাল ঘাট, বাবু ঘাট, পানিঘাট, প্রিন্সেপ ঘাট, তক্তা ঘাট, দই ঘাট, বলরাম বোসের ঘাট।"

দই ঘাটে গিয়ে সায়েব নাকি নোটিস পড়ে খুব মজা পেয়েছেন: "এতদ্বারা স্নানার্থীদের সাবধান করা যাইতেছে যে পাণ্ডাদের নিকট মূল্যবান দ্রব্যাদি রাখার বিপদ আছে। কোনো গচ্ছিত দ্রব্য হারাইলে ঘাটের দ্বারবান কিংবা পোর্ট কমিশনারগণের টোল অফিসের ইন্সপেক্টরকে তৎক্ষণাৎ জানানো দরকার।"

"সায়েব খুব মন দিয়ে পড়েছেন। আমারও স্যর, আপনার ক্যারাকটার রমাপতির কথা মনে পড়ে গেল। বউ তো কারও নিজের নয়, শ্বশুরের দেওয়া

গচ্ছিত ধন। সেই ধন যখন রমাপতির হাতছাড়া হলো তখন কোন ইন্সপেক্টরকে জানাতে হবে?"

"আমি স্যর, একটু বেশী হেসে ফেলেছিলাম। দোষটা আমার নয়। সায়েবই বীয়র খাবার সময় আমাকেও এক বোতল খাইয়েছেন। অনেকদিন ওসব খাবার অভ্যেস নেই। ঝট করে জিভটা আলগা হয়ে গিয়েছে। আমার হাসি দেখে সায়েব পাকড়াও করলেন। হোটেলে নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কেন হাসছো? আমি তখন বাধ্য হয়ে ওই রমাপতির গচ্ছিত ধন হারানোর গপ্পোটা বলে ফেললাম। মোস্ট অর্ডিনারি গপ্পো—দুনিয়ায় আকচার হচ্ছে, তবু সায়েবের আগ্রহ হলো। বললেন, পরের গচ্ছিত ধন মেরে দেওয়ার রেওয়াজ কলকাতায় পুরো তিনশো বছর ধরে চলেছে। সুতরাং ঘটনাটা নাকি 'সিমবলিক'—একটা প্রতীকের মতন।"

একটু থামলো রমাপতি। "আমি স্যর, বাঙালী লেখকদের মনোবৃত্তি জানি, কিন্তু আমি সায়েব লেখকদের মানসিকতা বুঝি না। সায়েব ও আমি দু'জনেই তখন আরও বীয়র টেনেছি। আমি বলছি, সায়েব, আমি আর মাল খাবো না। সায়েব বলছেন, কাম্ অন প্যাটি, বীয়র কিছুতেই মাল নয়। তোমার কোনো চিন্তা নেই। আমার সারাক্ষণের ভাড়া করা ডবলু-বি-ওয়াই গাড়ি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে।"

জেকব মার্কাস পান ভোজনের ব্যাপারে উৎসাহী হয়েও শরীরের ওজন আয়ত্তের মধ্যে রেখেছেন। "শরীরের ব্যাপারে সায়েবরা এখন খুব সাবধানী, স্যর। খাওয়া-দাওয়া প্রাণভরে করবে, কিন্তু সাত-সকালে ঘুম থেকে উঠে জগিং করে মাত্রাতিরিক্ত মেদ পুড়িয়ে ফেলবে। কত ক্যালরি ঢুকছে, কত পুড়ছে এবং কত তেজ শরীরে পাকাপাকি আশ্রয় নিচ্ছে তা সায়েবদের নখাগ্রে। মার্কাস সায়েব কলকাতায় এসেও গেঞ্জি ও হাফ প্যান্ট পরে জগিং করেন। এদেশের লেখকদের সঙ্গে ওদেশের লেখকদের জীবনযাত্রার একটুও মিল নেই। এদেশের লেখকরা অল্প বয়সে একটু জবু-থবু হয়ে পড়েন; চেয়ারে বসে কলম কামড়ে সময় কাটিয়ে দেন। আর মার্কাস সায়েব বীয়রের গেলাশ পাশে রেখে নিজের পার্সোনাল কমপিউটার চালিয়ে যান। একটা ছোট্ট বক্সের মধ্যে রয়েছে এই পি-সি—লেখক-জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।"

সায়েবের মাথায় ওই বাংলা ছড়াটা ঢুকে গিয়েছে। মাটি, মেয়ে এবং মিথ্যে কথার কলকাতা। তার মানে, জমির দাম এখানে সাধারণের আয়ত্তের বাইরে, মাথা গোঁজবার ঠাঁই করতে মানুষকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়—যেমন রাজেশ্বরী নিজের মাটি যোগাড় করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। মেয়েমানুষের ব্যাপারটা বুঝতে কষ্ট হয় না। মেয়েমানুষের ব্যবসা ছাড়া বড় শহর গড়ে উঠতে পারে না—কলকাতা তার থেকে আলাদা হবে কী করে? প্রভুদয়াল বর্মণের ছেলে ইচ্ছে করলেই রাজেশ্বরীর মতন মহিলাকে কিনে নিতে পারেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আর কোথাও নিয়ে গেলে মার্কাস সায়েবকে?"

রমাপতি ভেবেছিল দুনিয়ার সব শিক্ষিত লোকই রবীন্দ্রনাথের ভক্ত, এখনকার শিক্ষিত সায়েবরা যে রবীন্দ্রনাথের নামই শোনেন নি তা দেখে রমাপতি বুঝতে পারেনি।

রমাপতি বললো, "সায়েব যখন রাইটার্স বিলডিংস, জি-পি-ও, রাজভবন ইত্যাদি দেখতে চাইছেন না তখন সদর স্ট্রীটের যে-বাড়ি থেকে ভোরের সূর্যোদয় দেখে রবীন্দ্রনাথ 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতা রচনা করেছিলেন সেই বাড়িটা দেখানোর কথা ভাবলাম।"

জানাশোনা এক পুলিশের সঙ্গে ব্যবস্থা করেছিল রমাপতি। রাত-বেরাতে বিদেশী নিয়ে বেরিয়ে না হাঙ্গামায় পড়তে হয়।

রমাপতি বললো, "কী লজ্জার কথা স্যর; 'আজি এ প্রভাতে রবির কর কেমনে পশিল প্রাণের পর' যেখানে লেখা হয়েছিল সেখানে সূর্যোদয় দেখাবার জন্যে সায়েবকে নিয়ে গিয়ে দেখি দরজার সামনে বাজারের এক বেশ্যা দাঁড়িয়ে আছে খদ্দের তুলবার জন্যে। আমার পুলিশ বন্ধু লজ্জা সামলাতে গিয়ে মেয়েটাকে জোরে এক চড় মারলো। মেয়েটা কাঁদা তো দূরের কথা, খিলখিল করে হাসতে লাগলো। বললো, 'রবি ঠাকুর এখানে সূয্যি ওঠা দেখেছিল বলে আমি কি না খেয়ে মরবো! ঠাকুরকে কে বলেছিল এই খারাপ পাড়ায় আসতে?"

"কী লজ্জার কথা! রবিঠাকুর যখন ওখানে থাকতেন তখন যে পাড়াটা খারাপ হয়ে ওঠেনি এখবরটাও মেয়েটা রাখে না।"

"সায়েবটাও কীরকম স্যর! সূর্য ওঠা দেখলেন না, পাথরের ফলকটা পড়ে নিয়ে ডাইরিতে কীসব লিখলেন। তারপর একটা রিকশ চড়ে মেয়েটাকে তুলে নিলেন।" সায়েবের ইঙ্গিতে রমাপতি আর একটা রিকশয় তাদের অনুসরণ করতে লাগলো।

"অদ্ভুত এক পরিস্থিতি স্যর! সায়েব হাজির হলেন ওই বাজারের মেয়েটার ডেরায়। ওকে পুরো ফি দিলেন। তারপর গল্পগুজব শুরু করলেন ওই ভোর রাতে। আমি পড়লাম মুশকিলে। মেয়েটা ভাঙা-ভাঙা ইংরিজী জানে, তাতে কথাবার্তা চালানো যায় না। দেহের ল্যাংগোয়েজ অন্য—তাই এ-পাড়ায় মেয়েদের শরীরের আদান-প্রদান বিদেশী সায়েবদের সঙ্গে অনায়াসে চলে, মুশকিল হয় মুখের ল্যাংগোয়েজে।"

রমাপতি অনেকক্ষণ দ্বিভাষীর কাজ করেছে। রমাপতি বললো, "রমলার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেবো, স্যর। আপনার বই পড়তে পাগল। সায়েব যে কীসব আবোলতাবোল জিগ্যেস করছে, রমলার সুবিধে মনে হয়নি।"

রমলা পরে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। পরে রমাপতিকে বলেছে, "অতো কথাবার্তার দরকার কী? সায়েবকে বলুন কাজকর্ম সারতে, তারপর চলে যেতে। আপনি বরং

একটু ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকুন, ওঁর সঙ্গে একটু খেলা করি। ঠাণ্ডা দুধ গরম হতে সময় লাগে।"

মার্কাস সায়েব পরে রমাপতির মুখে ওই কথা শুনে খুব হাসলেন। "পৃথিবীতে কার যে কী আসল কাজকর্ম তা বোঝা দায়। এই মুহূর্তে রমলার কাজকর্ম ও আমার কাজকর্ম এক নয়। স্রেফ কথা শোনাবার জন্যে এতো পয়সা কোনোদিন সে পায়নি।"

"দোষ দিতে পারেন না রমলাকে। শরীর দিলে তো বিপদে পড়তে হয় না, বিপদ আসে কথাবার্তা থেকে। তাই ওরা সন্দেহ করে, ভয় পায়।" রমাপতির কথাটা শুনে মার্কাস সায়েব নাকি আবার নোটবই খুলে কীসব লিখেছেন।

রমাপতি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আমাকে বললো, "এবার উঠি। মার্কাস সায়েব আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আপনার দয়ায় আমার আজ খুব সুখ, স্যর। সায়েবের গাড়িটা আমার জন্যে রাস্তায় হাঁ করে বসে আছে, যেমন স্বপ্ন দেখেছিল রাজেশ্বরী। সেইজন্যেই সে মিথ্যে কথা বলেছিল ঝুড়ি-ঝুড়ি। আমাদের গল্পের রমাপতি স্যর, যতবার বারাণসী থেকে কলকাতায় ফিরেছে, বউ আদর-যত্ন করেছে। সেই সঙ্গে পুরো মিথ্যে কথা—মালিকের ছেলের সঙ্গে সম্পর্কটা যে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠছে, ঘন-ঘন দেখা হচ্ছে, তা ঘুণাক্ষরে জানতে দেয়নি।"

জেকব মার্কাস আমার বাড়িতে খেতে এসেছেন। আমি রমাপতিকেও আশা করেছিলাম। কিন্তু মার্কাস বললেন, "আজ প্যাটির বিশেষ কিছু সেলিব্রেশন আছে, তাই সঙ্গে এলেন না।"

রমাপতির কী আবার উৎসব থাকতে পারে ? জেকব মার্কাস আমাকে অবাক করে দিলেন। আজ ইংরিজী কাগজের ব্যক্তিগত কলমে প্রকাশিত হয়েছিল : রমাপতি তার বিবাহের দিনটি স্মরণ করছে। পৃথিবীতে সবার ভাল হোক, সবাই সুখে থাকুক।

জেকব মার্কাস এবার রমাপতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। ওর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবার জন্যে আমিও প্রশংসা পেলাম। রমাপতির মতন মানুষের সঙ্গে দেখা না হলে জেকব মার্কাসের অভীষ্ট সিদ্ধ হতো না।

জেকব মার্কাসের অনুসন্ধান ও রচনার বিষয় : তিনশো বছরের কলকাতায় তিন দিন তিন রাত্রি। মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল, রাজনীতিবিদ এঁদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ স্থাপন করেননি জেকব মার্কাস। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তাঁর শরীরের কথা ভেবে সে চেষ্টাও করেননি। তার বদলে ইডেন প্রসৃতিসদন থেকে শুরু করে নিমতলা ঘাট পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন মার্কাস। এমন সব মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন যাদের নাম কোনোদিন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি।

রমাপতিকে জেকব বলেছিলেন, একজন দুষ্টু লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন

রমাপতি বলেছিল, কলকাতায় দুষ্টু লোকের কোনো অভাব নেই। তারা জুড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে বুক ফুলিয়ে এই শহরে হাঁটাচলা করছে। কত দুষ্টু লোক মরে যাওয়ার পরেও অত্যাচার চালাচ্ছে—তাদের নামে রাস্তা রয়েছে। তাঁদের ব্রোঞ্জ মূর্তিও তৈরি হয়েছে, সেই মূর্তির ওপর আলো পড়ছে। দুষ্টু লোকরা এমনভাবে সৎ লোকের সঙ্গে মিশে গিয়েছে যে, কে ভাল লোক এবং কে মন্দ লোক তা যাচাই করা বেশ শক্ত হয়ে উঠেছে।

এরপর জেকব মার্কাস বলেছিলেন, "একজন ভাল লোকের দেখা পেতে চাই।"

সায়েবের কথা শুনে খুব বিপদে পড়ে গিয়েছিল রমাপতি। "তা হলে চলুন মা তেরেজার কাছে। একজন ভাল লোকের সঙ্গে দেখা হবে।"

মা তেরেজা যে ভাল লোক তা সমস্ত দুনিয়া জেনে গিয়েছে। সুতরাং জেকব মার্কাসের আগ্রহ কম—তিনি চাইছেন এমন ভাল লোক যাঁকে আবিষ্কারের সম্মানটা তিনিই লাভ করেন।

রমাপতি খুব বিপদে পড়ে গিয়েছিল। কলকাতার রাজপথের জনস্রোত দেখিয়ে বলেছিল, এরা সবাই মাঝামাঝি লোক—একেবারে ভাল লোকও আছেন এই ভিড়ের মধ্যে, কিন্তু কী করে ওঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে? আর সব ভাল লোক তো কবে দেহরক্ষা করেছেন—বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, নিবেদিতা। সুভাষ বোসও ভাল লোক—কিন্তু এক শ্রেণীর সায়েব এখনও তা বিশ্বাস করতে চায় না।

সায়েব তখনও নাছোড়বান্দা। একজন ভাল লোককে সশরীরে দেখে যেতে চান। সায়েব বলেছেন, "রাজনীতিতে ভাল লোক নিশ্চয় আছেন এই দেশে।" রমাপতি বলেছে, "ভোটের আগে অনেক ভাল লোক দেখতে পাওয়া যায়, স্যর। কিন্তু ভোটের পরে কী যে হয়! ভাল লোকের খোঁজ পাবার জন্যে আবার পাঁচ বছর হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হয়।"

"বিজনেসে ভাল লোক?"

"সে তো সোনার পাথরবাটি।" এই কথা বলে রমাপতি সঙ্গে-সঙ্গে নিজের মত পরিবর্তন করলো। তারপর আমতা-আমতা করতে লাগলো। "ওই যে গল্পের রমাপতির কথা বলছিলাম। যার বউ রাজেশ্বরী হাতছাড়া হতে বসেছিল—মালিকের ছেলে কুমারমঙ্গল বর্মণের সঙ্গে যার গুপ্ত প্রণয় অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। অর্ডিনারি কর্মচারীর বউ রাজেশ্বরী তখন সত্যিকারের রাজেশ্বরী হবার স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু সেই সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। কলকাতা শহরে যে ভাল লোক আছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল।"

"কী রকম?" জানতে চেয়েছেন জেকব মার্কাস।

"আশ্চর্য ব্যাপার স্যর। ওই প্রভুদয়াল বর্মণ—একমাত্র সন্তানের স্নেহে মানুষ অন্ধ হয়ে থাকে, শত অপরাধ মেনে নেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে যখন সমস্ত খবরটা প্রভুদয়ালজীর

কানে গেল তখন তিনি ঋষির মতন হয়ে উঠলেন। ছেলেকে বললেন, তুমি যা করতে চলেছো তা ক্ষমার অযোগ্য। তুমি পৃথিবীর যে কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে পারো, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তুমি আমার অফিসের একজন নিরপরাধ কর্মীর ঘর ভাঙবে তা আমি ক্ষমা করতে পারবো না। যারা আমার এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তাদের সবার প্রতি আমার দায়িত্ব আছে। তুমি আমার সন্তান বলে তোমাকে আমি অপকর্মে প্রশ্রয় দিতে পারি না। যদি তুমি বাবার বিজনেসের সঙ্গে জড়িত থাকতে চাও তা হলে তোমাকে ওই বদখেয়াল থেকে দূরে সরে আসতে হবে। আমার কথা না শুনলে ত্যাজ্যপুত্র হতে হবে তোমাকে।"

রমাপতি বলেছে, "ভাবা যায় না, এমন মানুষ সত্যিই আছেন, যিনি আদর্শের ব্যাপারে আপস করেন না। বাড়িতে কী ভীষণ কান্নাকাটি, কত ধরাধরি। কিন্তু প্রভুদয়াল বর্মণ নিজের সিদ্ধান্ত থেকে নড়লেন না—প্রত্যেকটি কর্মচারী তাঁর সন্তানের মতন, তাদের স্ত্রীকে ভাগিয়ে নেবে তাঁর সন্তান, এ কল্পনাতীত।"

মার্কাস আমাকে বললেন, "দেখা যাচ্ছে, ঝানু বিজনেসম্যানের বুদ্ধিমান ছেলেরাও অনেক সময় বোকার মতন ব্যবহার করে। প্রত্যেক শহরেই খোঁজ করলে এক-আধজন অষ্টম এডওয়ার্ড পাওয়া যায় যারা মিসেস সিম্পসনের মতন একজন সাধারণ মহিলার প্রেমের পরিবর্তে রাজসিংহাসন ত্যাগ করতে পারে।" কী ভেবে জেকব মার্কাস বললেন, "হয়তো পিছিয়ে যাবার উপায় ছিল না ওই কুমারমঙ্গল বর্মণের। কারণ যতদূর শুনেছি, রাজেশ্বরী তখন প্রেগন্যান্ট। কুমারমঙ্গল বর্মণ হয়তো ব্ল্যাকমেলিং পজিশনে ছিলেন।"

রমাপতি যথাসময়ে সায়েবকে প্রভুদয়াল বর্মণের ঠিকানা দিয়েছিল। কিন্তু নিজে আপিসে ঢোকেনি। রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল।

জেকব মার্কাস বললেন, "ভাল লোক কি না জানি না, কিন্তু প্রভুদয়াল অবশ্যই ইন্টারেস্টিং লোক। অফিসের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে ছেলেকে ত্যাগ করার মতন সাহস ক'জনের থাকে? রমাপতিকে নাকি প্রভুদয়াল ডেকে পাঠিয়েছিলেন বলেছিলেন, তিনি খুবই লজ্জিত। কিন্তু তাঁর ছেলে যদি ত্যাজ্যপুত্র হয় তা হলেও রমাপতির কোনো অসুবিধে হবে না, তার চাকরি বহাল থাকবে।"

অফিসে এই ইন্টারেস্টিং লোকের ছবি দেখলেন জেকব মার্কাস। কিন্তু সাক্ষাৎ হলে না। তাঁর কোম্পানি অনেক ছোট হয়ে গিয়েছে। ছেলেকে তাড়িয়ে দেবার পরে ব্যবসায়ে তেমন মন দেননি। তারপর কোন সময়ে কর্মচারীদের কাছে কোম্পানি বিক্রি করে দিয়ে প্রভুদয়াল বর্মণ হরিদ্বারে চলে গিয়েছেন। এখনও বেঁচে আছেন প্রভুদয়াল অফিসের লোকরা বললো, হরিদ্বারে গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে।

জেকব মার্কাস বললেন, "বোঝা যাচ্ছে, কলকাতার সিটিজানরা ভীষণ নরম। তিন সেঞ্চুরি ধরে তারা মার খাচ্ছে, কিন্তু তারা কখনও প্রতিশোধ নিতে পারে না।"

আমি চুপচাপ শুনে যাচ্ছি। মনে হচ্ছে, মার্কাসের প্রতিবেদনে রমাপতিই কলকাতার ম্বল হয়ে উঠবে—যার সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছে, অথচ প্রতিবাদ সে কিছুই করতে ারেনি।

মার্কাস বললেন, "ইট্‌স্ এ ফানি স্টোরি। যার বউকে মালিকের ছেলে ছিনিয়ে ়তে চাইছে তার কোনো রি-অ্যাকশন নেই; শুধু মালিকের একটা সক্রিয় ভূমিকা য়েছে।"

রমাপতির সঙ্গে সাবধানে কথা বলেছেন জেকব মার্কাস "ইহুদিরা কোনো ত্যাচারের কথা ভোলে না। দ্বিতীয় যুদ্ধের অর্ধশতাব্দী পরেও তারা পুরনো ত্যাচারীদের খুঁজে বেড়াচ্ছে হন্যে হয়ে—ধরা পড়লে কোনো ক্ষমা নেই।"

রমাপতি বলেছে, "গপ্পোটা এইভাবে নিয়ে যাওয়া যায়, মিস্টার মার্কাস। ভুদয়াল ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন এমন আশঙ্কা নিশ্চয় আগে ছিল না। পৈতৃক ম্পত্তি হারিয়ে রাতারাতি রাজপ্রাসাদ থেকে রাস্তায় নেমে এসে কুমারমঙ্গল কী রবে? তার প্রেমজ্বর এবার ঘাম দিয়ে ছুটে যাবে। কিন্তু কিছুই সেরকম হলো না। াজেশ্বরীরও স্বপ্ন ভেঙে যাবে। মাইনাস রাজত্ব এক রাজপুত্রকে নিয়ে সুখের লোভ াপ পাবে। রাজেশ্বরীর কপালে ভোগসুখ নেই।

রাজেশ্বরীর সঙ্গে স্বামীর একটা মিটমাট কিছু হতো। কিন্তু রাজেশ্বরী বললো, আমাকে বাধা দিও না। আমার পেটে অন্য লোকের সন্তান।" এরপর আর কী রা যায়? যার পেটে কুমারমঙ্গল বর্মণের সন্তান তাকে নিজের কাছে রাখার চেষ্টা রে কী লাভ?

আমি এরপর চুপচাপ থেকেছি। সায়েবদের মূল্যবোধ এবং আমাদের মূল্যবোধ ক নয়। রমাপতির গপ্পোটা সায়েবের মনোজগতে কী রকম রূপগ্রহণ করে তা অবশ্যই ক সময় জানা যাবে।

আমি বললাম, "গল্পটা এখনও শেষ হয়নি। এর পরে একটা প্রতিশোধ পর্ব াছে। যার ফলে রমাপতি তার চাকরিটা হারালো।"

রমাপতি আমাকে বলেছিল, "নিজের বউ যখন মনিবের ছেলের সঙ্গে প্রেম করে ন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বাড়ি ছেড়ে চলে যায় তখন যে মনের কী অবস্থা হয় সে-সম্বন্ধে একটা ভাল চ্যাপ্টার লিখবেন, স্যর। যেন বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকে। এর ধ্যে কামনা আছে, বাসনা আছে, বঞ্চনা আছে, শোষণ আছে, ভুল বোঝাবুঝি আছে, প্রেম আছে, পরাজয় আছে। একটা পিক্যুলিয়র অবস্থা, স্যর। মানুষের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে যায়। আমার স্ত্রীর শরীরে আর-একজন পুরুষের বীজ বপন য়েছে—একটা অস্বাভাবিক আদিম অনুভূতি। মন দিয়ে লিখলে আপনি হৈ-হৈ ফেলে দিতে পারবেন। ছোটখাট প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেন।"

"এই অবস্থায় মানুষ স্থিতধী থাকে না। আপনি লিখে রাখুন, রমাপতি

কয়েকদিনের মধ্যে পাগলের মতো হয়ে উঠলো। স্বপ্নের মধ্যে সে গর্ভিণী রাজেশ্বরী শরীর দেখতে পাচ্ছে। তারপর সে হিসেব করতে লাগলো—যত নষ্টের গোড়া ও সতীশ বেয়ারা। সেই আড়কাঠির কাজ করেছে—ঘরের বউকে পরপুরুষের সঙ্গে ভিড়ি দিয়েছে। রমাপতির কোনো দরকার ছিল না ধারের টাকায়। সতীশ বেয়ারা লুকিয়ে লুকিয়ে আরও কী সর্বনাশ করেছে কে জানে! নিজের দেনার টাকাটা পুরো উশুলে জন্যই বোধহয় নির্লজ্জ দালালের কাজ করেছে সতীশ। রমাপতি যখন কলকাতা ছিল না তখন কী ঘটছে তা সতীশের অজানা থাকতে পারে না। বাড়িতে কুমারমঙ্গলে দু'একটা প্রেমপত্র উদ্ধার করেছে রাজেশ্বরীর বিছানার তলা থেকে। তাতে সতীশে উল্লেখ আছে।"

এরপর উত্তেজিত হয়ে উঠেছে রমাপতি। ছুটির পরে অফিস থেকে বেরিয়ে এ প্রকাশ্য রাজপথে রমাপতি পাগলের মতন ঝাঁপিয়ে পড়েছে সতীশ বেয়ারার ওপর "তুমি শালা যাতে আর আড়কাঠির কাজ না করতে পারো তার জন্যে দুটো কা কেটে দেবো।"

দুটো কানই কাটা গিয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছে সতীশ। রাস্তায় বেশ হৈ-চৈ খুনের চেষ্টার দায়ে ধরা পড়েছে রমাপতি। সতীশের কোমরও এমনভাবে ভেঙে যে শালা আর কোনোদিন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। অফিস যাওয়া তো দূরে কথা, বিছানায় বসে-বসে পেচ্ছাপ করতে হবে সারাজীবন।

রমাপতির কোনো দুঃখ নেই—যদিও মূল্য দিতে হয়েছে রমাপতিকে। চার বছরে জেল হয়েছে। প্রভুদয়ালজীও বিরক্ত হয়েছেন। রমাপতিকেও তিনি বরখাস্ত করেছেন তাঁর বহু সাধের প্রতিষ্ঠানটা দু'জনের খামখেয়ালিপনায় শেষ হতে চললো।

চমৎকার প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে, রমাপতির ধারণা। একেবারে সমস্যার মূ আঘাত করা গিয়েছে। সতীশ যদি আড়কাঠি না হতো তা হলে ওই কুমারমঙ্গলে সাধ্য কি রাজেশ্বরীর কাছে যায়?

যথা সময়ে জেকব মার্কাস কলকাতা থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর প্রতিবেদ কোনো সময়ে নিশ্চয় প্রকাশিত হবে। কলকাতা শহর তিনশো বছর ধরে কীভা বারে বারে স্থানীয় মানুষের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে এর বিবরণী প্রকাশিত হবে। হয়ে হৈ-চৈও হবে। সায়েবদের প্রশংসা, সায়েবদের নিন্দা সম্বন্ধে এদেশের মানুষ আজ ভীষণ সচেতন।

আমার চিন্তা রমাপতিকে ঘিরে। গল্পের রমাপতিকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আমি করবো তা ঠিক করা হচ্ছে না। রমাপতি বেশ কিছুদিন উধাও। জেকব মার্কাস তা তিন দিনে একুশশো টাকা দিয়েছেন। সুতরাং রমাপতি এখন কিছুদিনের জ নিশ্চিন্ত।

কয়েক মাস পরে রমাপতি আবার এলো। বললো, "আপনার পোস্টকার্ড পয়েছিলাম, কিন্তু আসা হচ্ছিল না। রমাপতির গপ্পোটা আপনার লেখবার সময় য়ে আসছে। আমি জানি, আপনার চিন্তা বাড়ছে।"

"সমস্ত ব্যাপারটা একটু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।" রমাপতি এবার কাঁদ-কাঁদ হয়ে ললো, "আর কখনও আমাকে সায়েবদের সঙ্গে মিশতে দেবেন না, স্যর।"

"কেন, কী হলো? সায়েব তো তোমাকে ভাল টাকা দিয়েছেন।"

"হ্যাঁ, এই তিন দিনে আমি যা রোজগার করেছি তা কোনো বাঙালী রাইটার স্মিনকালে রোজগার করতে পারবে না। তবু বলছি, আমাকে কখনও সায়েবদের াছে যেতে দেবেন না। এই দেখুন, আমি বীয়র কবে ছেড়ে দিয়েছিলুম, তারপর ায়েব আমাকে বীয়র ধরালো। সায়েব চলে যাবার পর সমস্ত টাকাটা আমি নেশা রে নষ্ট করলুম। আমার ব্রেক নষ্ট হয়ে গিয়েছে।"

"বীয়র বন্ধ হলেই ঠিক হয়ে যাবে, রমাপতি।"

"বীয়র তো বন্ধ হয়েছেই, কিন্তু ভিতরটা সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সায়েব ী যে নাড়া দিলো।"

"কেন, কী হলো?"

রমাপতি বললো, "ওই গপ্পের রমাপতিকে নিয়েই যত ঝামেলা। সতীশ বেয়ারার কামর ভেঙে প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যাপারটা শুনেও সায়েব খুব সন্তুষ্ট হলেন না। ললেন, দাস জাতিদের প্রতিশোধ একটু অন্য ধরনের। সারাক্ষণ নিজেদের ওপরেই াক্রমণ করে কলকাতার মানুষরা। বউ নিয়ে গেল মালিকের ছেলে, আর প্রতিশোধ নওয়া হলো এক নিরীহ সহকর্মীর ওপরে। এইভাবেই তৈরি হয়েছে ক্যালকাটার তনশো বছরের হিসট্রি। অন্যায় করেছে শক্তিমানরা, কিন্তু সাধারণ মানুষ প্রতিশোধের ন্যে নিজেকেই ক্ষতবিক্ষত করেছে।"

রমাপতি মুখ তুলে জানতে চাইলো, "আপনি কী বলেন?"

"আমি কী বলবো? প্রকৃত ঘটনাগুলো যেভাবে ঘটে থাকে গল্প-উপন্যাস আমি সইভাবেই লিখে থাকি; ইতিহাসের ওপর আমি কারুকার্য করি না।"

রমাপতি বললো, "রমাপতির ক্যারেকটারটা নিয়ে খুব ফ্যাসাদে পড়ে যাবেন আপনি। সতীশ বেয়ারার খোঁজখবর করা গিয়েছে—সে অনেকদিন মরে ভূত হয়ে গিয়েছে। নিজেরও নাক কেটেছে রমাপতি—জেল খেটেছে, চাকরি খুইয়েছে, কায়ক্লেশে নিঃসঙ্গ জীবনধারণ করেছে। রমাপতি ইহুদি হলে এমন হতো কি?"

একবার ভাবলাম, রমাপতিকে বলি, আমেরিকায় গিয়ে দেখো। ইহুদির বউ একে ছেড়ে আরেকজনকে বিয়ে করছে, সবাই মেনে নিচ্ছে। কিন্তু বলা হলো না।

উত্তেজিত রমাপতি বললো, "আমি বুঝতে পারছি না। প্রতিশোধটা কার ওপরে নেবে রমাপতি? ওই কুমারমঙ্গল বর্মণের তো যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। বাপের সম্পত্তি

হাতছাড়া হয়ে খুব কষ্ট পেয়েছে। এই শহর ছেড়ে তাকে চলে যেতে হয়েছে রাজেশ্বরীও সুযোগ পায়নি রানী সাজার। কলকাতার বাইরে গিয়ে তাকে কিছুদি কাজকর্ম করতে হয়েছে। আপনি হয়তো বলতে পারেন, কুমারমঙ্গল যখন ত্যাজ্যপু হতে চলেছে তখন রাজেশ্বরীকে একটা সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সে নিে বলেছে, তার গর্ভে অন্য লোকের সন্তান। অপরের সন্তানকে রমাপতি কেন বিপা ফেলবে বলুন তো ?"

একটু ভেবে রমাপতি বললো, "আপনি রমাপতির গপ্পোটা অন্যভাবেও শে করতে পারেন। রমাপতি গর্ভবতী বউকে বহু বছর আগে ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু এখনং মানসিক মুক্তি দেয়নি। প্রতিবছর বিয়ের দিনে এখনও সে স্টেটসম্যানে বিজ্ঞাপন দেয় স্রেফ রাজেশ্বরীকে একটু খোঁচা দিতে।"

"ওরা যখন কলকাতার বাইরে থাকে, তখন ওই বিজ্ঞাপন কি ওদের নজে পড়ে ?"

"আমিও তাই ভাবতাম, স্যর। কিন্তু ইদানীং ওরা কলকাতায় ফিরে এসেছে ওরা অবস্থাও অনেকটা ফিরিয়ে ফেলেছে। মাসী না কার সম্পত্তি পেয়ে কুমারমঙ্গ নিজে কিছু ব্যবসাপাতি করেছে—কিন্তু সে এখনও পাপের মধ্যে রয়েছে। রাজেশ্বরীে তো রমাপতি ডাইভোর্স দেয়নি। তার মানে বুঝতে পারছেন ? রমাপতি প্রতিশো নিয়েছে—ওদের নিজের সন্তান জারজ হয়ে গিয়েছে।"

আমি চুপচাপ রমাপতির কথা শুনে যাচ্ছি। রমাপতি বললো, "তা হলে প্রতিশো সিরিজে আপনার উপন্যাসটা ভালভাবেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।"

আমাকে তখনও নির্বাক দেখে রমাপতি বললো, "এই গল্পের জন্যে খেপে খে অনেকগুলো টাকা নিয়েছি আপনার কাছে। এই সমাপ্তি যদি আপনার অপছন্দ হ তা হলে সোজাসুজি বলুন।"

"রমাপতি, তুমি তো জানো, ঘটনাটা যদি সত্যিই এই রকম ভাবে শেষ হয়ে থাে তা হলে আমি সন্তুষ্ট, না হলে আমি সন্তুষ্ট নই।"

রমাপতি এবার কিছুটা উত্তেজিত হয়ে উঠলো। "আমি চাইছিলাম ে রমাপতির গপ্পোটা এইভাবেই শেষ হোক। রাজেশ্বরী যে ঠকেছে সেইটাই স্প হয়ে উঠুক। প্রভুদয়ালের মতন মানুষ যে পৃথিবীতে আছে তা লোকে জানুক কিন্তু কলকাতা শহরে কিছুই শেষ হয় না, স্যর। ইংলিশ কাগজের শ্রেণীব বিজ্ঞাপন বিভাগে আমার এক বন্ধু আছে। সে আমাকে বললো, মজা ব্যাপার। একটা লোক এসে বললো, প্রতিবছর অমুক তারিখে বিবাহ বার্ষিকী বিজ্ঞাপন বেরোয়, ওয়ান রমাপতির নামে। সেটা বন্ধ করা যায় ? কাগজে লোক রাজী হয়নি—অনেক বছর ধরে একই বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে। যদি মিথ দাবি কিছু থাকে তা হলে অন্য কথা। লোকটা বলেছে। এক ভদ্রমহিলার শরী

খারাপ, বিজ্ঞাপনটা দেখলে তাঁর মানসিক উত্তেজনা হতে পারে। তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে বিজ্ঞাপনটা ভীষণ খারাপ।"

রমাপতি বললো, "বুঝতেই পারছেন, রমাপতির গল্পোটা শেষ হয়েও হলো না। এই লোকটা নিশ্চয় ওই কুমারমঙ্গল বর্মণ। কিন্তু এতোদিন পরে সামান্য একটা বিজ্ঞাপন থেকে রাজেশ্বরীর মানসিক উত্তেজনা কেন? সুদর্শন প্রেমিক এবং তার ঔরসজাত সন্তান নিয়ে সে তো বেশ সুখেই জীবন চালাচ্ছে।"

রমাপতি হঠাৎ আমাকে অনুরোধ করলো, "উপন্যাসটা আপনি জানুয়ারী মাসের বিনোদন সংখ্যায় লিখে ফেলুন। আমি চাই লেখাটা রাজেশ্বরী পড়ুক। ওর স্বামী পড়ুক। ওর ছেলে পড়ুক। ওইটাই হবে গল্পের রমাপতির মোক্ষম প্রতিশোধ। আপনি কোনো ক্যারাকটারের নাম পাল্টাবেন না, স্যর। প্রয়োজন হলে বলে দেবেন রমাপতির মুখেই আপনি সব ব্যাপারটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনেছেন। সতীশ বেয়ারার কান কেটে, কোমর ভেঙে দিয়ে তেমন প্রতিশোধ নেওয়া হয়নি, মার্কাস সায়েব ঠিকই বলেছেন। কলকাতার লোকেরা তিনশো বছর ধরে এতো যন্ত্রণা সহ্য করেও প্রতিশোধ নিতে শেখেনি। এবারে লোকে বুঝুক, কন্দর্পকান্তি মালিকপুত্রের সম্পদ ও শরীর দুই-ই রাজেশ্বরীকে চরম প্রলোভন দেখিয়েছিল, শুধু অর্থ নয়।"

'বেশ রাত হয়েছে। গল্পের শেষটা আরও ভেবে দেখা দরকার। রমাপতি পরের দিন সকালে আসবে কথা দিয়ে বিদায় নিলো। সে যে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে তা বোঝা যাচ্ছে।

পরের দিন ভোরবেলায় রমাপতি আবার আমার বাড়িতে হাজির।

আসবার কথা ছিল সকাল সাড়ে ন'টায়, কিন্তু এখন মাত্র সাতটা। রমাপতি এখনই শ তিনেক টাকা চাইছে, জরুরী প্রয়োজন।

রমাপতির মুখেই শুনলাম, রাজেশ্বরী আর ইহলোকে নেই। আজ সকালে কেওড়াতলায় তার দাহ। রমাপতিকে কেউ খবর দেয়নি, আজকের ইংরিজী কাগজের 'ডেথ' কলমে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে : বর্মণ-১০২ ডিভিসি রোডে বুধবার রাজেশ্বরী। ডিপলি মোর্নড বাই কুমারমঙ্গল অ্যান্ড উমাপতি। লাস্ট রাইট অ্যাট কেওড়াতলা বৃহস্পতিবার সকালে।"

"ডাকে নি রমাপতিকে। তবু একবার ঘুরে আসি, কী বলেন স্যর? বাড়ির ঠিকানাটা আমার জানা ছিল না। তাছাড়া একটা অদ্ভুত ব্যাপার, এই উমাপতিটি কে? নিশ্চয় সেই ছেলেটি, যাকে গর্ভে নিয়ে রমাপতির পর্ণকুটির ছেড়ে চলে গিয়েছিল রাজেশ্বরী।"

এখন রাত আটটা। শুকনো মুখে রমাপতি আবার আমার বাড়িতে ফিরে এলো। বোঝা যাচ্ছে শ্মশানে অনেকক্ষণ ছিল রমাপতি। আজ শুধু-শুধু কষ্ট করে আমার কাছে আবার ফিরে আসবার কোনো প্রয়োজন ছিল না তার।

"ফিরে না এসে পারলাম না, স্যর। শ্মশান থেকে সোজা আসিনি, আমি একটু ড্রিংক করেছি। মানুষ ঘরসংসার ভেঙে অপরের ঘরে চলে গেলেও তার মৃত্যুর সময় শোক হয়। রাজেশ্বরী আমাকে ভীষণ ঠকিয়েছে, আমি বুঝতে পারিনি।"

এবার হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো রমাপতি। প্রথমে মনে হলো নেশার ঘোরে, পরে মনে হলো সত্যিই মনের দুঃখে কাঁদছে রমাপতি।

"মরা মানুষের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া যায় কী করে? আপনি তো অনেক পড়াশোনা করেছেন," রমাপতি আমার হাত ধরে জিজ্ঞেস করছে।

"অনেক তো হয়েছে, আবার প্রতিশোধ কেন? সেই কত বছর আগে রাজেশ্বরী তার স্বামীর সংসার ছেড়ে চলে গিয়েছে; তারপর এতোদিন পরে তার মরা-মুখ দেখা হলো, এই তো যথেষ্ট।" এও তো এক নতুন ধরনের শুভদৃষ্টি—ছাদনাতলার বদলে শ্মশানে।

"সেই সঙ্গে রাজেশ্বরীর ছেলেকে প্রথম দেখলাম, সংসার ভাঙবার সময় যে মায়ের পেটে ছিল। কতদিন যোগাযোগ নেই। সব সম্পর্ক নষ্ট হয়েছে, তবু রমাপতির সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। রাজেশ্বরী আমাকে মিথ্যে বললো কেন?"

"কি হলো রমাপতি? এতো উতলা হলে চলবে কেন? মনে রাখতে হবে গল্পের রমাপতির সঙ্গে রাজেশ্বরীর সমস্ত সম্পর্ক অনেকদিন আগে ছিন্ন হয়েছে।"

"কিন্তু ছেলেটির কি কান্না, স্যর। মায়ের বুকের ওপর আছড়ে পড়লো। কত আর বয়েস? এই উনিশ বছর। মা-মা করছে, আর এই রমাপতির বুকটা মুচড়ে উঠতে লাগলো। আর আমি বুঝতে পারলাম রাজেশ্বরীর সঙ্গে রমাপতির সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি।"

এবার রমাপতি হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসলো। পকেট থেকে তিনশো টাকা বার করে টেবিলে রাখলো। তারপর আমার হাত ধরে বললো, "আমি আপনার সমস্ত দেনা আস্তে আস্তে শোধ করে দেবো, কিন্তু দয়া করে রাজেশ্বরীর গল্পটা লিখবেন না আপনি। আমি আপনার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকবো।"

"কী হলো রমাপতি?"

রমাপতি চোখ মুছতে-মুছতে বললো, "ছেলেটিকে দেখেই আমি বুঝতে পারলাম রাজেশ্বরী আমাকে ঠকিয়েছে। সদ্য মাতৃহারা ছেলেটার মুখটায় আপনার এই রমাপতি বসানো! কুমারমঙ্গলের সঙ্গে কোথাও কোনো সাদৃশ্য নেই। হাবভাব চলনবলন, সব এই রমাপতির মতন। ভীষণ রাগ হলো রাজেশ্বরীর ওপর। বেঁচে থাকলে হয়তো ফাটাফাটি হয়ে যেতো। ও যদি আমাকে মিথ্যে না বলতো যে ওর গর্ভে অন্য লোকের সন্তান রয়েছে তা

হলে আমি রাজেশ্বরীকে যেতে দিতাম না কিছুতেই। আমাকে ঠকালেও রাজেশ্বরী কিন্তু নিজেকে ঠকায়নি—রমাপতির ছেলের তো তাই নাম রেখেছে উমাপতি। আমার ওপর অভিমান করেই বোধহয় সে মস্ত প্রতিশোধ নিয়েছে। যার ছেলেই ওর পেটে থাক, আমার উচিত ছিল রাজেশ্বরীকে সংসারে আটকে রাখা।"

আমি অবাক হয়ে মানুষটাকে দেখছি। রমাপতি আমার হাত দুটো আরও জোর করে ধরে ঝরঝর করে কাঁদতে-কাঁদতে বললো, "আপনার খুব অসুবিধা হবে জানি। তবু এ-গল্পটা আপনি লিখবেন না। গল্পটা জানাজানি হলে আমার উমাপতির ভীষণ ক্ষতি হবে। ও যেখানে আছে ওখানেই সুখে থাকুক। ওর কোনো অমঙ্গল করবো না। আমি জানবো, কলকাতা শহরে মরা মানুষের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া যায় না।"

ইন্ডিয়া

হাওড়া রামকৃষ্ণপুরে নৃসিংহধামের কাছে বোসদের বাজারে-রাস্তার ওপরে ঝুড়িতে রাখা কয়েকটা আপেল উল্টেপাটে দেখলো সে। দূর থেকে মন্দ লাগছিল না, কিন্তু প্রত্যেকটাতেই খুঁত—হয় অষ্টাবক্র, না হয় পোকা।

"নিন না স্যার, দাম কমিয়ে দেবো", দোকানদার বলে উঠলো। আরেকজন দোকানদার ওকে সামলে দিলো, "কাকে কি বলছিস!"

একটু এগিয়ে গেলেও কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পেলো অভিজিৎ। একজন ফলওয়ালাকে লঙ্কাওয়ালা বলছে, "চিনতে পারলি না! সোমেশ্বরবাবুর ছেলে! ফরেনে থাকে। ওঁরা খুঁতের জিনিস বিনাপয়সায় পেলেও নেবেন না।"

কত বছর পরে বোসদের এই ছোট্ট বাজারে পদার্পণ করেছে অভিজিৎ। সেবারে যখন শেষ ইন্ডিয়াতে এসেছিল অভিজিৎ তখন মা বলেছিলেন, "থলে দুটো নিয়ে একটু বাজারটা ঘুরে আয় না। পাড়ার পাঁচটা পুরনো লোকের সঙ্গে দেখা হবে।"

সেবার আঁতকে উঠেছিল অভিজিৎ, "আমার তো মাথা খারাপ হয়নি, মা! ওই ভিড়ের মধ্যে, ওই নোংরা ঠেলে, পায়ে কাদা লাগানো! বাজার করবার নামে হাজারখানেক লোক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ধস্তাধস্তি করছে। সেই সঙ্গে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়-বড় ছুঁচো এবং ইঁদুর।"

এই 'র‍্যাট'-এর কথা এক সময় উঠেছিল ডায়ানার সামনে। ইংরিজী ভাষার ওপর মেয়েটির দখল প্রচণ্ড। সেই সঙ্গে ব্যঙ্গর ক্ষমতা। ডায়ানা বলেছিল, "র‍্যাট নয়—প্রকৃত শব্দটা হলো ব্যানডিকুট।" তারপর সে ব্যঙ্গ করেছিল, "ইউ সুড নো, শব্দটা তোমাদেরই দান বিশ্বকে।"

অভিজিৎ জানতো না—তেলেগু প্যানডি-কোক্কু শব্দটাই আদি, যার অর্থ শুয়োরসাইজের ইঁদুর, যার আদিভূমি এই ভারতবর্ষ। সাতশো বছর আগে একজন বিদেশী পরিব্রাজক বলেছেন, এদের আকার শিয়ালের মতন। ১৩৪৩ সালে ইবন বতুতা লিখেছেন, দৌলতাবাদের যে অন্ধকার গর্ভগৃহে নবাবী আমলের অপরাধীদের ছেড়ে দেওয়া হতো সেখানে ছিল এই ব্যানডিকুটের বসবাস। বেড়ালরা পর্যন্ত এই ইঁদুর দেখলে ভয় পায়। ডায়ানার ব্যঙ্গ অভিজিৎ চুপচাপ হজম করেছে। যে জন্তু একদিন জঘন্য অপরাধীদের শাস্তির

জন্যে বন্দিশালায় রাখা হতো তা এখন ছড়িয়ে পড়েছে হাওড়া কলকাতার বাজারে, হাটে, হাসপাতালে, মন্দিরে, এমনকি কিছু বসতবাটীতেও !

সেবারে অভিজিতের মনে ছিল, ইঁদুরের দাঁতে বিষ আছে। যদিও মা ব্যাপারটার ওপর গুরুত্ব দেননি। একসময় অভিজিৎ তো নিয়মিত যাতায়াত করেছে বোসদের বাজারে, কালীবাবুর বাজারে। ইঁদুর অনেক আছে, কিন্তু কেউ শোনেনি তারা মানুষকে কামড়েছে। বরং বাজারে গেলে পাঁচটা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়, খোঁজখবর পাওয়া যায়, মনটা হাল্কা হয়ে যায়।

সেবারে যে-লোক বাজার যাওয়ার নামে আঁতকে উঠেছে, যে বলেছে পৃথিবীর সমস্ত বীজাণু ওই মাছের থলিতে বাসা বেঁধেছে ; সে নিজেই এবার বাজারে যাবার উৎসাহ প্রকাশ করলো। মা বরং অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তোর গায়ে কাদা লাগতে পারে। ভীষণ পিছল মাছের বাজারে। বলেছিলেন, তুই একটু অপেক্ষা কর। আমি দুটো নতুন বাজারের থলে দোকান থেকে আনিয়ে দিচ্ছি।

অভিজিৎ বারণ করেছে। পুরনো থলে না হলে বাজারের অর্ধেক আনন্দই তো নষ্ট ! অভিজিতের মনে পড়লো ইস্কুলে পড়ার সময়ে সে যখন নিয়মিত বাজারে যেতো তখন থলের একটা হ্যান্ডেল অবধারিতভাবে ছেঁড়া থাকতো। অনেক কসরতের প্রয়োজন হতো ওই থলের ভারসাম্য বজায় রাখতে।

শুধু ব্যানডিকুট নয়, সেবারে আরও অনেক অভিযোগ তুলেছিল অভিজিৎ। মায়ের নিশ্চয় মনে আছে। হাওড়ার বাজারে এখনও মধ্যযুগের পরিবেশ—যেমন বর্ণনা পাওয়া যায় ইবন বতুতার লেখায়। হৈ-চৈ হুল্লোড়, খরিদ্দারকে অহেতুক টানাটানি, অহেতুক দরাদরি। কোথাও কোনো সততা নেই—ওজন কম, ভাল জিনিসের সঙ্গে খারাপ জিনিস মিশিয়ে দেওয়া। ঠগ, পকেটমার, পাজী সব একসঙ্গে বাজারে জড়ো হচ্ছে প্রতিদিন সেই মধ্যযুগীয় পরিবেশে। অঢেল সময় মানুষের, এরই মধ্যে অকারণে প্রতিদিন ঘণ্টাদেড়েক সময় নষ্ট করছে, প্রতিদিন দরদাম চলেছে এবং প্রতিদিনই বুদ্ধির লড়াই অথবা সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি !

মা শকুন্তলা দেবী ছেলের কথা শুনে সেবারে চুপ করে গিয়েছেন। তর্ক করেননি, কিন্তু মেনেও নেননি। মানবেন কী করে ? হাওড়ার বাজার সম্বন্ধে এইসব কথা তো এর আগে কেউ বলেনি !

বলবে কী করে ? পৃথিবী ইতিমধ্যে কোথায় পৌঁছেছে, তা এ-পাড়ার কে তার খোঁজখবর করেছে ? অভিজিৎ মুখার্জি এখানে ক'জন হয়েছে ? তাছাড়া এখানে কেউ পড়াশোনা করে না, পৃথিবীর বড়-বড় রাষ্ট্রপ্রধান, গুটিকয়েক খেলোয়াড় আর চিত্রতারকা ছাড়া পশ্চিমের সাধারণ মানুষের জয়যাত্রা সম্পর্কে এরা কোনো খবরাখবরই রাখে না। রাখলে, জানতে পারতো কালীবাবুর বাজার, বাঙালবাবুর বাজার, বোসেদের বাজার পৃথিবী থেকে উঠে গিয়েছে। দাঁড়িপাল্লায় দু' নম্বরি বাটখারায়

ওজনের কারসাজিতে পৃথিবীর লোকের ঘেন্না হয়ে গিয়েছে। এখন বাছাবাছির পর ওজন হয়ে, প্যাকেটে পুরে মাল আসছে বিপণনকেন্দ্রে ! সেখানে কোনো হৈ-চৈ নেই দরদাম নেই। সবার জন্যে একদর। ঠাণ্ডা পরিবেশে, শুকনো খটখটে মেঝের ওপরে কোটি-কোটি ডলারের জিনিস বিক্রি হচ্ছে। কাঁচা বাজার আর মণিহারী বাজারের পার্থক্য ঘুচে গিয়েছে। সময়ের দাম হয়েছে মানুষের !

এর আগের বারে প্রতি মুহূর্তে ভারতবর্ষের ভুল দেখতে পেয়েছে অভিজিৎ। এখানকার কিছু মেনে নিতে পারেনি। বিরক্তি ধরে গিয়েছে মানুষের ওপর। এরা সমালোচনা শোনে. মিটমিট করে হাসে, কিন্তু কাজ কিছু এগোয় না। ভারতবর্ষের এইসব জনপদ অদৃশ্য ক্ষয়রোগের শিকার হয়—সমস্ত সমাজ-শরীরে ঘুসঘুসে জ্বরের প্রকোপ। নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু কারও কোনো মাথাব্যথা নেই।

হাওড়ার কথা ভাবতে লজ্জা হয়েছিল অভিজিতের। এই জনপদ যে ডুবে যাচ্ছে হেরে যাচ্ছে সে-খেয়ালও নেই। কেমন নিশ্চিন্ত আড্ডা চলেছে রোয়াকে-রোয়াকে কেমন হাত গুটিয়ে বসে আছে শক্তসমর্থ পুরুষমানুষের দল—কেউ কিছু করবে না আগ বাড়িয়ে। বসে আছে, কবে কোন জনদরদী সরকার এসে রাস্তা সারাবে. জঞ্জাল পরিস্কার করবে, ঘরের ঝুল ঝাড়বে, বাথরুমের দুর্গন্ধ দূর করবে, কলে জল দেবে চাকরির ব্যবস্থা করবে এবং সবার মুখে হাসি ফোটাবে।

অভিজিৎ জানে, এরপর লোকগুলো কী চাইবে জনদরদী নেতার কাছে। বলবে আর এক-আধখানা ঘর তুলে দাও, সস্তায় বিদ্যুৎ দাও, মেয়ের বর যোগাড় করে দাও, টিভি-তে হিন্দি নাচাগানা চালু রাখো সারাক্ষণ, মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল প্রতিদিন মিট করুক, ক্রিকেটের টেস্ট চলুক অষ্টপ্রহর ধরে।

ওসব ভাববার দরকার নেই অভিজিতের—যাদের ভাবা দরকার তারা ইডিয়ট বক্সের সামনে বসে বম্বে ফিল্মিস্টারের নাচ দেখুক, তাসপাশা খেলুক। অভিজিতের কোনো 'স্টেক' নেই এই দেশের সঙ্গে। সে মার্কিন নাগরিকত্ব পেয়ে যাচ্ছে। একটা মানুষের দুটো আনুগত্য থাকে না, থাকা উচিতও নয়।

মা শকুন্তলা দেবী ছেলেকে সামলাতে চেষ্টা করেছেন। বলেছেন. তুই নিমাইসাধন বোসের সামনে ওসব বলিস না। বোসেদের বাড়ির ছেলেরাও তো বিদেশে গিয়েছে অনেকদিন থেকেছে।

মায়ের এই দু'মুখো নীতি ভাল লাগেনি অভিজিতের। বোসেদের বাড়ির ছেলেরা গিয়েছিল পড়াশোনা করতে. ফিরে এসেছে এখানকার এই অচলায়তনকে মেনে নিতে সভাসমিতিতে গলায় মালা পরতে। মা, তোমার অভিজিৎ গিয়েছিল পড়তে, কিন্তু ওখানেই প্রতিযোগিতায় জিতে রুজিরোজগারে নেমেছে। ওখানের কমপিটিশন জিতেই ডায়ানা রবার্টসনকে অভিজিৎ নিজের জীবনসঙ্গিনী করেছে।

পিলগ্রিম ফাদার্সদের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে ডায়ানার ধমনীতে, তিন পুরুষ ইংলিশ দেশত্যাগীদের মধ্যেই বিবাহসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। ডায়ানার শরীর তার সাক্ষ্য দিচ্ছে, ডায়ানার ইংরিজী উচ্চারণ তার প্রমাণ দিচ্ছে। প্রতিযোগিতা ছিল যথেষ্ট—তিনজন সাদা মার্কিনীর সঙ্গে ডেটিং-এর রেসে জয়লাভ করে ভিক্টরি স্ট্যাণ্ডে আরোহণ করতে হয়েছে অভিজিৎকে, তবেই পেয়েছে ডায়ানাকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে।

ডায়ানা তার পৈতৃক পদবী ত্যাগ করে মুখার্জি হয়নি অবশ্য। ওই নামটা কোনো আমেরিকান হাজার চেষ্টা করেও সঠিক উচ্চারণ করতে পারে না—মুকহ্যারজি, মাক্‌হিয়ারজি, মাকহারজাই কতরকম শব্দ ওরা সৃষ্টি করে!

দুঃখ নেই অভিজিতের—মুখুজ্যে নামের বীজটা বিদেশের মাটিতে বুনবার জন্যে কোনো মাথাব্যথা নেই তার। ডায়ানাকে সে বলে দিয়েছে, ছেলেপুলে হলে তারাই সিদ্ধান্ত নেবে তারা মুখার্জি হবে না রবার্টসন হবে। পছন্দটা ওদের—অবাধ পছন্দের দেশ এই আমেরিকা। যার যা পছন্দ তাই কাজ করো, যার যা পছন্দ বিয়ে করো, যার যা পছন্দ তাই পেটে জমা না রেখে বলে ফেলো। প্রত্যেক মানুষেরই সেই একই স্বাধীনতা—পছন্দহলে দোকানে এসো, পছন্দ না হলে দোকান উঠে যাক। পছন্দ না হলে কর্মচারীকে সরিয়ে দাও চাকরি থেকে। পছন্দ না হলে স্বামী বউ কোনো কিছুই সহ্য করার প্রয়োজন নেই মহান এই সমাজে—পৃথিবীর একমাত্র স্বাধীন মানবসমাজে।

সেবারের সেই অভিজিৎ এতোদিন পরে আবার দেশে এসেছে। সেবারে দেশে থাকবে ঠিক ছিল দু' সপ্তাহ। কিন্তু তিনদিনেই অবস্থান অধৈর্য হয়ে উঠলো। হাওড়া ব্রিজে জ্যাম ছিল—সমস্ত ট্রাফিক নট নড়ন চড়ন দু' ঘন্টার জন্যে। বাঘমার্কা সরকারী বাস মাতালের মতন কালো ধোঁয়া ছেড়েছিল হাজার-হাজার মানুষের ওপর। তার ওপর বিদ্যুৎ বিভ্রাট—আলো নেই অনেকক্ষণ ধরে। বিদ্যুৎ শুধু আলো দেয় না জলও দেয় একথা খেয়াল হলো যখন বিদ্যুৎহীন পাম্পিং স্টেশন থেকে জল এলো না।

ওভারহেড ট্যাংকে জল না-থাকলে টয়লেটব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়। মা তবুও অভিজিতের মুখ চেয়ে বাথরুমে কয়েক বালতি জল আনিয়ে রেখেছিলেন রাস্তার টিউবওয়েল থেকে।

ঠিক সেই সময় বাহাত্তর ঘন্টা বিকল-থাকা হাওড়ার টেলিফোনটা হঠাৎ প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো। টেলিফোন এলো ডায়ানার কাছ থেকে। ওর কেমন ধারণা হয়ে গেল স্রেফ গাফিলতির জন্যে ফোন করেনি অভিজিৎ। এদেশের টেলিফোন যে বেশির ভাগ সময় অচৈতন্য হয়ে থাকে আমেরিকার কোন মেয়ে তা বিশ্বাস করবে? অতএব ভুল বোঝাবুঝি ভীষণ বাড়ছে—কারণ ডায়ানা একবার চেষ্টা করেই অভিজিতের হাওড়ার ফোন নম্বর পেয়েছে। কথা বাড়ায়নি, ঝট করে কেটে দিয়েছে ডায়ানা,

সংযোগ ছিন্ন করেছে। তারপর টেলিফোন আবার সমাধিস্থ। কিছুতেই কোনো নির্দে সে গ্রহণ করবে না।

অতএব আচমকা বিনা নোটিসে ফিরে গিয়েছে অভিজিৎ। মা কেঁদেছেন, কি বিশেষ কিছু বলেননি। সারাক্ষণ ওই এক নিমাইসাধন বোসের কথা গ্যাজর-গ্যাজ করে। ও তো হারভার্ড থেকে ফিরেও হাসিখুশি আছে— জ্যাম, লোডশেডিং পলিউশন ইত্যাদি সম্বন্ধে কখনও কারও ওপর রাগ দেখায়নি। বরং রসিকত করেছে, এসবই তো ইংরিজী সমস্যা— পশ্চিমী সভ্যতাই এসব হাওড়ায় নিয়ে এসেছে পাঁচশো বছর আগে এমন কি কবি ভারতচন্দ্রের সময়েও এসব সমস্যা ছিল না হাওড় শহরে।

রসিকতার একটা সীমা আছে! আসলে, ধৈর্যের নার্ভে নিমাইসাধনবা হয়তো কোনো গোপন অস্ত্রোপচার করিয়ে এসেছেন হারভার্ড মেডিক্যাল স্কু থেকে।

মায়ের কথার মধ্যে একটা চাপা সমালোচনা আছে আন্দাজ করে অভিজিৎ আর বিরক্ত হয়েছিল। টেলিফোনেই ডায়ানাকে বলেছিল, জীবন অসহনীয়।

সেই কথা দূর থেকে খুড়তুতো বোন অসীমা শুনেছিল। সে ভুল বুঝে অন্য ক প্রচার করে বেড়ালো—বউদি অনেক দূরে, দাদার জীবন বিরহের বোঝায় বেসামাল আর বহন করা যাচ্ছে না।

অভিজিৎ কেয়ার করেনি—একটা ফচকে ইন্ডিয়ান মেয়ে, যে পৃথিবীর রমণীদে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয়, তার কথায় কী এসে যায়?

এই খুড়তুতো বোনই আড়ালে রসিকতা করেছিল, দাদা মেমবউদির প্রেমে গদগদ

দাদা বিরক্ত হয়েছিল। ইন্ডিয়ার ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা, কোথাও কোনো প্রে আছে বলে মনে হয় না। তবু কী করে যে এদেশে বছরে-বছরে এতো বেবি হ তা-ই একটা রহস্য! কোথায় যেন অভিজিৎ লিখেছিল, ইন্ডিয়ানদের যত প্রেম স বিছানায়। এদেশে প্রেম মানে সম্ভোগ। লাভ কথাটার কোনো মানে ইন্ডিনরা জানে না—হাজার-হাজার বছর ধরে।

এর প্রমাণও অভিজিৎ ওদেশে ফিরে গিয়ে দাখিল করেছিল। এ ব্যাপারে ডায়া সাহায্য করেছিল—সাউথ এশিয় সাহিত্য সম্পর্কে খবরাখবর যোগাড় করে এ দিয়েছিল ওদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ওখানে রিচার্ড সেলিগম্যান নামে এক ছোক কমপিউটারে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের চুলচেরা বিশ্লেষণ চালাচ্ছিল। গুগেনহাই ফাউন্ডেশন থেকে কী একটা বৃত্তি পেয়েছে ওই সেলিগম্যান ছোকরা।

সেবার ওইভাবে আকস্মিকভাবে যাওয়া! মা বোধহয় আন্দাজ করেছিলে অভিজিৎ আর ফিরবে না। তাই কাঁদতে-কাঁদতে বলেছিলেন, তোকে কষ্ট করতে হ না। শুধু আমার শ্রাদ্ধটা করিস। মায়ের ধারণা, পরলোকে ভীষণ তৃষ্ণা। ইহলো

থেকে সন্তান জল দান না করলে তৃষিত আত্মা ছটফট করবে। এইভাবে অন্তহীন সময় চলতে থাকবে যদি-না গয়াধামে পিণ্ডদান করে আত্মজ। ছেলেকে গয়াতে আসতে বলতে সাহস পেলেন না শকুন্তলা মুখার্জি। ওখানে কোনো পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি চলে না, সন্তানকে স্বয়ং উপস্থিত থেকে পিতৃপুরুষের সঙ্গে লেনদেন সমাপ্ত করতে হয়। কিন্তু তর্পণ করা চলে পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্ত থেকে—সঙ্গে একটু নদীর জল থাকলেই হলো। নদী নেই এমন দেশ তো হয় না, সুতরাং অভিজিতের তেমন কিছু কষ্ট হবে না।

এদেশে আবার ফেরা, অপ্রত্যাশিতভাবে। ট্যাক্সিটা যখন দমদম থেকে অভিজিৎকে নিয়ে হাওড়ার এই বাড়িতে এলো তখন মা তো বিশ্বাসই করতে পারেন না। লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ পেলেও শকুন্তলা এতো খুশি হতেন না। মঙ্গলময়, তোমার দয়ার সীমা নেই—তুমি কখন কি দাও তা কেউ বুঝতে পারে না। মা প্রথমে হাসলেন, পরে কাঁদলেন কিছুক্ষণ। তারপর আবার হাসিতে মুখ বোঝাই করে ঠাকুরঘরে চলে গেলেন।

'রাস্তার অবস্থা নিশ্চয় আগের থেকে খারাপ দেখলি," শকুন্তলা ভয়ে-ভয়ে আছেন। এ দেশের রাস্তার দায়দায়িত্ব যেন তাঁরই।

রাগ দেখালো না অভিজিৎ। "বর্ষার পরে চিরকালই তো রাস্তা খারাপ হয়, মা। পূজোর আগে সারাবে। এক জায়গায় দেখলাম, খোয়া ফেলছে।"

"ট্রাফিক জ্যাম।"

"হাওড়া ব্রিজে ট্রাফিক আটকেছিল। কিন্তু মিনিট পনরো মাত্র। একটা লরি খারাপ হয়ে রাস্তার অর্ধেক আটকে দিয়েছে। গরীব দেশ ইচ্ছে করলেই সমস্ত পুরনো ট্রাক জাংক ইয়ার্ডে ফেলে দিতে পারে না।"

"ফোনটা দ'দিন বেগড়বাঁই করছে।"

বিরক্ত নয় অভিজিৎ। "ঠিক হয়ে যাবে নিশ্চয়।"

তা ছাড়া ফোন থেকে একটু মুক্তি মন্দ নয়। প্লেনে কোন ম্যাগাজিনে পড়লো অভিজিৎ, ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় শিল্পী গণেশ পাইন বাড়িতে ফোন রাখেননি। শিল্পী যামিনী রায়েরও ফোন ছিল না, কলিং বেল ছিল না। ফোন মানুষের সৃষ্টিকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করেনি, বরং মানুষের প্রাইভেসি কেড়ে নিয়েছে—কোথায় যেন লিখেছেন আমেরিকার বিখ্যাত এক দার্শনিক। এই লেখকের বক্তব্য ঃ যোগাযোগ ব্যবস্থা যত উন্নত হচ্ছে মানুষের দূরত্ব তত বাড়ছে। যান্ত্রিক নৈকট্য মানুষকে শেষ পর্যন্ত দূরে সরিয়ে দেয়!

সেই অভিজিৎ, যে ব্যানডিকুট সম্পর্কে ভয় পেয়েছিল, সে পরের দিন সকালে বাজারে যেতে চাইলো। শকুন্তলা বললেন, "তোর বাবাকে পাঠাচ্ছি।"

অভিজিৎ বললো, "আমিই যাই। বোসেদের বাজারটা অনেকদিন দেখা হয়নি।

জানো মা, এসব বেশীদিন থাকবে না পৃথিবীতে। সব শেষ পর্যন্ত বোঝাই হয়ে যাবে সুপারমার্কেটে। রোবটের সঙ্গে কেনা বেচা করতে হবে। যদি আমরা এই কালীবাবুর বাজার, বোসেদের বাজার শেষ পর্যন্ত রক্ষে করতে পারি, তা হলে দুনিয়ার মস্ত ট্যুরিস্ট আকর্ষণ হবে। স্রেফ ওরিয়েন্টাল বাজারের রোমাঞ্চ অনুভব করতে ছুটে আসবে হাজার-হাজার আমেরিকান, জার্মান, কানাডিয়ান, সুইডিশ, এমন কি জাপানীরা পর্যন্ত।"

"মাছের বাজারে বঁটিগুলো ঠিক আগেকার মতন আছে তো মা?" অভিজিৎ জানতে চাইছে।

"বঁটি আবার কী হবে? বঁটি আছে বঁটির মতনই।" মা ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। মা জানে না, এইরকম খাড়া ছুরি--আপরাইট নাইফ পৃথিবীর কোথাও নেই—ওয়াণ্ডার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড! ওই বঁটিতে মাছ কাটা দেখলে আই-বি-এম-এর চীফ এগজিকিউটিভ ভিরমি খাবে! ধৈর্য এবং স্কিল—দুটোই অক্ষত রয়েছে অনন্তকালের এই হাওড়ায়। কত ত্যাগ স্বীকার করে এই সব হেরিটেজ অবিকৃত রাখতে হয় তা পশ্চিমের লোকেরা ইতিমধ্যেই বুঝতে শুরু করেছে।

মায়ের হাত থেকেই নোংরা থলে দুটো তুলে নিলো অভিজিৎ। "পুরনো না হলে বাজারের থলে জাতে ওঠে না।"

বাজারে গিয়ে চাঞ্চল্য অনুভব করেছে অভিজিৎ। "সোমেশ্বরবাবুর ছেলে না?" অনেকেই চিনতে পেরেছে অভিজিৎকে। অথচ কতদিন তারা অভিজিৎকে দেখেনি।

সবচেয়ে যা বিস্ময়কর, সকলেই অভিজিতের জন্যে গর্বিত। "তুমি তো আমাদের গর্ব।" অথচ এই গর্ববোধের কোনো কারণ নেই। এঁদের কিন্তু কোনো প্রত্যাশা নেই অভিজিতের কাছ থেকে। এই সব মানুষের জন্যে অভিজিৎ কোনোদিন কিছু তো করেনি, বরং এদের একটু ছোটভাবেই দেখে এসেছে। তবু এঁরা অসীম দয়ায় অভিজিতের সমস্ত অপরাধ শুধু ক্ষমা করেনি, বরং তার জন্যে গর্ব বোধ করছে। নিউ ইয়র্কে, শিকাগোয়, স্যানফ্রান্সিসকোতে এই মনোভাব সম্ভব নয়--একমাত্র হাওড়াতেই এই ধরনের ভালবাসা এখনও বেঁচে রয়েছে।

অভিজিৎ প্রাণভরে বাজার করেছে। একটা ছেলের সঙ্গে পাতিলেবু নিয়ে দরদস্তুর করেছে। তারপর দুটো পাতিলেবুর জন্যে একটা দু'টাকার নোট রেখে দিয়ে সে চলে আসছিল। ছেলেটা পিছন-পিছন ধাওয়া করেছে প্রাপ্য খুচরো নিয়ে--সে শুনছে না যে অভিজিৎ ইচ্ছে করেই দু'টাকা রেখে চলে এসেছে। দু'টাকা দশ সেণ্টের মতন--ওই দামে কিছুই পাওয়া যায় না বিদেশে। ছেলেটা শুনলো না, খুচরো ফেরত দিলো। এরা ভীষণ সম্মানের মানুষ—না দিয়ে কিছু নেয় না, অভিজিৎ আবিষ্কার করলো।

খাবারের দোকানে অভিজিৎকে দেখে সবার খুব আনন্দ। রাজেন ময়রা ...ই, কিন্তু ওর ছেলে বীরেন ঠিক ওইরকম দেখতে হয়েছে। সেই গোল মুখ, ...ন নম্বর বলের সাইজের ভুঁড়িতে আলগা করে ধুতি জড়ানো, হাতাওয়ালা ...লি গেঞ্জি, গলায় কণ্ঠী, ডান হাতে ভারী তাবিজ। রাজেন টু যেন রাজেন ...য়ানের স্থান অধিকার করেছে।

এই দোকানেই আলুর দম খেতে আসতো অভিজিৎ ইস্কুলে পড়ার সময়। ...টির ভাঁড়ে সেই একই আলুর দম কিনলো অভিজিৎ। নিউ ইয়র্কে দোকান ...রলে মিলিয়নিয়ার হয়ে যেতো লোকটা, অভিজিৎ ভাবলো। "এথ্নিক ...লুর দম!"

রাজেনের ছেলে চিনতে পারলো অভিজিৎকে। শুনলো না, জোর করে বিনামূল্যে ...কটা সিঙ্গাড়া ও একটা জিলিপি খাওয়ালো। নিউ ইয়র্কে সিঙ্গাড়ার সাইজ কেমন ...নতে চাইছে রাজেনের ছেলে। সিঙ্গাড়া, জিলিপি, আলুর দম ছাড়া যে কোনো দেশ ...হে তা ধারণাই নেই রাজেনের ছেলের!

শেষপর্বে আপেল কিনতে গিয়ে পোকাধরা আপেল আবিষ্কার। এবং পিছন থেকে ...ই মন্তব্য শোনা। "সোমেশ্বর মুখার্জির ছেলে! খুঁতের জিনিস বিনা পয়সায় দিলেও ...বে না।"

শেষ কথাটা বাড়িতে বিছানায় শুয়েও ভুলতে পারছে না অভিজিৎ। ...তের জিনিস—দাম কমালেও সে নিতে চায় না। খুঁত! অভিজিৎ নিজেই ...তের জিনিস হয়ে গিয়েছে। সেই নিষ্কলঙ্ক, সম্ভাবনাময় অভিজিৎ মুখার্জি ...আর নেই।

শকুন্তলা দেবীর মনে পড়লো, সেবার সাত সকালে হাফ প্যান্ট, স্পোর্টস গেঞ্জি ... একটা ঢাউস রবারের জুতো পরে ছুটতে বেরুতো অভিজিৎ। পাক্কা পঁয়তাল্লিশ ...নিট এইসব সরু গলিতে ছোটা কী সম্ভব! কিন্তু উপায় নেই। মেমসায়েব বউয়ের ...শ্চয় ওই ধরনের নির্দেশ রয়েছে।

ছোটাছুটির নেশায় পড়েছে জাতটা—ইচ্ছে না-হলেও ছুটতে হবে। ছেলে-বুড়ো ...য়ে-মরদ শিক্ষিত-অশিক্ষিত বড়লোক-গরীব সবাই ছুটছে ক্যালরি নামক অসুরকে ...ড়িয়ে মারবার জন্যে। স্নানের পরে ওজন যন্ত্রের খবর নিয়েছিল অভিজিৎ। শকুন্তলা ...দবী খোঁজখবর করেছিলেন। কিন্তু এ পাড়ায় কারও ওজনের যন্ত্র নেই শুনে অবাক ...য়েছিল অভিজিৎ।

সেই অভিজিতের শরীর ভগবানের দয়ায় একটু ভাল হয়েছে। শরীরে একটু শাঁস লেগেছে—স্বামীকে কেন আমেরিকান মেয়েরা হাড়গিলে করে রাখতে চায় তা শকুন্তলা ...দবী বুঝতে পারেননি।

লুচি পরোটা বোঁদে রসগোল্লা ছোটবেলার প্রিয় কোনো জিনিসই সেবার স্প
করেনি অভিজিৎ। বউমা কোনো দিব্য দিয়ে রেখেছিল মনে হলো। একটু দুধ, এব
মাখন, একটু মিষ্টি শরীরে না-গেলে শ্রী আসবে কী করে ? শকুন্তলা বুঝতে পারেননি
কিন্তু অভিজিতেরও কোনো ধৈর্য ছিল না। মাকে কিছুই বোঝাবার চেষ্টা করেনি
বরং শুনিয়ে দিয়েছিল, খাওয়া নিয়ে তর্ক চলে না ; যা আমাদের ওখানে চলে ন
তা এখানেও চলে না !

সেই অভিজিৎ এবার পরম আনন্দে লুচি-আলু তরকারি খেলো। সেই সঙ্গে এক
মিহিদানা। ভাল লাগায় মিহিদানা রিপিট হলো।

আপেলগুলো আবার দেখতে পাচ্ছে অভিজিৎ। দূর থেকে কী সুন্দর ! কিন্তু হা
নিলেই ফুটোটা নজরে পড়ে যায়—পোকাধরা আপেলের বাজার-দর নেই।

অভিজিৎ নিজেই একটা পোকাধরা আপেল হয়ে গিয়েছে। তার দাম্পত্যজীবনে
সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।

ডায়ানা কিছুদিন থেকে ধৈর্যহীনা হয়ে পড়ছিল। অভিজিতের কোনো কিছুই তা
পছন্দ হচ্ছিল না। বিশেষ করে ওর শরীর—কুড়ি পাউন্ড বাড়তি ওজন নিয়ে (
নাকি ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ মিস্টার ফ্যাটির কোনো চিন্তা নেই। ইন্ডিয়ানরা না
ভীষণ মোটা হয়—ওবেসিটি কালাদের বিশেষত্ব ! একেবারে বাজে কথা--হাওড়া
মোটা লোক তেমন কই ? কিন্তু ডায়ানা রবার্টসন ওসব তর্ক পছন্দ করে না। কোম
একটা ফুলনো টায়ারটিউব নিয়ে ঘুরে বেড়ানো তার দু'চক্ষের বিষ।

একদিন হাত দিয়ে খাবার তুলে খেয়েছিল অভিজিৎ। ডিনার টেবিলে ধৈর্য হারি
ফেলেছিল ডায়ানা। বিয়ে হয়েছে বলে ওরিয়েন্টাল বর্বরতা সহ্য করবে না ডায়ানা
সভ্য হতে হবে। সুসংহত হতে হবে অভিজিৎকে। তারপরেই তীব্র আঘাত হেনেছি
ডায়ানা। যারা সভ্যতা শিখতে রাজী নয় তাদের ইন্ডিয়ায় ফিরে যাওয়া উচিত
ইন্ডিয়ার প্লেন এখনও বন্ধ হয়নি।

অভিজিৎ খুবই অস্বস্তি বোধ করেছে। বলতে ইচ্ছে করেছে এদেশে ঢোকব
অনুমতি ডায়ানা রবার্টসনের দয়ায় পাওয়া যায়নি ; এদেশে থাকার অনুমতিও ত
দয়ার ওপর নির্ভর করছে না।

কিন্তু ওসব বলার সাহস হয়নি অভিজিতের। রাগ না চণ্ডাল, মায়ের ক
মনে পড়ে গিয়েছে অভিজিতের। রাগ কমলে ডায়ানাও বুঝবে এবং হয়ে
লজ্জা পাবে।

কিন্তু কোনো লজ্জা পায়নি ডায়ানা। রিচার্ড সেলিগম্যানকেই মনে ধরে গিয়ে
ডায়ানার। তার আগে অবশ্য দেহেও ধরা দিতে হয়েছে বেশ কয়েকবার। অভিজি
যখনই শহরের বাইরে গিয়েছে তখনই অভিজিতের বিছানাতে আতিথ্য নিয়েছে রিচা
সেলিগম্যান। সে খবর ডায়ানা পরে নিজেই স্বীকার করে নিয়েছে। 'পট বেলি

অভিজিৎ সম্পর্কে ডায়ানার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই একথা জানাতে দ্বিধা করেনি ডায়ানা।

বাড়িটা দু'জনের নামে ভাড়া নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ডায়ানা বিতাড়িত করেছে অভিজিৎকে। মেয়েরা যে কতখানি হৃদয়হীনা হতে পারে তা আন্দাজ করাও বেশ কঠিন। ডায়ানা যা কিছু যোগাযোগ করেছে তা উকিলের মাধ্যমে। বিয়ে ভাঙার পরে অভিজিৎ প্রথমে উঠে এসেছে হোটেলে। তারপর একটা ছোট্ট অ্যাপার্টমেণ্ট দেখে নিয়েছে। সুপার মার্কেটে সেলিগম্যানের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাকে উইশ করেছে সেলিগম্যান। ডায়ানাকে ছিনিয়ে নিয়ে ছোকরা এখন খুব সুখে রয়েছে মনে হলো। খুব উৎসাহের সঙ্গে বউয়ের একান্ত ব্যক্তিগত শারীরিক প্রয়োজনের জিনিসপত্তরও কিনছে—কোনো লজ্জা নেই তার।

এই সেলিগম্যানই অভিজিৎকে উপাদান সংগ্রহ করে দিয়েছিল। ভারতবর্ষের নারী-পুরুষের সম্পর্ক যে দেহসর্বস্ব তা সংস্কৃত সাহিত্যের উদ্ধৃতি থেকে বোঝাতে চেয়েছিল অভিজিৎ। হাজার দেড়েক বছর আগে প্রকাশিত কথাসরিৎসাগরের গল্পগুলো খুব কাজে লেগেছিল। পদে-পদে শুধু নারীর স্থূল দেহবর্ণনা। নারীর অন্তরের কথার কোনো উল্লেখ নেই—পুরুষের কামনায় ইন্ধন যুগিয়ে সন্তান উৎপাদনই তার বেঁচে থাকার একমাত্র যুক্তি। সংস্কৃত সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ সুন্দরীরা নিজেদের স্তনভারে বিব্রত, মদনের শরাঘাতে তারা বস্ত্রহীনা হয়। বক্ষ, নিতম্ব, নীবিবন্ধনের কী পুঙখানুপুঙখ বর্ণনা ! কিন্তু যৌনসম্পর্কবিবর্জিত কোনো চিন্তার উপস্থিতি নেই কোনো নারীচরিত্রে।

কয়েকটি উদ্ধৃতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সংস্কৃতে লেখা হয়েছে : "বিবাহিতা কি অবিবাহিতা, পিতৃগৃহবাসিনী অথবা বারবনিতা, কোনোপ্রকার স্ত্রীলোকের প্রতি আস্থা স্থাপন করিবেন না, তাহারা সকলেই চপলমতি।...স্ত্রীজাতিকেই ধিক্ যাহারা মক্ষিকার ন্যায় কর্পূর ত্যাগ করিয়া অশুচি দ্রব্যে আকৃষ্ট হয়।"

অনূঢ়া রাজকন্যাদেরও নাকি সেকালে কোনো ব্যক্তিত্ব ছিল না। পরোপকারী নামে এক নৃপতি তাঁর মহিষীকে অনূঢ়া কন্যা সম্বন্ধে বলেছেন : "কন্যা অন্যের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে এবং তন্নিমিত্তই তাহাকে লালনপালন করিতে হয়। বাল্যকাল ব্যতীত পিতৃগৃহ তাহার পক্ষে বাস করিবার উপযুক্ত স্থান নহে। অবিবাহিতা রজঃস্বলা কন্যা গৃহে থাকিলে তাহার আত্মীয়স্বজনেরা নরকে গমন করে।...যুবতী কন্যাকে গৃহে রাখা সমীচীন নয়।...কুমারী কন্যার উপযুক্ত বিবাহ না হইলে তাহা বেসুরা সঙ্গীতের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। উহা অপরিচিতেরও কর্ণপীড়া উৎপাদন করে।"

রমণীশরীরের জয়স্তুতিতে বারাঙ্গনাগণও সেকালের সাহিত্যে গৃহস্থ রমণী অপেক্ষা বেশী স্থান অর্জন করেছে, লিখেছিল অভিজিৎ।

বৃহৎ হনুযুক্তা, দীর্ঘদন্তী এবং ভগ্ননামা এক কুট্টিনী তাহার কন্যাকে যে শিক্ষা দিয়েছিল তাও আভিজিৎ বিদেশে ফাঁস করতে দ্বিধা করেনি। "ধনের নিমিত্তই সকলে

পূজ্য হয়, বিশেষতঃ বারাঙ্গনাগণ। প্রেমাসক্ত হইলে বেশ্যা বিত্তলাভ করিতে সমর্থ হয় না।...সুদক্ষা অভিনেত্রীর ন্যায় সুশিক্ষিতা বারবনিতা মিথ্যা প্রেমের ভান করিবে। এই প্রকারে পুরুষের আসক্তি আকর্ষণপূর্বক সে তাহার সমস্ত ধন অপহরণ করিবে এবং তাহার সর্বনাশ হইলে অবশেষে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।"

ডাইভোর্সের পরে আফসোস করেছে অভিজিৎ। এক ধরনের বিচিত্র নিঃসঙ্গতা ঘিরে ধরেছিল অভিজিৎকে। ডায়ানা যে এমন হতে পারে তা ভাবতেও কষ্ট হচ্ছিল। মনে হয়েছিল দূরত্বই সবচেয়ে কাম্য। যে তাকে বঞ্চনা করেছে তার থেকে দূরত্ব এবং দেশের আপনজনদের থেকে দূরত্ব দুইই কাম্য।

সেলিগম্যানদের থেকে দূরত্ব সৃষ্টি করা কষ্টসাধ্য নয় আমেরিকায়। চাকরি পরিবর্তন করেছে অভিজিৎ। সরে গিয়েছে মধ্যপশ্চিমে যা মিডওয়েস্ট নামে পরিচিত।

এই মিডওয়েস্টেই প্রায় নির্বাসিত জীবন যাপন করেছিল অভিজিৎ। স্থানীয় ভারতীয়দের সঙ্গে যোগসূত্র কখনই দৃঢ় ছিল না, নিঃসঙ্গ জীবনে সম্পর্কটা আরও দুর্বল হয়ে উঠেছিল। পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে ভারতীয়দের কৌতূহল অতি মাত্রায়। তবু মাঝে-মাঝে জন্মভূমির মানুষদের জন্যে মন টানে। বিদেশে অর্থোপার্জনই সব নয়, আরও কিছু প্রয়োজন থেকে যায় আত্মার।

অবশেষে বাংলায় যখন শরৎ এলো ঠিক সেই সময় প্রবাসের বাঙালীদের মন শারদোৎসবের জন্যে হাহাকার করে উঠলো। উইক এন্ডে দেবী দুর্গার আবাহন ও আরাধনার জন্যে প্রবাসীর মন উদ্বেল হয়ে ওঠে। এই পূজা মানুষকে টেনে আনে দূর-দূরান্ত থেকে।

প্রবাসের পূজা এক অনন্য অভিজ্ঞতা। না অংশ গ্রহণ করলে দেবীমাহাত্ম্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। দিনক্ষণ দেখে পূজা সম্ভব হয় না। মাকে আনতে হয় নির্ধারিত সময়ের আগের শনি-রবিবারে অথবা নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী শনি-রবিতে। ভাড়া করা হয় স্থানীয় কোনো সভাগৃহ। দেবী-মূর্তি আসে স্বদেশ থেকে অথবা তৈরি হয় কোনো সুনিপুণ বঙ্গবধূর বেসমেন্ট স্টুডিওতে। যারা তাও পারে না তারা নির্ভর করে পটের ওপর।

শারদোৎসব আসলে বাঙালীর বাৎসরিক মিলনোৎসব। যেভাবেই হোক, সবাই আসেন সপরিবারে এবং দীর্ঘসময় ব্যয় করেন। খাওয়া-দাওয়া সবই একাসনে।

এইখানে পুরোহিত ও তাঁর সহকারী যে-মন্ত্র পাঠ করেন তা স্বদেশে আজকাল শোনা সম্ভব হয় না। কারণ অ্যামেচার পুরোহিত প্রায়শঃই কোনো বিশেষ বিদ্যায় ডক্টরেট। প্রাণের তাগিদে শেখা তাঁর সংস্কৃতে কোনো খাদ থাকে না।

এই পূজার সভায় অভিজিৎ লক্ষ্য করলো এক দম্পতিকে। দুধসাদা সিল্কের ওপর চওড়া লাল পাড় শাড়ি পরেছেন এক পদ্মলোচনা বঙ্গললনা। ছেলেটির বয়স দশ

এগারো, মায়ের তুলনায় একটু চাপা রঙ। ছেলেটি যে-লোকটিকে বললো, বাবা এবার পুষ্পাঞ্জলি দিতে হবে, তারপর আমরা কফি খাবো, সেই মানুষটি গোবেচারা ধরনের। বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে মনে হলো।

পুষ্পাঞ্জলির পরে এই পরিবারের সঙ্গে আরও আলাপ হলো। তারপর মহিলা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন, আপনার স্ত্রী কখন আসবেন ?

অভিজিৎ অস্বস্তিতে পড়লো, কিন্তু চেপে রাখলো না। ওই পর্বটা তার শেষ হয়ে গিয়েছে। ভেবেছিল এবার দূরত্ব বেড়ে যাবে। কারণ প্রবাসের বাঙালী বধূরা ঘরভাঙা মানুষদের সঙ্গে একটু দূরত্ব রেখে চলেন। একটু অস্বস্তি এসে যায়। স্ত্রীই হচ্ছে এই সমাজে মেলামেশার চাবিকাঠি।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেরকম কিছু হলো না। ছেলেটি হঠাৎ বাবাকে টেনে নিয়ে চললো কফির লাইনে। ওরা সবাই উপবাস করেছে। মহিলা কিছুক্ষণ অভিজিতের কাছে রয়ে গেলেন। অভিজিৎ ব্রেকফাস্ট করে পূজা দিতে এসেছে শুনে মহিলা শাসনের সুরে বললেন, "ওই জন্যেই তো মা চটে যান। কাল না খেয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে আসবেন, আর মায়ের কাছে প্রার্থনা করবেন, আমার সমস্ত দুঃখ দূর করে দাও।"

অভিজিৎ একটু অবাক হলো। স্নেহের সঙ্গে শাসনের মিশ্রণ একমাত্র মা ছাড়া কারও কাছ থেকে পায়নি সে। সেই মাও এখন অনেক দূরে এবং তেমন যোগাযোগ নেই। বিয়ে ভাঙার পরে ব্যাপারটা আরও শিথিল হয়ে গিয়েছে, অভিজিৎ অকারণে নিজেকে আরও দূরে সরিয়ে নিয়েছে।

অবাক হবার বাকি ছিল। মহিলা বোধহয় অভিজিৎকে অনুপ্রাণিত করার জন্যেই বললেন, "একবার ভুল হলেই জীবন শেষ হয়ে যায় না, মিস্টার মুখার্জি। ফেল-করা ছাত্রছাত্রীরা আবার পরীক্ষা দিতে পারে। এই তো আমরা আবার পরীক্ষায় বসে পাস করেছি। আমরা বেশ সুখী। আমাদের কোনো কষ্ট নেই।"

অভিজিৎ বিশ্বাস করতে পারছিল না ওই লোকটি ওই ছেলেটির জন্মদাতা নয়। সুপ্রভা রায় বললেন, "আমি এদেশে এসেছি দু'বছর। আমি নতুন জীবন আরম্ভ করেছি।"

সুপ্রভার স্বামী ছিল মদ্যপ এবং জালিয়াত। একটা রিভলবার সবসময় সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াতো, কত হাঙ্গামায় যে জড়িয়ে পড়েছে লোকটা। তারই ঔরসে সন্তান। কিন্তু সংসার করা সম্ভব হয়নি শেষ পর্যন্ত, সুপ্রভা ফিরে এসেছে পিত্রালয়ে। ডাইভোর্স হয়েছে।

"এই ডাইভোর্সে আমাকে সবচেয়ে সাহায্য করেছিলেন বড় ননদ। অদ্ভুত মহিলা। তিনি মাকে বললেন, ওর জীবন নষ্ট করবেন কেন ? আবার বিয়ে দিন। দু'বছরের চেষ্টার পরে ডঃ নীতিশ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ হলো। উনি মেমসায়েব বিয়ে করেছিলেন—বিয়ে টেকেনি। তারপর বিয়ে হলো ; আমরা চলে এসেছি দু'বছর আগে।

মনে নানা ভয় ছিল—কিন্তু আমরা সুখী হয়েছি, মিস্টার মুখার্জি। বিশেষ করে আমার ছেলে। বাবার সঙ্গে ওর ভীষণ ভাব।"

হাস্যময়ী সুপ্রভার ডাক পড়লো পুত্র ও স্বামীর কাছ থেকে। তারা কফি ও ব্রেকফাস্ট নিয়ে অপেক্ষা করছে।

সুপ্রভা এগিয়ে গেল। কিন্তু তার আগে কেমন সহজভাবে বলে গেল, "কাল খালি পেটে মায়ের কাছে মন দিয়ে প্রার্থনা করুন। তারপর দেশে চলে যান। দেশে আমার মতন অনেক দুঃখী মেয়ে আছে। কোনো অসুবিধে হবে না।"

কেউ কোনোদিন বিদেশের মাটিতে সামান্য কিছুক্ষণের পরিচয়ে এইভাবে উপদেশ দিতে সাহস পায়নি অভিজিৎকে।

পরের দিন আবার দেখা হয়েছিল, পূজাপ্রাঙ্গণে। সুপ্রভা নিজেই বললো, "এই তো, দেখেই বুঝছি, কথা শুনেছেন। উপবাস করেই এসেছেন পুষ্পাঞ্জলি দিতে। খুব ভাল করে প্রার্থনা করুন, মা সব শোনেন।"

সুপ্রভা কী করে বুঝলো অভিজিৎ আজ সত্যিই উপবাস করেছে? নিষ্ঠাবতী বাঙালি রমণীরা বোধহয় সত্যিই ত্রিনয়নী। এদের নতুনভাবে দেখতে শুরু করেছে অভিজিৎ এই আনন্দময়ীরাই তো পূজাপ্রাঙ্গণ আলো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হাওড়ার বাড়িতে বসে অনেক কথা মনে হচ্ছে। ছেলে আবার বিয়ে করতে রাজি হয়েছে, এই খবর মাকে খুব আনন্দ দিয়েছে।

অভিজিৎ স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় চিরদিনই খুব ভাল ফল করেছে। পাস করবে কি না এই দুশ্চিন্তা স্বদেশে অথবা বিদেশে কখনই আসেনি। তাই সুপ্রভা রায়ের ওই ফেল-করা ছাত্রের উপমাটা মনে পড়ে যাচ্ছে ঘুরে-ফিরে। ভারী সুন্দর বলেছিল মিসেস রায়—ফেল-করা ছাত্রছাত্রীদের আবার পরীক্ষায় বসতে তো কোনো বাধা নেই।

শুধু দাম্পত্যজীবনের দ্বিতীয় পরীক্ষাটা একটু অন্যরকম। ফেল-করা ছাত্রকে এমন দোসর খুঁজতে হবে যে নিজেও ফেল করেছে। দু'জন অকৃতকার্য ব্যক্তির মধ্যে সার্থক যোগাযোগ স্থাপনের সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু সেখানেও যথেষ্ট সুখ রয়েছে—তার প্রমাণ তো ওই আনন্দময়ী সুপ্রভা রায় ও নীতিশ রায়। সবচেয়ে লাভ হয়েছে যার সে ওই দশ-এগারো বছরের ছেলেটির। কলকাতায় বসে অসহায়ভাবে মায়ের চোখের জল মোছা না দেখে সে বিদেশের প্রাণস্রোতের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। ডঃ নীতিশ রায়কে এমন একটি রেডিমেড সন্তান পেয়ে খুবই সুখী মনে হলো। তৃষিত ব্যথিত ব্যর্থ জীবনেও আবার সুখ সার্থকতা ফিরে আসে। সুখ যেতেও যতক্ষণ আবার ফিরতেও ততক্ষণ।

মা শকুন্তলা দেবী ঘরে ঢুকে ছেলেকে চা দিয়ে গেলেন। বিছানায় শুয়ে

য়ে এমন রাজকীয় স্টাইলে চা পান অনেকদিন হয়নি। অথচ হাওড়ায় নেকেই এই বিলাসিতা সারাজীবন উপভোগ করে যাচ্ছে। চায়ের কাপ জবার কথাও ওঠে না। পুরনো অভ্যেসমতো অভিজিৎ চায়ের কাপ ধুতে য়েছিল—বাড়িতে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল।

ছেলে অনেক শান্ত হয়ে গিয়েছে, মা লক্ষ্য করছেন। দেশ সম্বন্ধে যা-সব লিখছিল তে অনেকেই অস্বস্তি বোধ করছিল। একজন তো তাকে বলেছিল, অভিজিতের ম পাল্টে অভিযোগ মুখার্জি রাখুন।

সেই পর্ব শেষ হয়ে গিয়েছে। দেশের যেসব জিনিস প্রথম প্রবাসের পর অসহ্য নে হয়েছিল তা এখন ততটা খারাপ মনে হচ্ছে না। সব ব্যর্থতার পিছনে যেন কটা যুক্তি লুকিয়ে রয়েছে। এখানে মানুষের সহ্যশক্তি একটু বেশী। ফলে সমস্যার মাধান হতে দেরি হয়। অধৈর্য ও অশান্তরাই পৃথিবীতে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু অভীষ্ট ভ করেও তারা শান্তি পায় না। অভিজিতের মনে হলো।

মায়ের দুঃখ অনেক। একসময় কত আশা বুকে করে বসেছিলেন, মনের মতন য়ে দেবেন ছেলের। সেই আশায় সেবার কাগজে বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলেন। মেরিকায় শিক্ষিত ও কর্মরত ব্রিলিয়ান্ট মুখার্জি (২৬) পাত্রর জন্য প্রকৃত সুপাত্রী ই। পাত্রীই একমাত্র বিবেচ্য।'

তারপর কী হয়েছিল শকুন্তলার মনে আছে। চিঠি এসেছিল প্রায় এক হাজার। র টেলিফোনে যে কত খোঁজ এসেছিল! সেই সব চিঠিগুলো এখনও যত্ন করে ন্ডিল বাঁধা অবস্থায় এ-ঘরের টেবিলে পড়ে রয়েছে।

বাঙালীর ঘরে যে কত সুযোগ্যা পাত্রী রয়েছে তা শকুন্তলা দেবীর জানা ছিল না। ইসব পাত্রীরা কেউ বি-এ পাসের কম নয়। এম-এ, এম-এসসি অনেকে। আর াছে ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার গবেষিকা। এরা শুধু পড়াশোনায় কৃতী নয়, এরা গান জানে। কউ ছবি আঁকায় পারদর্শিনী। নাচেও সুদক্ষা কেউ-কেউ। মেয়েরা এ দেশে র্বগুণান্বিতা হয়। অনেকে ছবিও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কে বলে বাঙালী মেয়েরা ন্দরী সুলক্ষণা নয়? শকুন্তলা দেবীর দশটা ছেলে থাকলেও কোনো অসুবিধা হতো । দশটি প্রকৃত গুণান্বিতা পাত্রী নির্বাচন করতে।

সেবারে কে না উৎসাহ দেখিয়েছিল? শকুন্তলা দেবী অবাক হয়ে য়েছিলেন। পত্র-লেখকদের মধ্যে হাইকোর্টের জজ, সরকারের সেক্রেটারি, ড় কোম্পানির কর্ণধার, ভাইস-চ্যান্সেলার, ডাক্তার, খ্যাতনামা উকিল, লিটারির ব্রিগেডিয়ার পর্যন্ত ছিলেন।

একজন খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ ও প্রখ্যাত ভাস্করও তাঁদের কন্যাদের বিবরণ াঠিয়েছিলেন। এইসব মানুষ যে কোনোদিন হাওড়ায় আসবার উৎসাহ দেখাবেন তা ল্পনায় ছিল না শকুন্তলা দেবীর। একজন প্রখ্যাত গায়িকাও ছিলেন পাত্রীর

তালিকায়। খুব উৎসাহ বোধ করেছিলেন শকুন্তলা—এর গান বেতারে ও টিভি
বেশ কয়েকবার শুনেছেন শকুন্তলা। এমন মেয়েকে পুত্রবধূ হিসেবে পাওয়ার সম্ভাবনা
গর্ববোধ করেছিলেন তিনি।

চিঠিগুলি পড়ে এবং মেয়েদের বিবরণ জেনে স্বামীকে বলেছিলেন শকুন্তলা, ক
গুণের মেয়েকে বাবা-মা কত যত্ন করে মানুষ করেছে দেখো ! তবু লোক বলে, বাঙালী
নাকি পিছিয়ে পড়ছে। একেবারে বাজে কথা।

সোমেশ্বরবাবু কিছু বলেননি। তিনি তাঁর পুত্রের ব্যঙ্গাশ্রয়ী ইংরিজী রচনা পড়েছে
ভারতীয় মেয়েদের বন্ধনদশা ঘুচিয়ে দিয়ে নতুন এক প্রজন্ম তৈরি হোক। তারপ
যদি ভারতীয় পুরুষগুলো মানুষ হয়। "দেয়ার উইল নেভার বি এ জেনারেশন অ
গ্রেট মেন আন্‌টিল দেয়ার হ্যাজ বিন এ জেনারেশন অফ ফ্রি উইমেন—অফ
মাদারস।'

এই সব চিঠি কোনো কাজে লাগেনি। যার জন্যে এই সব আয়োজন সে তো আগে
বিবাহ করেছে ডায়ানা রবার্টসনকে। ভি-পি ডাকে ইণ্ডিয়ানরা বিয়ে করে এমন এক
রসিকতা ক্যামপাসে ছড়ানো আছে। যারা ভারতবর্ষকে জানে এ-বিষয়ে তা
হাসাহাসির অন্ত নেই।

এবারে ঘটকও লাগিয়েছিলেন শকুন্তলা দেবী। চুপি-চুপি বিবাহ বন্ধনের বিখ্যা
প্রতিষ্ঠানদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন শকুন্তলা দেবী। একটু জোর কম তাঁর, বি
আকর্ষণ কম নয়। হ্যাঁ, ডাইভোর্সি—কিন্তু নিরপরাধ পাত্র। কাগজপত্তর রয়েছে,
কেউ দেখতে পারে। নির্ঝঞ্ঝাট ডাইভোর্সি—ঐ শব্দটার অর্থ যে ছেলেপুলে নেই
এদেশের সবাই জানে। নিঃসন্তান কথাটা হয়তো আরও যোগ্য, কিন্তু কেউ ব্যবহ
করে না। বোধহয় বুঝিয়ে দিতে চায়, পরবর্তী বিবাহে সন্তানসম্ভাবনা সুদূরপরা
নয়। তা ছাড়া শকুন্তলা দেবীর ছেলের পরীক্ষা পাসের রেকর্ড যে কেউ দেখবে, অব
হয়ে যাবে। আর চাকরি—সে তো কিছু না বলাই ভাল।

তবু ঘটকরা লাইন লাগাননি শকুন্তলার বাড়িতে। ফোনে বলেছে, "সুদর্শ
সুনয়না, সুশিক্ষিতা মেয়ে তো রয়েছে ডজনে-ডজনে। কিন্তু ওই যে খুঁত। খুঁত কে
চায় না।"

"অতি সামান্য খুঁত" বলতে গিয়েছেন শকুন্তলা দেবী—"তাও মেমসায়েবের সঙ্গে
কিন্তু ঘটকরাও কম যায় না। বলেছে, "মস্ত দুধের পাত্রে একফোঁটা চোনাই যথে
মিসেস মুখার্জি।"

রাতারাতি কীভাবে পরিস্থিতি পাল্টে যায়। দুঃখ করেছেন শকুন্তলা দেবী। কোথ
লোকে তাঁর পিছনে ছুটবে তা নয়, তাঁকেই লোকের পিছনে ছুটতে হচ্ছে। তবু তে
আগ্রহ দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। কে যেন বিবাহবিচ্ছেদের ইঙ্গিত দিয়ে বলে
"কাঁচের বাসন একবার ভাঙলে আর জোড়ে না।"

একদম বাজে কথা—ফেভিকল সব কিছু জুড়ে দেয়—শুধু ভাঙা বাসনের সব ক'টা অংশ হাতের গোড়ায় থাকা চাই। তা তো রয়েছে তাঁর ছেলের মধ্যে—অভিজিৎ তো গোটাই রয়েছে। বরং মিষ্টি হয়েছে সে। কিন্তু এ সব তো তর্কের কথা—পছন্দর বাজারে তর্কে কোনো লাভ হয় না।

খুড়তুতো বোন অসীমা একসময়ে দাদার সঙ্গে দেখা করে গেল। অসীমার বিয়ে হয়েছে কোতরঙ্গে। বর ব্যাংকে কাজ করে।

অসীমা এসেছে বাপের বাড়িতে ছুটি কাটাতে। ওদের এখানে আলাদা হাঁড়ি, কিন্তু একই বাড়ি। সোমেশ্বরবাবু ভাইয়ের সঙ্গে স্বেচ্ছায় পার্টিশন করে নিয়েছেন। কিন্তু সম্পর্ক ভাল। অসীমার ভাই নেই। তাই এই দাদার ওপর একটু টানও আছে।

অসীমা দেখলো দাদা চুপচাপ বসে কী যেন ভাবছে। তাকিয়ে আছে জানালা দিয়ে। দৃষ্টি অনেক দূরে চলে গেছে, কিন্তু উপায় নেই। একটু দূরেই একটা তিনতলা বাড়ি উঠে আকাশ আড়াল করে দিয়েছে।

দাদা কি হারিয়ে-যাওয়া বউয়ের কথা ভাবছে? না, আরও আগের সেই চিন্তাহীন জীবনের কথা যখন এই বাড়িতে থেকে রোজ কলকাতার সায়েন্স কলেজে পড়তে যেতো।

অসীমার মনে আছে দাদা তখন এ-পাড়ার হিরো। সোমেশ্বর মুখার্জির একমাত্র ছেলে। সোমেশ্বর মুখার্জি বার্ন কোম্পানিতে ভাল কাজ করেছেন। অফিসার হয়েছেন সায়েবী আমলে। একটা অস্টিন গাড়ি আছে গ্যারাজে। মাঝে-মাঝে দাদাই চালাতো। দাদা বাঙালী মতে ভীষণ সুন্দর। হাইট পৌনে ছ'ফুট—ঝকঝকে, ছিপছিপে চেহারা। দাদার মুখে বুদ্ধির দীপ্তি—চওড়া কপাল, কিন্তু ঘন চুল যেন কপালের অনেকটা জবরদখল করে বসেছে। খুঁত বলতে শুধু চোখের চশমা। কিন্তু দৃষ্টির ক্ষীণতাও যেন চশমার মাধ্যমে সৌন্দর্যবৃদ্ধি করেছে দাদার।

এই দাদার দিকে অসীমার বান্ধবীদের নজর ছিল। তখন বাড়ি পার্টিশন হয়নি। বান্ধবীরা এলে একবার দাদার পড়ার ঘরেও নজর দিয়ে যেতো। দাদা অবশ্য পড়াশোনায় ডুবে থাকতো।

দাদার নাম তখন এ পাড়ায় সবাই জানতো। জানবে না? সেই দেবী খাঁয়ের পর কে আর তেমন হাওড়া থেকে স্কুল ফাইনালে ভাল ফল করেছে? অভিজিৎ পঞ্চম হয়েছিল স্কুল ফাইনালে। হায়ার সেকেন্ডারিতেও কৃতিত্ব ছিল অভিজিতের, যদিও স্থানটা নবমে পৌঁছেছিল। অসীমার বান্ধবী প্রণতি বলেছিল, নবমটাও জাঁদরেল স্থান, না-হলে নবরত্ন এতো বিখ্যাত হবে কেন? নয়ের নিশ্চয় কোনো দাপট আছে।

এই প্রণতিও থাকতো রাজবল্লভ সাহা লেনে। বাপ উকিল ছিলেন। তেমন প্র্যাকটিশ ছিল না, কিন্তু কম ভাড়ায় অনেকদিন আছেন। শকুন্তলা বলতেন, আইনের মাথা খুব ভাল প্রণতির বাবার, কিন্তু অনেক উকিলের জিভ মোটা থাকে। তারা আদালতে তেমন বলতে-কইতে পারে না।

শকুন্তলার জানবারই কথা, কারণ তাঁর বাবা এই হাওড়া কোর্টেরই ডাকসাইটে উকিল ছিলেন। "আমার বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্যে মক্কেলরা ভোর সাড়ে ছ'টা থেকে বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি করতো এবং চায়ের দোকানে ভাঁড়ে চা খেতো।"

প্রণতি মেয়েটি ছিল শান্ত। বাবার জিভ মোটা হলে কী হয়, প্রণতি সুন্দর আবৃত্তি করতো। নজরুল, রবীন্দ্রনাথের কত কবিতা যে ওর মুখস্থ ছিল! ইস্কুলে প্রাইজও পেয়েছে প্রণতি। প্রণতি খুব ফর্সা নয়, আবার কালোও নয়। ত্বকের অসামান্য শ্রী আমাদের হাওড়ায় তেমন ঘোষিত হয় না। তার কারণ ত্বকের পরিচর্যার যেসব পদ্ধতি দক্ষিণ কলকাতার মেয়েরা বিউটি পার্লারে গিয়ে নিয়মিত ব্যবহার করে তা হাওড়ার মেয়েদের সাধ্যের অতীত। ঘষা-মাজার অভাবে একটু পিছিয়ে থাকা আর কি! কিন্তু লাবণ্য তো শুধু প্রসাধনী কোম্পানির বোতল থেকে আসে না, আসে জন্মগত বৈশিষ্ট্য থেকে।

প্রণতির মা বলতেন, আমার মেয়ের জেল্লা খুলবে কী করে? হেঁটে-হেঁটে কত দূরে ইস্কুলে যেতো; তারপর এখন কত দূরের কলেজ। গোখেল কি এখানে! কেন যে ওখানে হায়ার সেকেন্ডারি পড়তে গেল! রোদে বৃষ্টিতে হাওড়ার বাসের জন্যে কতক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। রঙ যে একেবারে কালো ভূত হয়ে যায়নি এটাই আশ্চর্য কথা!

শকুন্তলার মা বলতেন, একটা শুধু ভাল কথা। বিয়ের পরে মেয়েদের আসল রঙ আবার ফিরে আসে।

"কিন্তু সে তো বিয়ের পরে দিদি", প্রণতির মা বলেছেন। "বিয়ের আগের রঙ দেখেই তো বিয়ে ঠিক হবে!"

শকুন্তলা বলেছেন, "ছেলের মায়েরা আজকাল অতো বোকা নয়। তারা রঙ দেখে দেখে ভিরমি খায় না। তারা খোঁজে শ্রী। তারা খোঁজে লক্ষ্মীশ্রী। তারা খোঁজে গড়ন-পিঠন, তারা খোঁজে স্বভাব। এদেশে তো মেমসায়েব তৈরি হবে না। আর ফ্যাটফেটে মেমসায়েবরাই যে সুন্দর নয় তা হীরু ডাক্তারের বউকে দেখেই বুঝবে। লাল চুল, সাদা রঙ। স্বাস্থ্য ভাল। কিন্তু কেমন যেন মুখটা—একটুও শ্রী নেই। কী দেখে যে হীরু ডাক্তার বিয়ে করলো! অমন ভাল ছেলে, ঘর আলো-করা বাঙালী বউ আনতে পারতো।"

প্রণতির মা বলেছিলেন, "শুনেছি ওরা তুক করে—একবার কারও দিকে এইসব

মেয়ের নজর পড়লে আর উপায় নেই। ওষুধের গুণে বনের সিংহ পর্যন্ত বশ হয়ে যাবে।"

তখন হাসাহাসি হয়েছিল। কিছুটা অনুসন্ধানও। ওষুধটা কী? কেউ বললো, গাছের শিকড় চুলে বেঁধে রেখে দেয়। কেউ বললো, শিকড় নয়, চোখের সুরমা। কেউ বললো, সুগন্ধ। একটা বোতল থেকে নিজের শরীরে ফ্যাঁশ-ফ্যাঁশ করে ছড়িয়ে দেয় প্রিয় লোকটির কাছে যাবার আগে, তারপর ওষুধ ধরে যায়—ওই গন্ধর জন্য মন আকুল হয়ে ওঠে। বিয়ের পরেও ওই ওষুধ ছড়িয়ে যায় মেমরা।

এই প্রণতির গান শুনেছে দাদা নিজের বাড়িতে বসেই। অসীমার ঘরে বসে হারমোনিয়াম নিয়ে গান গাইছে প্রণতি। দাদা কখন পড়া ছেড়ে উঠে এসেছে। দাদাকে আবিষ্কার করে অন্য মানে করলো প্রণতি।

গান আচমকা বন্ধ হয়ে গেল। দাদা ততক্ষণে ফিরে এসেছে নিজের ঘরে। একটু পরে অসীমা ভয়ে-ভয়ে ঢুকেছে দাদার ঘরে। "তোমার পড়ার অসুবিধে হচ্ছিল? প্রণতি আমার কথাতেই গান শোনাচ্ছিল। আমাদের খেয়াল ছিল না, তোমার পরীক্ষা সামনে।"

দাদা বলেছিল, "সেকি! রাগ করবো কেন? গানে কখনও পড়া খারাপ হয়?" দাদা এরপর প্রণতির গানের প্রশংসা করেছে। "কে মেয়েটা? বেশ ভাল গায়। কোথায় শিখলো?" অসীমা জানিয়ে দিয়েছে, "ভবশঙ্করবাবুর মেয়ে। গান শেখে গণেশ দাসের কাছে। ওদের গ্রুপেও গাইতে যায়।"

তারপর কত কি হয়ে গেল, অভিজিতের কি সেসব মনে আছে? গানটা অভিজিৎ পছন্দ করতো। পড়ার সময়ে রেডিও অথবা টেপ রেকর্ডার চালিয়ে দেবার অভ্যাস হলো। গান না থাকলে মনঃসংযোগ হয় না অভিজিতের।

অনেকের খোঁজখবর নিচ্ছে অভিজিৎ। তার ফেলে আসা জগতের কে এখন কোথায়? কী করছে তারা?

এইসব খবর সাপ্লাই করছে অসীমা ও শকুন্তলা। ভবতারণ নাপিত লটারি পেয়েছে লাখ টাকার। তাছাড়া প্রায় সবই খারাপ খবর। কারও তেমন ভাল হয়নি। তবু অভিজিৎ অবাক হয়ে যায়। কোথাও কোনো তিক্ততা নেই। কারও বিরুদ্ধে কারও কোনো অভিযোগ নেই। এই জন্যেই বোধহয় মানুষকে অমৃতের সন্তান বলা হয়েছে, অভিজিতের মনে হলো।

এরপর অন্য কাজে বেরিয়ে পড়েছে অভিজিৎ। সুপ্রভা রায় বিদেশেই কাজটা এগিয়ে দিয়েছে। সেখান থেকেই 'পাত্রী চাই' কলমে বিজ্ঞাপন পাঠিয়েছিল সুপ্রভা। এই বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে খুবই বিশ্বাস তার। এইখানেই ডঃ নীতিশ রায়ের একটা বিজ্ঞাপন থেকে সুপ্রভার অন্ধকার জীবনে আলো এসেছে।

বক্স নম্বরে বিজ্ঞাপন দেয়নি সুপ্রভা। অভিজিতের জন্যে বিজ্ঞপনে নিজের ও নীতিশের নাম ঠিকানা ব্যবহার করেছে। এতে ফল ভাল হয়। লোকে ভরসা পায়। বক্স নম্বরকে এখনও সবাই পুরো বিশ্বাস করে উঠতে পারে না।

বিজ্ঞাপনটা সুপ্রভা লিখেছিল ভাল করে। এই ধরনের বিজ্ঞাপন রচনা করতে দেখেছে তার মাকে সুপ্রভার জন্য। শেষে ইঙ্গিত ছিল 'পাত্রীও লিখিতে পারেন নির্ভয়ে'। এই নির্ভয়ে কথাটাও যে প্রয়োজনীয় তাও জানে সুপ্রভা। মাত্র একটি ক্ষেত্রে সুপ্রভা নিজেই উত্তর দিয়েছিল। সেইখানেই ফললাভ। ডঃ নীতিশ রায় পরে স্বীকার করেছেন, সুপ্রভার নিজের হাতে লেখা চমৎকার চিঠিটাই মনস্থির করতে সাহায্য করেছিল। ওর মধ্যে কী এক বিশেষ সুরের সন্ধান পেয়েছিলেন নীতিশ রায়।

এবারেও চারটি চিঠি নির্বাচন করে পাঠিয়ে দিয়েছে সুপ্রভা। কাজ পাকা। কারণ প্রত্যেককে স্বহস্তে উত্তর দিয়েছে সুপ্রভা। পাঠিয়েছে পাত্রের পূর্ণ বিবরণ। নিজেকে পাত্রের স্থানীয় বউদি বলে পরিচয় দিয়েছে। আর সেই সঙ্গে জানিয়েছে পাত্র অমুক দিনে কলকাতায় থাকবেন। এবং সেই সময় দেখাসাক্ষাৎ হবে।

চারটে চিঠির তিনটি লিখেছে পাত্রীরা স্বয়ং। এবং একটি পাত্রীর ছোটবোন। এঁদের দূত মারফৎ খবর পাঠানো হলো।

এবার আর বাড়ি গিয়ে আসরে বসে দেখা নয়। পার্ক স্ট্রীটের কোয়ালিটিই এ ব্যাপারে আদর্শ স্থল। পাত্রীর পক্ষে চেনা শক্ত হওয়ার কথা নয়। পাত্রের হাতে রবীন্দ্র রচনাবলীর একটা খণ্ড থাকবে।

রবীন্দ্র রচনাবলী হাতেই দাঁড়িয়ে ছিল অভিজিৎ, কোয়ালিটির দরজার কাছে। প্রথমে ভেবেছিল খবরের কাগজ হাতে রাখবে—কিন্তু যা আজকাল কাগজের সার্কুলেশন। হয়তো দশটা লোককে দেখা যাবে কাগজ হাতে চলেছে। রবীন্দ্র রচনাবলীটা কলেজের একটা গল্পে নিজেই লিখেছিল অভিজিৎ। তখন ছোটগল্প লিখবার সখ ছিল। কতদিন আগেকার সব কথা।

দুই মহিলাকে দেখা যাচ্ছে বটে। চারদিকে সাবধানে তাকাচ্ছে ওরা। কোয়ালিটির সামনে আলো কিছুটা কম। কার হাতে কি বই আছে তা খুঁজে বার করা অসম্ভব হতো।

রবীন্দ্র রচনাবলীটা আরও একটু খেলিয়ে ধরলো অভিজিৎ। ওরা এগিয়ে এলো। "আমিই অভিজিৎ মুখার্জি।"

ওরা একটু ভয়ে-ভয়ে রয়েছে। ওদের দু'জনকে নিয়ে একটা টেবিলে গিয়ে বসলো অভিজিৎ। একটি মেয়ে সপ্রতিভ। সে বললো, "এর নাম মাধুরী মজুমদার। আমি পাত্রীর ননদ—নন্দিতা সান্যাল।"

চা ও কিছু খাবার অর্ডার দিয়েছে অভিজিৎ। মাধুরী মজুমদারকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

দেখে নিয়েছে অভিজিৎ। নন্দিতা সান্যাল বলে চলেছে—"মাধুরী বি-এ পর্যন্ত পড়েছে। পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। তার আগেই দাদার সঙ্গে বিয়ে। পরীক্ষা দিলে নিশ্চয় পাস করতো।"

মাধুরী মেয়েটির টিপিক্যাল বাঙালী চেহারা। শরীরটা একটু ভারীর দিকে—স্তনভারে যেন সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে। রঙ চাপা—কিন্তু এখানে আসবার সময় যেন প্রচুর চুনকাম করা হয়েছে। পাউডার, ক্রিম একটু বেশীই প্রয়োগ হয়ে গিয়েছে।

নন্দিতা বলছে, "হাইট ১৬৫ সেমি। ওজন ৬২ কিলোগ্রাম। ওর মাথার চুল অনেক। গান জানে, সেলাই জানে, রান্না জানে। সংসার সুখের করতে হলে যা-যা প্রয়োজন তা সবই জানে। বুঝতেই পারছেন, এসব গুণ না থাকলে আমরা নির্বাচন করতাম না।"

"কাগজপত্তর", প্রসঙ্গটা তুলতেই হলো অভিজিৎকে। প্রসঙ্গটা তুলবার জন্যে নিজের কথাই বলতে লাগলো অভিজিৎ। "আমার ডাইভোর্স পেপারের জেরক্স রয়েছে। দরকার হলে নিয়ে যেতে পারেন। আমার বিয়ে হয়েছিল একজন মার্কিনী মহিলার সঙ্গে। তিনি ডাইভোর্স চাইলেন।"

নন্দিতা বললো, "আমি গল্পে পড়েছি, বউ ডাইভোর্স চাইলে দিতেই হয়।"

মাধুরী বলছে, "বাঃ রে! ছেলের হাতের মোয়া নাকি?"

অভিজিৎ বললো, "ডাইভোর্স লড়া যায়, কিন্তু ভীষণ খরচ। আমেরিকায় উকিলরা মিনিট হিসেবে চার্জ করে। অত টাকা নষ্ট করা আমার পক্ষে...."

"কী করে সম্ভব হবে!" নন্দিতা বুঝে ফেলেছে অভিজিৎকে। "ডলার তো আর খোলামকুচি নয়।"

এ পক্ষের কাগজপত্রের। নন্দিতা বললো, "আমাদের তো কোর্টের ব্যাপার ছিল না, স্রেফ একখানা কাগজ। দাদার ডেথ সার্টিফিকেটখানা আমরাও জেরক্স করিয়ে এনেছি। রাখতে পারেন। দাদা মারা গেলেন—ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে। বিয়ের পরেই অফিসে যেতে গিয়ে। দাদা ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতেন হাওড়া টু ব্যাণ্ডেল। ওখানেই মস্ত এক রবার কারখানায় কাজ করতেন। ভাল চাকরি ছিল দাদার।"

পিওর, সিম্পল, দুর্ঘটনা। ভবিতব্যকে কে আটকাবে? ননদের বক্তব্য।

চায়ের প্রথম পর্ব শেষ হতে চলেছে। অভিজিৎ বলছে আমেরিকার গল্প। মেমসায়েবরা রূপে গুণে সব সময় এদেশ থেকে সেরা নয়। ওদেশে সুখ আছে, কিন্তু শ্রমও আছে যথেষ্ট। শ্রম ছাড়া সুখে থাকা যায় না ওদেশে। স্রেফ কথার কথা। কিছু একটা কথা তো বলতে হবে। মাধুরী মজুমদার এখনও তেমন সপ্রতিভ হয়ে ওঠেনি।

এবার ননদিনী এক ছুতোয় উঠে পড়লো। "আমি আসছি। আপনারা কথা বলুন।" ওয়াশ রুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মাধুরী মজুমদারের ননদিনী।

এবার অভিজিতের দিকে ভালভাবে তাকাচ্ছে মাধুরী। খুঁটিয়ে দেখছে মানুষটাকে। এইভাবে দেখা উচিত, যত ইচ্ছে দেখা উচিত কাউকে বিয়ে করার আগে। কিন্তু এখানে কেউ দেখে না। ফলে বিপদ হয়। আগেও বিপদ হতো, কিন্তু মানুষ মেনে নিতো। এখন কেউ মেনে নিতে চায় না।

মাধুরীকে জিজ্ঞেস করবে ভাবলো, আমাকে আপনার পছন্দ ? কিন্তু পারলো না অভিজিৎ। এদেশের মেয়েদের সব প্রশ্ন করা যায় না যা ওদেশে করা যায়। এদেশের মেয়েদের সম্বন্ধে নতুন এক সম্ভ্রমবোধ জেগে উঠেছে তার বুকে।

প্রশ্নটা মাধুরীই করলো, "খরচ বাঁচাবার জন্যে আপনি ওই মেয়েটিকে বাঁচালেন না।"

"না, ঠিক তা নয়," অস্বস্তি বোধ করছে অভিজিৎ। "মামলা জিতেও কিছু হতো না। ডায়ানা আমার কাছে থাকতো না।"

"দোষটা কার ?" মাধুরী জানতে চাইছে।

"ডায়ানা আর একজন পুরুষকে পছন্দ করে বসে আছে, আমি আপনার কাছে চেপে রাখবো না, যদিও কোর্টের কাগজপত্তরে ওসবের উল্লেখ নেই। ওদেশে বছরে এগারো-বারো লাখ ডাইভোর্স হচ্ছে, কিন্তু কোথাও আর একটা প্রেমের উল্লেখ পাবেন না।" একটু থামলো অভিজিৎ। "দোষটা পুরোপুরি ওকেই দেবো কেন ? নিশ্চয় আমার কাছ থেকে কিছু একটা পায়নি, কোথাও একটা দোষ অথবা ভুল হয়ে গিয়েছে দু'পক্ষই তো বেঁচে রয়েছে। ব্যাপারটা আপনার হাতের ওই ডেথ সার্টিফিকেটের মতন সোজা নয়।"

এবার মাধুরী নড়েচড়ে বসলো। সে সোজাসুজি জানিয়ে দিলো, "ডেথ সার্টিফিকেটও সব বলে না। প্রণব মজুমদার দুর্ঘটনায় নিহত হয়নি। ওটা আত্মহত্যা—ফুলশয্যার তৃতীয় দিনে। লোককে বুঝতে দেওয়া হয়নি—প্রণব মজুমদার কোনো সুইসাইড নোট রেখে যায়নি। কিন্তু আমি জানতাম সে ভীষণ অসুখী।"

হাঁপাচ্ছে মাধুরী। "আপনি খোলাখুলি বললেন, আমিও খোলাখুলি বললাম এখন আমার শাশুড়ী ও ননদ আমার বিয়ে দিতে চাইছেন। আমি চাইছি না। ওঁরা জোর করছেন। আমাকে ভালবাসেন বলে নয়। আমার ঘরটা ওঁদের দরকার বলে ঘরের খুব অভাব, বুঝতে পারছেন। ছেলে যখন নেই তখন ঘরটা শুধু-শুধু কেন আটকে থাকে ?"

অভিজিৎ হঠাৎ আবিষ্কার করলো, মাধুরী চা ছাড়া কিছুই খায়নি। সে জিজ্ঞেস করলো, "কী হলো, খেলেন না ?"

মাধুরী বললো, "ওতে চিকেন আছে ; ফুলশয্যার পরের দিন থেকে আমি তো মাছ মাংস খাই না।"

মাধুরী কী ভেবে বললো, "আমার উচিত ছিল আমার স্বামীকে ডাইভোর্স করা। দুঃখের বিষয়, মরা মানুষকে ডাইভোর্স করা যায় না।"

দূর থেকে ননদিনীকে দেখা যাচ্ছে। টয়লেট থেকে বেরিয়ে খুব আস্তে-আস্তে সে এই দিকেই এগিয়ে আসছে।

মাধুরী চাপা গলায় বললো, "আপনি বলে দেবেন, আমাকে আপনার পছন্দ হয়নি। ফুলশয্যার রাতে আমাকে আমার স্বামীর কেন পছন্দ হলো না তা না-জেনে আমি আর কিছুতেই বিয়ে করবো না—ওদের যতই ঘরের দরকার থাকুক।"

ঘড়িতে এখন তিনটে। কোয়ালিটি রেস্তোরাঁর দরজার সামনে আবার ফিরে এসেছে অভিজিৎ মুখার্জি। হাতে এবারেও সেই রবীন্দ্র রচনাবলী।

এই মুহূর্তে যার জন্যে অভিজিৎ অপেক্ষা করছে তার নাম মালিনী চ্যাটার্জি। বাইরে অসময়ে বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

তিনটে বেজে পাঁচ মিনিটের সময় পার্ক প্লাজার দিক থেকে দুই তরুণী জলে ভিজতে-ভিজতে কোয়ালিটির দরজার কাছে হাজির হলো। একজন ভিজেছে তার কারণ পলিয়েস্টারের শাড়ি, ওতে জল ধরে না, পিছলে পড়ে যায়। আর একজন কটন প্রিন্ট পরেছে। সেই ভিজেছে বেশী—শরীরের প্রোফাইলটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যেমন একসময়ে দেখা যেতো হেমেন মজুমদার অথবা মিস্টার টমাসের সিক্তবসনা সুন্দরীদের ছবিতে।

সে যুগে গুরুস্তনীদের জন্যে ছিল সকল রসিকের জয়ধ্বনি, এখন যুগ পাল্টেছে। পশ্চিমীরা পুরুষের আকর্ষণ কেন্দ্রকে উর্ধ্বাঙ্গ থেকে সরিয়ে রমণীনিতম্বে ফোকাস করেছে। এদেশেও সে খবর পৌঁছে গিয়েছে, সন্দেহ করছে অভিজিৎ। রমণী-শরীর সম্বন্ধে হাহাকার এখনও বুকের মধ্যে রয়ে গিয়েছে, অভিজিৎ অস্বীকার করবে না। প্রাক্ বিবাহ পর্বে বিদেশে নারী-শরীরের স্থাপত্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ করেছে আলেখ্য দর্শনে এবং যৎসামান্য ডেটিং-এ।

মালিনী তার ননদিনীকে নিয়ে আসেনি। সে একা আসতে পারতো সহজেই। কিন্তু বাঙালী মেয়েদের পুরুষভয় কাটতে চায় না। সে সঙ্গে এনেছে বান্ধবী কুমুদিনী বিশ্বনাথনকে। কুমুদিনী বাঙালী, বিয়ে করেছে দক্ষিণীকে। মালিনী ও কুমুদিনী দু'জনেই এক অফিসে কাজ করে। সে অফিস এখান থেকে খুব বেশী দূরে নয়।

কুমুদিনী অনেক ফ্র্যাংক। টেবিলে বসেই বললো. "বয়সের তুলনায় আপনি অনেক ইয়ং, মিস্টার মুখার্জি। আপনি বয়সে ভেজাল দেননি।"

মানে ? একটু অবাক হচ্ছে অভিজিৎ।

"এখানে সব জিনিসের সঙ্গে বয়সেও ভেজাল। আমার স্বামীর অনেক আত্মীয়ের বয়স শুরু হয় মাইনাস এইট থেকে। আমাদের অফিসেও ভাইস-প্রেসিডেন্টদের দেখুন।

কে বলবে এদের এখনও ফিফটি-ফাইভ হতে দেরি আছে? আমি মালিনীকে বলেছিলাম, মেক আপ ইওর মাইন্ড। হয়তো গিয়ে দেখবে একজন এলডারলি ভদ্রলোক। তখন ভাল লাগবে কিনা।"

"আমি উইডোয়ার নই, ডাইভোর্সি।" পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বয়সটা পুরুষদের পক্ষে বিপজ্জনক—ঐ সময় স্ত্রী বিয়োগ হলে ত্রিশঙ্কু অবস্থা—ন যযৌ ন তস্থৌ।

কুমুদিনীর সেই অবস্থা। স্বামী বিশ্বনাথনের বয়স আটচল্লিশ। কিন্তু কুমুদিনীর কোনো দুঃখ নেই। "আমাকে কে বিয়ে করতো বলুন তো? আমার অ্যাজমা আছে। আমার স্বামী চার্টার্ড এবং কস্ট দুই-ই। একটা ডিভিশনের ডেপুটি জি এম। এখন আমি জানি ওই আটচল্লিশটাও ঠিক নয়, ভালভাবে অডিট করলে ওটা ফিফটি ওয়ান হবে। কিন্তু আমার তাতে কিছু এসে যায় না। আমার স্বামীকে বলে দিয়েছি, আমরা বাঙালীরা সেই ছোটবেলা থেকে বলে আসছি গাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন।"

মালিনীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো কুমুদিনী বিশ্বনাথন। বললো, "অসাধারণ মনোবলের মেয়ে। নিজের স্বামীর সঙ্গে দুর্ভাগ্যের পর আলাদা হয়ে কেঁদে সময় নষ্ট না-করে নিজেই চটপট টাইপ শিখে নিয়েছে। শুধু ম্যানুয়াল নয়, ইলেকট্রনিক মেশিনেও কাজ শিখে নিয়েছে। এবার ওয়ার্ড প্রসেসরও শিখে নেবে। আমাদের অফিসে এখন লিভ ভেকান্সিতে আছে। কিন্তু মেয়েরা প্রায়ই ছুটিতে যায়, সুতরাং কাজের অসুবিধে নেই।"

মালিনী একটা হাল্কা নমস্কার করে চুপচাপ বসে আছে। ভিজে শরীরটা এখনও সামলে উঠতে পারেনি।

অভিজিৎ বললো, "আমার প্রায় সব খবরই চিঠিতে পেয়েছেন। আমি এখন মিড্ ওয়েস্টে কাজ করছি। আসবার আগে আমার পদোন্নতি হয়েছে। আমি এখন ড্র করছি দশ হাজার ডলার।"

"সেটা ইন্ডিয়ান রুপিতে কত, মিস্টার মজুমদার?" বিশ্বনাথন জানতে চাইছেন।

"এবাউট এক লাখ পঁচাত্তর হাজারের মতন।"

"বছরে তো?"

"না, না, মাসে। বছরে ও-মাইনেতে আপনি জ্যানিটরও পাবেন না।"

"কী বলছেন, মিস্টার মুখার্জি! আমার অফিসের বস তো সাড়ে-সাত হাজার টাকা ড্র করেন মাসে।"

ওইভাবে কেউ সারাক্ষণ ডলারকে গড়ে-সতেরো বা আঠারো দিয়ে গুণ করে না। করে কোনো লাভ নেই। শিকাগোতে পাঁচ হাজার ডলার ভাড়া দিয়েও একটা ভাল অ্যাপার্টমেন্ট-ভাড়া নাও পেতে পারেন।

"বড় গাড়ি?"

"ওটা এখানকার রবারের স্লিপারের মতন—গাড়িটা কোনো ব্যাপারই নয়। ভিখিরি থেকে আরম্ভ করে পকেটমার পর্যন্ত গাড়ি ব্যবহার করতে অভ্যস্ত।"

ডাইভোর্সের কাগজপত্তর বার করলো অভিজিৎ। "সব খবরাখবর পাবেন এখানে। যবে আমাদের মনোমালিন্য হলো, সেদিন আমার স্থাবর অস্থাবর কী ছিল, কবে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে এলাম।"

"আপনাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলো?" ওদের কণ্ঠে বিস্ময়।

"ইয়েস। ব্যাপারটা চেপে রেখে আপনাদের বিভ্রান্ত করবো না। তারপর ডাইভোর্স হয়েছে। আমরা ইন্ডিয়ানায় যেতে অন্য স্টেটে চলে গিয়েছিলাম। ওখানে ডাইভোর্সের খরচ কম। সময়ও কম লাগে। আমার বউকে নিয়ে যাবার খরচাও আমাকে দিতে হয়েছিল। সে আবার একা যায়নি। তার নতুন বন্ধুকে নিয়ে গিয়েছিল আমার খরচে। হোটেলে আমার পাশের ঘরে ডাইভোর্সের আগেই ডবল বেড শেয়ার করেছিল।"

"সে কি! আপনি আপত্তি করেননি?"

"আপত্তি করলেই খরচ। দু'জনকে দুটো আলাদা ঘর বুক করে দিতে হতো আমার টাকায়। তারপর রাত্রে কে কোথায় চলে আসতো তা তো আমার ওপর নির্ভর করে না ওদেশে।"

"একটি ডাইনীকে বিয়ে করেছিলেন তা হলে আপনি," মিসেস বিশ্বনাথন বলছে।

চুপ করে রইলো অভিজিৎ। "সেটা বলা বোধহয় ঠিক হবে না। এমনিই তো হয়ে থাকে ওদেশে। কেউ তো এই কারণে কাউকে ডাইনী বলে না।"

"আপনার টাকা দেখেই তা হলে বিয়ে করেছিল ওই মেমসায়েব।"

তাও তো বলতে পারছে না অভিজিৎ। "আমরা যখন প্রথম মিট করেছিলাম, তখন আমার ভাল চাকরি ছিল না, মিসেস বিশ্বনাথন। আমি তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমার প্রথম চাকরির খবরটা ডায়ানাই এনেছিল।"

"তা হলে?"

"ওই ওদের স্বভাব। যখন ভালবাসে ভীষণ ভালবাসে। যখন ভালবাসা শুকিয়ে যায় তখন ওরা নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে।"

"তা হলে?"

মামলার কাগজগুলো মালিনী হাতে নিলো, কিন্তু দেখলো না।

মালিনীর কাগজ?

"আমাদের দিক থেকে কোনো কাগজই নেই, মিস্টার মুখার্জি। আমরা বলছি, মালিনী ডাইভোর্সি, স্বামীর সঙ্গে সহবাস করেছে, কপালে সিঁদুর পরেছে। কিন্তু উকিল বলছে না।"

মালিনী তখনও ভিজে কাপড়ে পাথর হয়ে বসে আছে। মাথা নিচু হয়ে রয়ে
যা জানা গেল, ব্যাপারটা এই রকম।

মালিনীর বিয়ে হয়েছিল সম্বন্ধ করেই যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে। সম্বন্ধটাও ঘটকের মাধ্য
হয়েছিল। কিন্তু দোষটা তারও নয়। সে ব্যাপারটা জানবে কী করে? যদি এক
খবর চেপে রাখে তা হলে ঘটক কী করবে?

বিয়ে হলো। বউ শ্বশুরবাড়ি গেল। ফুলশয্যা হলো। আরও এক সপ্তাহ সহ
হলো। তারপর দীঘায় হনিমুনে যাবার জন্যে বেরিয়েছে। সমুদ্রতীরে দু'জনে
আছে। সেই সময়ে হৈ-চৈ করে ওরা এলো। কলকাতা থেকে ওদের মেয়ে নিয়ে তা
দীঘার একই হোটেলে উঠেছে। তারপর সে এক কাণ্ড। জানা গেল যজ্ঞেশ্বর আ
বিয়ে করেছিল, লুকিয়ে। মেয়ের নাম ফুল্লরা।

ওরা জোর করে যজ্ঞেশ্বরকে ধরে নিয়ে গিয়ে ফুল্লরার ঘরে ঢুকিয়ে দিলে
মালিনী একলা পড়ে রইলো একই হোটেলে হনিমুন সুইটে। বাধা দিলে
হতো যজ্ঞেশ্বর।

পরের দিন বাসে একলা কাঁদতে-কাঁদতে কলকাতায় ফিরে এসেছে মালি
খোঁজখবর হয়েছে। ফুল্লরার সঙ্গে বিয়েটা মিথ্যে নয়—রেজিস্ট্রি অফিসের সার্টিফি
রয়েছে।

ডাইভোর্সের কথা উঠেছিল। কিন্তু আলিপুরের উকিল হরিনারায়ণবাবু মতা
দিলেন, কোনো হাঙ্গামায় যাবার দরকার নেই। বিয়ে হলে তবে তো ডাইভোর্স।
আইনে একটার বেশী দুটো বিয়ে হয় না। একটা বিয়ে থাকতে আর একটা
সম্ভব নয়।

মিসেস কুমুদিনী বিশ্বনাথন বললেন, "দরকার হলে যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে ফুল্লরার বি
সার্টিফায়েড কপি দিয়ে দেবে মালিনী। আসলে যে ভাগ্যবানটি মালিনীকে বিয়ে ক
সে ডাইভোর্স বিয়ে করছে না, আইনতঃ একজন কুমারীকে বিয়ে করছে।"

কুমুদিনী বিশ্বনাথন এবার উঠে পড়লো। সেও মেয়েদের পাউডার রুমে য
কিছুক্ষণের জন্যে।

মালিনী এবং অভিজিৎ এবার মুখোমুখি হলো। "বিয়েতে ঠকেছি বলার থেকে
হয়ে ভেঙে গিয়েছে বলা ভাল", মালিনী শান্তভাবে নিজের অবস্থা ব্যাখ্যা কর
"আমার দাদা বিয়ের আগে খোঁজখবর করলো না। ঘটকের কথা ধ্রুবজ্ঞান করলে

মালিনী জানতে চাইছে অভিজিতের খবর। "আপনি তো পুরুষ মানুষ। বি
আগে খোঁজখবর করেননি?"

চুপ করে আছে অভিজিৎ। বিয়ের আগে সে অনেক মেলামিশি করেছে ডা
সঙ্গে। "ওকে আপনি কতটুকু জানতেন?" মালিনী জানতে চাইছে।

অভিজিৎ মিথ্যাচার করবে না। অভিজিৎ বলেই ফেললো, "আমাদের কিছু

াকি ছিল না। পরস্পরের শরীরকে পর্যন্ত ভালভাবে জেনে নিয়েছিলাম। টানা এক াপ্তাহ আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি বিয়ের আগে। তবু বুঝলাম, শরীরটাকে জানলেই ানুষটাকে জানা যায় না। মানুষের চরিত্রে কোনো ধারাবাহিকতা নেই, 'কনসিসটেনসি' নই।"

মালিনীর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। "আমি না জেনে যে অবস্থায় আপনি জেনেও সই অবস্থায়। আমার ভীষণ ভয় করছে, মিস্টার মুখার্জি। বিয়ে করা আমার পক্ষে ঠক হবে না।"

অভিজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে মালিনী বললো, "আমার এতোদিন ঠিক খেয়াল য়নি। আজ মনে হচ্ছে, আমি ডাইভোর্সড উয়োম্যান নই, তার থেকে অনেক খারাপ অবস্থা আমার, আমি রেপড্ উয়োম্যান। আপনি একবার ঠকেছেন, জানাশোনার ারেও আবার কেন ঠকবেন আপনি ?"

মালিনীর অনুরোধেই অভিজিৎ বিদায়ের সময় মিসেস বিশ্বনাথনকে বললো, "আমি আরও মেয়ে দেখবো। তারপরে কর্মস্থলে ফিরে যাবো। আরও ভাববো। তার আগে কিছু এগোবে না।"

এখন পাঁচটা দশ। রবীন্দ্র রচনাবলী হাতে অভিজিৎ আবার দাঁড়িয়ে আছে কোয়ালিটি রেস্তোরাঁর গেটের সামনে। ঘড়ির দিকে তাকালো অভিজিৎ। তার জানা আছে, এই পর্বের নায়িকার আসতে একটু দেরি হতে পারে। পাঁচটায় অফিস ছুটি, তারপর গণেশ অ্যাভিন্যু থেকে পার্ক স্ট্রীট আসা।

কলকাতার পথঘাটে যা ভিড়। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে আদৌ এখানে দেখাসাক্ষাৎ হয় এটাই আশ্চর্য। কিন্তু এখন অভিজিতের বিরক্তিবোধ নেই। দেখাসাক্ষাৎ না-হয়েও মানুষের জন্যে মানুষের এতো টান কী করে থেকে যায় তা অভিজিতের চিন্তার বাইরে। মানুষের মনে বিশেষ এক ভালবাসা রয়েছে, না হলে এই টান সম্ভব নয়।

পাঁচটা পনরোর সময় একটি মেয়েকে দেখা গেল। অভিজিতের হাতের রবীন্দ্র রচনাবলীর দিকে সে নজর দিচ্ছে। কিন্তু মেয়েটির সিঁথিতে সিঁদুর। সীমন্তিনীর সঙ্গে সম্পর্ক এদেশে যে আইনগত বিপদ ডেকে আনতে পারে তা অভিজিতের অজানা নয়। ডাকে একখানা অদ্ভুত চিঠিও এসেছিল। কলকাতার একটি মেয়ে এখনও আইনের স্বাধীনতা পায়নি। সে লিখেছিল, "আমার স্বামীর সহিত ডাইভোর্স মামলা চলিতেছে। কয়েক মাসের মধ্যেই কাজ সমাধা হইবে।"

মেয়েটি অস্থির হয়ে ইতিমধ্যেই স্বামীর সন্ধানে তৎপর হয়েছে। ওখানে কোনো উত্তর দেওয়া হয়নি। নীতিশ রায় বারণ করেছিলেন। আইনের নানা জটিলতা আছে ভারতবর্ষে—অসাবধান হলেই বিপদ।

সীমন্তিনী এবার অভিজিতের কাছে এগিয়ে এলো। "আপনি অভিজিৎ মুখার্জি ?"

"আপনার লোক চিনতে ভুল হয়নি।"

"আমি একটু আগে এসে গেলাম। সাধনা রায়চৌধুরী আমার দিদি। আমাদে বড়দি। দিদির আসতে আরও দেরি হবে, পথ অবরোধ চলছে এসপ্ল্যানেডে।"

"কারা পথ অবরোধ করলো ?" অভিজিৎ জানতে চায়।

দলের নাম জানে না মেয়েটি। শত-শত দল আছে কলকাতায়। তাদের আবা সংখ্যাহীন উপদল আছে। যার যখন ইচ্ছে হয় তখন কলকাতায় পথ অবরোধ করে কী তাদের দাবি, পথ বন্ধ করে কীভাবে সে দাবি ফলপ্রসূ হবে, এসব প্রশ্ন করা হ না। কলকাতায় থাকতে হলে এখন সব মেনে নিতে হয়। অবরোধ, অবস্থান, মিছি ইত্যাদিতে শুধু সাধারণ মানুষের ভোগান্তি হয়, বাস পাওয়া যায় না, ট্রেন ফেল হয় বাড়িতে দুশ্চিন্তা। কলকাতার পথঘাটে বেরিয়ে শেষ পর্যন্ত বহাল তবিয়তে বা ফিরতে হলে খুব ভাল স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। স্বাস্থ্য না-থাকলে খুব মুশকিল বেঁচে থাকা কিন্তু যারা পথ অবরোধ করে, বিক্ষোভ দেখায়, মিছিলে নেতৃত্ব দেয় তারা এসব বুঝতে চায় না। কেন তারা কান দেবে ? সব বুঝে চলতে হলে, আওয়াজই তোল যাবে না। দুনিয়ার নয়া জমানা তো মিছিল এবং অবরোধ থেকেই আসবে।

অভিজিৎ বললো, "চলুন, বসা যাক। আপনার দিদি আপনাকে নিশ্চয় চিনবে আমার হাতের রবীন্দ্র রচনাবলীর প্রয়োজন হবে না।"

সাধনা রায়চৌধুরীর বোনের নাম ইন্দিরা। সে বললো, "আমার বাবা খুব ইন্দিরা গান্ধীর ভক্ত ছিলেন। বলতেন, ভারতবর্ষের হিসট্রিতে গ্রেটেস্ট উয়োম্যান। মেয়েদে যেমন হওয়া উচিত ঠিক তেমন।"

না, সাধনা রায়চৌধুরীও খালি হাতে আসবেন। তার হাতে কোনো আদালতী কাগজপত্র থাকবে না। বৈধব্য, ডাইভোর্স কোনো কিছুই স্পর্শ করতে পারেনি নবী রায়চৌধুরীর মেয়ে সাধনাকে। কারণ অতি সহজ—সাধনার বিয়েই হয়নি। কুমারী সাধনার সামনে এখন কেবল চিরকুমারী হবার আশঙ্কা।

ইন্দিরার কাছে সব খবর পাওয়া গেল। কারণ চিঠিতে লেখা ছিল : পাত্রী শিক্ষিতা, সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মনিপুণা, অতীব কোমলস্বভাবা ও সঙ্গীত অনুরাগিনী। উচ্চত ১৬২ সেমি, দীঘল গঠন, মাধুর্যমণ্ডিতা এবং ফর্সা। ঐতিহ্যমণ্ডিত পরিবার। ব্যক্তিগত কারণে এতোদিন বিবাহ সম্ভব হয়নি, কিন্তু সম্পূর্ণ গ্লানিমুক্ত।

ইন্দিরা জানালো, "চিঠিটা আমিই লিখেছি, বিজ্ঞাপনটা আমিই দেখেছিলাম। ওদেশে সমানে-সমানে বিয়ে হয়। সুতরাং পাত্রের পঁয়ত্রিশ ও দিদির পঁয়ত্রিশ কিছু এসে যাবে না।"

হ্যাঁ, নবীন রায়চৌধুরীর পরিবার ঐতিহ্যমণ্ডিত, গর্বের সঙ্গেই জানালো ইন্দিরা।

যশোরের রতন রায়চৌধুরীর বংশ। সেই রতনবা ু যিনি মায়ের গঙ্গাস্নানের সুবিধের ান্যে যশোর থেকে কলকাতা পর্যন্ত যশোর রোডে গাছ লাগিয়েছিলেন। নবীনের াবা প্রবীণ রায়চৌধুরী পরাধীন যুগের দেশকর্মী, বহুবার কারাবরণ করেছিলেন দেশের াধীনতার জন্যে। দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে-সঙ্গে অবশ্য তাঁকে দেশছাড়া হতে হলো, ারাতে হলো পিতৃপুরুষের ভিটে।

নবীন রায়চৌধুরী ছিন্নমূল পরিবারকে নিয়ে সম্পূর্ণ দিশাহারা। সারা জীবনে িশেষ কিছুই করতে পারেননি—যৌথপরিবারের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে। াবশেষে যৌথপরিবারের দায়মুক্ত হয়ে নিজের স্ত্রী ও কন্যাদের নিয়ে বেহালায় াড়ি ভাড়া করেন। রতনবাবুর চার কন্যা। জ্যেষ্ঠা সাধনা, দ্বিতীয়া সরোজিনী, তীয়া বাসন্তী এবং চতুর্থা ইন্দিরা। ইন্দিরার বয়স এখন একুশ, এক বৎসর হলো িবাহিতা।

সওদাগরী অফিসের কেরানী এবং অবসর সময়ের কংগ্রেসকর্মী নবীনবাবু নিজেই াধনার বিবাহের যোগাযোগ করছিলেন। বিবাহ প্রায় ঠিকঠাক, সেই সময় ছুটে বাস রতে গিয়ে তিনি অসুস্থ হন। পথেই মৃত্যু, যদিও ওই অবস্থায় পি-জি হাসপাতালে িয়ে যাওয়া হয়েছিল।

সাধনা বিয়ে করেনি। বরং টাইপ শিখেছে এবং একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে। শুধু চাকরিতে চলেনি, তাই দিদি কোচিং ক্লাস শুরু করেছে। দিদি যা করে ভালভাবে রে", ইন্দিরার গর্ব, কোচিং-এ নাম আছে দিদির, বেহালা অঞ্চলে।

দিদি একে একে বোনদের পাস করিয়েছে এবং পাত্রস্থ করেছে। ঈশ্বরের াশীর্বাদে কিন্তু সাধনার ত্যাগে সরোজিনী, বাসন্তী ও ইন্দিরা আজ িবাহিতা। সরোজিনীর স্বামী শিক্ষক, বাসন্তীর স্বামী ইনকামট্যাক্সে ইন্সপেক্টর য়েছে সম্প্রতি। ইন্দিরার স্বামী বেসরকারী অফিসে জুনিয়র অফিসার। এবার াধনার বিয়ে না-করার যুক্তি নেই।

"এখন বিয়ে না-হলে আর তো বিয়ে হবে না। পঁয়ত্রিশের পরে মেয়েদের আর ক থাকে বলুন?"

অভিজিৎ বললো, "ছত্রিশ থাকে, সাঁইত্রিশ থাকে....এইভাবে সাতাত্তর আটাত্তর র্যন্ত রয়েছে। ওইটাই মার্কিন দেশে মেয়েদের গড় পরমায়ু।"

ইন্দিরা বললো, "আপনি এদেশের কথা জানেন না। বিধবা ভাল, ডাইভোর্সিও াল—কিন্তু চিরকুমারীর অনেক অসুবিধে।"

ইন্দিরা দিদির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। "এমন অসাধারণ মানুষ বিরল। সবসময় াসিখুশি। কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। বোন-অন্ত প্রাণ। না-হলে কেউ িজের জীবন এইভাবে নষ্ট করে?"

"ইংরিজী জানেন?"

"এখানে সাধারণ ঘরে যেমন জানে। পছন্দ হলে শিখিয়ে-পড়িয়ে নেবেন।" একটু থামলো ইন্দিরা। তারপর বললো, "দিদি দেখতে সুন্দরীই। কিন্তু ডবল শিফটে কাজ করে এবং রাস্তার ধোঁয়ায়, ধুলোবালিতে প্রতিদিন লড়াই করে দিদির সেই রূপ চাপা পড়ে গেছে। দিদি কোনো মেক-আপ করে না, আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন। একটু আদর-যত্ন হলেই একেবারে অন্যরকম হয়ে যাবে।"

দিদিকে দূর থেকে দেখা গেল। ইন্দিরা বললো, "দিদিকে বসিয়ে দিয়েই আমি চলে যাবো। আপনি মনে কিছু করবেন না। আমরা সামনে থাকলে দিদি হয়তো কথাই বলতে পারবে না।"

চা না খেয়েই দিদিকে বসিয়ে ইন্দিরা চলে গেল। অভিজিৎ খাবার অর্ডার দিলো। কিন্তু এবারও সমস্যা। আজ শুক্রবার—সন্তোষী মায়ের পূজা। মাছ মাংস স্পর্শ করবে না সাধনা রায়চৌধুরী। "অন্ততঃ চীজ পাকোড়া ? ওটা ভেজিটারিয়ান।" ওটাও স্পর্শ করলো না যখন শুনলো ওতে ছানা আছে।

মেয়েটিকে মন্দ লাগছে না অভিজিতের। বললো, "আপনার বোন তো আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সংসারের জন্যে আপনি অনেক কিছু করেছেন।"

চুপ করে আছে সাধনা। অভিজিৎ বললো, "আমার স্ত্রী চলে গিয়েছেন অন্য লোকের সঙ্গে। ওদেশে যত বিয়ে হয় তার অর্ধেকই ভেঙে যায়। কেন কেউ তা জানে না।"

এবার মুখ খুললো সাধনা। "আপনার তা হলে খুব কষ্ট—রান্নাবান্না ?"

"রান্নবান্না নিয়ে ওদেশে মাথা ঘামাতে হয় না। ওটা বড় সমস্যা নয়। বড় সমস্যা মনকে স্থির রাখা। সব ব্যাপারেই মানুষ অস্থির। হয়তো অস্থির বলেই ওরা অতটা এগিয়েছে।"

সাধনা এবার জিজ্ঞেস করলো, "সব কথা ইন্দিরা আপনাকে বলেছে ?"

"আপনার ত্যাগের কথা শুনেছি। আপনার দায়িত্ব ইদানীং শেষ হয়েছে।"

সাধনার মুখ শুকিয়ে গেল। "শেষ হয় নি, অভিজিৎবাবু। আমার মা, যিনি এই সংসারের হাল ধরেছিলেন (আমি তো শুধু দুটো টাকা এনে খালাস) তিনি ইন্দিরার বিয়ে পর্যন্ত বেশ সুস্থ ছিলেন। এই কিছুদিন হলো তাঁকে নিয়ে অসুবিধে। বেশ অসুস্থ। বিছানা থেকে উঠতে পারেন না।"

সাধনা এবার জানিয়ে দিলো, "মাকে এইভাবে ফেলে রেখে চলে যাওয়া সম্ভব হবে না। মা আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করেছেন।"

সাধনার চোখে জল। মনে হলো সে বিয়েতে আগ্রহিণী, কিন্তু কিছু সময় ভিক্ষে করছে।

মা এইভাবে কতদিন থাকতে পারেন তা তো জিজ্ঞেস করা যায় না এই দেশে চুপ করে রইলো অভিজিৎ।

বাইরে বেরিয়ে অস্বস্তি বোধ করলো অভিজিৎ। ফুটপাথে দিদির জন্যে অপেক্ষা
াছে ইন্দিরা। "একি, আপনি দাঁড়িয়ে! ভিতরে থাকলেন না কেন? আমরা কী
ান কথা বলতে পারতাম?"

ইন্দিরা বললো, সে শুনেছে যারা ওদেশে থাকে তারা প্রাইভেসি না পেলে ভীষণ
াক্ত হয়।

বাড়িতে ফিরে এসেছে অভিজিৎ। মায়ের তৈরী রান্না খেয়ে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে
ভাবছে সারাদিনের অভিজ্ঞতার কথা। এদেশের মেয়েদের একটা নতুন রূপ সে
খতে পাচ্ছে। এই সব মেয়েদের তো তার জানা ছিল না।

বোন অসীমা একটা চিঠি লিখে গিয়েছে। "দাদা, প্রণতিকে তোমার মনে আছে?
মার বান্ধবী। যে একদিন তোমার অ্যাডমায়ারার ছিল।"

প্রণতির ঠিকানা পাঠিয়ে দিয়েছে অসীমা। ওর সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাব দিয়েছে
সীমা।

প্রণতির কথা মনে পড়ছে অভিজিতের। না মনে পড়বার কথা নয়। সেই মিষ্টি
য়েটি যে পাশের ঘরে বসে গান গাইতো, আর এই ঘরে বসে অভিজিৎ শুনতো।
তখনও বাইরের বিশ্ব আঁখি মেলে তাকায়নি অভিজিতের দিকে। হাওড়ার এই
মিত পৃথিবীতে প্রণতিকে দেখেই প্রথম পরিচয়ের রোমাঞ্চ অনুভব করেছে
ভিজিৎ। অভিজিৎ নিজেই গোপনে এক টুকরো কাগজ পাঠিয়েছিল তার গানের
রিফ করে।

তারপর একবার গোখেল কলেজের গেটের কাছেও দেখা হয়ে গিয়েছিল। "আপনি
খানে?" অবাক হয়ে গিয়েছিল প্রণতি।

"এই পি-জিতে একজনের সঙ্গে দেখা করার ছিল। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।"
ভিজিতের মনে পড়ছে। ঠিক হঠাৎ নয়। প্রণতির আশায় পনরো মিনিট
ড়িয়েছিল। দু'জনে একসঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে রবীন্দ্রসদনের বাসস্ট্যান্ডে এসেছে। মনে
ছে, যত শ্লথ গতি সম্ভব তত শ্লথ হয়েছিল অভিজিৎ। তখনও বিদেশের ক্যাম্পাসে
ায়ের আধুনিকতম কারিগরী বিদ্যা তার আয়ত্তে আসেনি। এইভাবে প্রণয় চলে
পৃথিবীর কাছে। ওখানে একটা সুবিধা টেলিফোন। টেলিফোন নেই এমন মেয়ে
ই। টেলিফোন ছাড়া ওদের ডেটিং সিস্টেম ভেঙে পড়তো।

আরও একদিন "হঠাৎই" দেখা হয়েছিল গোখেলের গেটে। সেদিন ঈশ্বর দয়া
রছিলেন—রবীন্দ্রসদন বাসস্ট্যান্ডে বাস আসে না। হাওড়ায় এবং কালীঘাটে একই
ঙ্গ জ্যাম। অগত্যা হাইকোর্টের সামনে চাঁদপাল ঘাট থেকে স্টীমার ধরবার প্রস্তাব
য়েছিল অভিজিৎ। রাজী হয়ে গিয়েছিল প্রণতি। মেয়েদের পক্ষে এইসব রাস্তায়
কলা হাঁটার ভয় আছে, বাবারও বারণ। কিন্তু অভিজিৎ যখন রয়েছে তখন চিন্তা

কি ? বলেছিল প্রণতি। কথাটা খুব ভাল লেগেছিল অভিজিতের, একটা মেয়ে ত
ওপর আস্থা স্থাপন করতে পারছে।

এরপর দ্রুত পটপরিবর্তন হয়েছে। অপ্রত্যাশিত সুযোগ নিয়ে আমেরিকায় পা
দিয়েছে অভিজিৎ। সেখান থেকেও প্রথম দিকে চিঠি এসেছে প্রণতির কাছে। এ
সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের পিকচার পোস্টকার্ড।

সেবারে যখন এসেছিল তখন দেখা করেনি প্রণতির সঙ্গে। সময় ছিল না। তাছা
ডায়ানার চিন্তায় অভিজিৎ বিভোর। বোন অসীমা বলেছে, "দাদা, তোমার রি
অ্যাডমায়ারার ওই প্রণতি। তোমার সব ক'টা চিঠি রেখে দিয়েছে যত্ন করে। একব
দেখা করো, মানুষের কত দুঃখ থাকে।"

ভাল লাগেনি অভিজিতের। কে কবে কাকে কি চিঠি লিখেছে তা সাবধানে সং
করে রাখার মানে কি ? অসীমাও বা তা জানতে পারে কী করে ?

অভিজিতের মন অবশ্য গ্লানিশূন্য। একটা প্রণয়ঘটিত কথা চিঠিতে নেই। প্রণ
সান্নিধ্য তার ভাল লেগেছে, কিন্তু তার বেশী কিছু এগোয়নি। দু'দিন একসঙ্গে রা
দিয়ে হেঁটে বেড়ানোর মানে প্রেম নয়। বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি নয়। এই সহজ জিনি
এদেশে কেউ বোঝে না বলেই তথাকথিত ডেটিং এদেশে এতো বিপজ্জনক। মানুষ
পরস্পরকে আবিষ্কারের সুযোগ ও সময় দিতে হবে তো।

এবারে খবর নিয়েছে অভিজিৎ। প্রণতির বাবা, আদালতে যাঁর ভাল প্র্যাক
ছিল না, মা যাকে জিভমোটা উকিল বলতেন, তিনি জীবনযন্ত্রণা থেকে মু
পেয়েছেন।

প্রণতির খবরও ভাল নয়। প্রণতির বিয়ে হয়েছিল—স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষ। সত
বিয়ে দিতে হলে দোজবরে ছাড়া উপায় কি ? সেই স্বামীও ছিল মদ্যপ ও স্বাস্থ্যহী

প্রণতি বিধবা হয়েছে গত বছরে।

প্রণতি বিধবা ! কোথায় যেন আশার আলো দেখা দিচ্ছে। আবার নিজেকে বকু
দিলে অভিজিৎ। প্রণতি, তুমি বিবাহিত জীবনে সুখী হলেই আমি সুখী হতাম। আ
তো তোমার এই ভাগ্যবিপর্যয়ে কোনো অংশগ্রহণ করিনি। আমি দুঃখিত, তো
স্বামী চলে গিয়েছেন, তুমি এই বয়সে বিধবা হয়েছো। আমার ধারণা ছিল, ইন্ডি
অনেক এগিয়ে গিয়েছে। স্বাস্থ্যের নাটকীয় উন্নতি হয়েছে, অন্তত ষাট বছর বেঁচে থাক
প্রত্যাশা করতে পারে এদেশের প্রতিটি মানুষ।

অবশেষে প্রণতির সঙ্গে দেখা হলো। ব্যবস্থাটা করে দিয়েছে অসীমা। ও বলে
"দাদা, তুমি তো জানো, ওর মতন মেয়ে হয় না। সেবারে সে তোমার জন্যে অপে
করছিল। মুখ বুজে। ও কাউকে বলেনি যে তুমি ওকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিয়েছো

অবশ্যই দাওনি, প্রতিশ্রুতি দিলে সোমেশ্বর মুখার্জির ছেলে তা কেন রাখবে না ? কিন্তু তবু মানুষের মনে অলীক প্রত্যাশা জাগে—গরীব দেশের মানুষ তো। আমাদের এই হাওড়ার সরুগলিতে বসেও মানুষ কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চাইবে তো। দাদা, প্রথম দিকে তুমি ওকে চিঠি পাঠিয়েছো তো বিদেশ থেকে। সেইসব চিঠি যদি কেউ বার বার পড়ে থাকে তুমি তাকে দোষ দিতে পারো না।"

কলকাতায় অফিসের সামনেই প্রণতির সঙ্গে দেখা হলো। তাও রক্ষে, থান শাড়ি পরে প্রণতি উপস্থিত হয়নি অভিজিতের সামনে। সে পরেছে নীল রঙের হাল্কা প্রিন্ট। শাশুড়ীর নির্দেশ। সব রঙ পরবে। শুধু লাল রঙ পরতে সাহস পায় না বিধবারা। লালের ধারে-কাছে থাকে না ওরা। অথচ ইন্দিরা গান্ধী তো পরতেন। তার উত্তর প্রণতিই দিয়েছে, উনি তো দেবী, দেশের জননী। একজন অর্ডিনারী বিধবার সঙ্গে তো ওঁর তুলনা চলে না।

দ্বিধা করছিল প্রণতি। কিন্তু অভিজিৎ শোনেনি। ভাড়া করা সারাক্ষণের গাড়িতে তুলেছে ওকে। নিরাপদ দূরত্ব রেখে চলেছে অভিজিৎ। বিদেশে বসবাস করলে, মানুষ অনেক দায়িত্ববোধসম্পন্ন হয়। মানুষের শারীরিক প্রাইভেসিকেও রেসপেক্ট করতে শেখে।

ওরা প্রথমে সেই কোয়ালিটিতে হাজির হলো। কিন্তু আজ কোয়ালিটিতে ভীষণ ভিড়। বসবার জায়গার জন্যে ধৈর্য ধরতে হবে।

বেরিয়ে আসছিল। ঠিক সেই সময় একটা টেবিল খালি হলো। প্রণতি সব খবর রাখে। অভিজিৎদা এখন মস্ত লোক হয়েছেন। অভিজিৎদা বাড়ির মালিক হয়েছেন। সেখানে দোতলায় চারখানা শোবার ঘর আছে। একতলায় কেউ শোয় না, শুধু রান্না ও বসবার জায়গা। তাছাড়াও বেসমেন্ট আছে—একতলারও নিচে, যাকে কুঠুরি ঘর বলা চলতে পারে। অভিজিৎদার একটা নয়। তিনটে গাড়ি আছে। একটা মানুষ তিনটে গাড়ি নিয়ে কী করবে ?

তিনটে গাড়ি কেউ একসঙ্গে চড়ে না। একটা চটি, একটা সু, একটা কাবলির মতন। ছোটটায় রোজ অফিসে যাওয়া। বড়টা নিয়ে বন্ধুবান্ধবসহ কোথাও একটু ঘুরে আসা। আর ভ্যানটা নিয়ে বনবাস গমন। মাসে একবার বনে চলে যাওয়া।

"আপনি কেন বনবাসী হবেন ?" প্রণতি চায় না অমন কিছু ঘটুক।

"বনের মধ্যে একটা কাঠের বাড়ি করে থেকে যেতে মন্দ লাগবে না, প্রণতি।"

প্রণতির নিজস্ব সাইকেলও নেই। নেতাজী কলোনি থেকে পাঁচ মিনিট পথ হেঁটে বাসস্ট্যান্ড। বাসে অথবা রিকশয় ফেরিঘাট। সেই ফেরিতে বাবুঘাট। তারপর আবার পদযাত্রা এবং অফিস।

"অনেক সময় লেগে যায় না ?"

"যায়। কিন্তু আমি তো একলা নই, আমাদের ওখানে সবাই একই কষ্ট করছে, তাই মনে লাগে না।"

প্রণতির বাড়িতে বিদ্যুৎ আছে, কিন্তু রান্নার গ্যাস নেই। রান্নার গ্যাস নেবে সামনের বছরে অফিসে মাইনে বাড়লে। এখন কয়লা ও জনতা স্টোভ। জনতা কাজ দেয় না, কারণ কেরোসিনের দোকানে মস্ত লাইন। যতটুকু যোগাড় হয় হ্যারিকেনে লেগে যায়। সন্ধ্যেবেলায় লোডশেডিং আছেই। ওই সময়ে রান্না।

অভিজিতের বিবাহিত জীবন সম্পর্কে কথা উঠবার আগেই সে নিজে সব বললো। "ঘরটা ভেঙে গেল। আমি না, ডায়ানাই চাইলো।"

ডায়ানার নিন্দা করতে রুচিতে বাধলো। বরং প্রশংসা করলো, "প্রাণবন্ত মেয়ে ছিল। কিন্তু ওদের ধৈর্য নেই, ওরা যা চাইবে তা সঙ্গে-সঙ্গে পেতে হবে। পশ্চিমের মানবধর্ম ওটা। আসলে আমরা ক্লিক করলাম না।"

ক্লিক জিনিসটা কি ঠিক বুঝতে পারছে না প্রণতি। "ওই যে একটার সঙ্গে একটা যখন ঠিকমতন লেগে যায়, একটা ক্লিক করে আওয়াজ হয়। ওই আওয়াজটা না হলে বুঝতে হবে ঠিক লাগেনি। এই দ্যাখোনা আমার অ্যাটাচি কেস।" ডালাটা খুলে আবার বন্ধ করে ক্লিক দেখালো অভিজিৎ।

প্রণতির বিয়েটাও তো ক্লিক বলা চলে না। স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষ। বিয়ের পর থেকেই স্বাস্থ্য খারাপ। একের পর এক রোগ। তার ওপর ড্রিঙ্ক করেছে। শেষ পর্যন্ত থাকলো না। চলে গেল। শেষ দশদিন নীলরতন হাসপাতালের জেনারেল বেডে খুব কষ্ট পেয়েছে।

ভাগ্য ভাল, চাকরি পেয়েছে প্রণতি। না-হলে কষ্টের শেষ থাকতো না। ওই যে বিয়ের আগে শর্টহ্যান্ড শিখেছিল, ওটা কাজে লাগলো। একসময় তো ভেবেছিলো বিয়ে করবো না। তখন মা ভয় দেখালেন, কুমারী মেয়েদের ভীষণ অবস্থা।

এসব কষ্ট আর প্রয়োজন কী? যা ভুলে যাবার তা তো অতীতে সরে গিয়েছে। বিবাহিত জীবনে প্রণতি তো কিছুই পায়নি।

কোয়ালিটি থেকে বেরিয়ে, গাড়িটা ঘুরিয়ে পি-জি হাসপাতালের দিকে চললো ওরা। ওখানে বিধবা প্রণতি ও ডাইভোর্সি অভিজিৎ গোখেল কলেজের গেটটা দেখলো। রবীন্দ্রসদনের সামনে এখনও তেমন ভিড় ! সামনের বাসস্ট্যান্ডেও কিছুক্ষণ গাড়িটা থামলো। তারপর সোজা চাঁদপাল ঘাট—সেই লঞ্চঘাট যেখানে অনেক বছর আগে পায়ে হেঁটে ওরা দু'জন এসেছিল পি-জি থেকে। সেদিনই কি প্রণতিকে সে একটা চিঠি লিখেছিল? অভিজিৎ মনে করতে পারছে না।

হ্যাঁ, ওইদিনই চিঠি লিখেছিল, প্রণতি মনে করিয়ে দিলো। তারিখটা বলে দিলো প্রণতি। তারপর বললো, "চিঠিগুলো আর নেই।" বিয়ের আগের দিনে সব নষ্ট করে ফেলেছে প্রণতি। নতুন জীবন আরম্ভ করতে চেয়েছে প্রণতি।

এবার কী হবে? ঘুরেফিরে আবার সেই একই ঘাটে তো দু'জনে চলে এসেছে। অথচ এখন একজন বিধবা এবং আরেকজন ডাইভোর্সি।

হঠাৎ প্রণতি বললো, "আমি এখানে নেমে যাই। একটা লঞ্চ এখনই আমাকে হাওড়ায় নিয়ে যাবে। এবং সেখান থেকে সোজা লঞ্চে চলে যাবো উত্তর কলকাতার শেষ প্রান্তে।"

আরও একটু থাকার অনুরোধ করেছিল অভিজিৎ। কিন্তু প্রণতি বললো, "শাশুড়ী অসুস্থ। বাড়িতে গিয়ে রান্না চাপাতে হবে।"

ফেরির লঞ্চ চলে গেল। সেই শেষ খেয়ার মতন। হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলো অভিজিৎ কিছুক্ষণের জন্য।

পরের দিন চিঠি পাঠিয়েছিল প্রণতি। "এই প্রথম আপনাকে চিঠি লিখছি। ভীষণ ভয়-ভয় করছে। আমি বুঝতে পারছি, যেখানে আছি আমাকে সেখানেই থাকতে হবে। যিনি আমার সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছিলেন, তিনি নিজেকে ঠকিয়েছেন যথেষ্ট, কিন্তু আমাকে ঠকাননি। আমার শ্বশুর-শাশুড়ী সম্পূর্ণ আমার উপর নির্ভরশীল। তাঁরা সুস্থও নন। চাকরিটাও পেয়েছি বিধবা হিসেবে ওঁরই অফিসে কমপ্যাশনেট গ্রাউন্ডে। জীবনে যা কিছু পেতে ইচ্ছে করে তা পাওয়ার জন্যে ভাগ্য করে আসতে হয়। সেইসব ভাগ্যবতীরা কেন বিধবা হবে? আমার নমস্কার নেবেন।

ইতি প্রণতি।"

অভিজিৎ মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ বসে রইলো। চিঠিটা নিজের কপালে ঠেকিয়ে বোধহয় প্রণিতিকেই নমস্কার করলো।

অভিজিৎ মুখার্জি শেষ পর্যন্ত সাধনা রায়চৌধুরীর সঙ্গেই যোগাযোগ করেছে। কারুর পরামর্শ না শুনে সাধনাকেই সে বিয়ে করেছে। তাকে বলেছে, "ওদেশে যেতে হবে না। যতদিন খুশি এখানে থাকো, পঙ্গু মায়ের সেবা করো। তারপর দেখা যাবে।"

সাধনার মতন একজন মেয়ের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে মনে রেখেই সুদূর মার্কিন দেশের মাটিতে অভিজিৎ মনোবল পাবে। এখন থেকে তার আত্মবিশ্বাসের কোনো অভাব হবে না।

মধুর চেয়েও মিষ্টি

শুধু সুচরিতা নয়, আমার আর এক ভাগ্নীও বিদেশে থাকে। এবারে তার গল্প শোনা যাক।

দমদম বিমানবন্দরের পাবলিক টেলিফোন থেকেই রূপসী দেশাই সোজাসুজি তার লেখক মামাকে ফোন করেছিল।

আচমকা আমেরিকাপ্রবাসী ভাগ্নীর কাছ থেকে ফোন পেয়ে মামা কিছুটা মধুরভাবেই সারপ্রাইজড!

"হাই মামা! রূপসী হিয়ার!"

"কোথা থেকে কথা বলছিস? ক্লিভল্যান্ড, ওহায়ো থেকে?"

"আওয়াজ শুনেও বুঝতে পারছো না?" রূপসীর রসিকতা।

"আজকাল এই কৃত্রিম উপগ্রহের দয়ায় কিছুই বুঝতে পারি না, কে কোথা থেকে কথা বলছে। নিউইয়র্ক থেকে ফোন এলে মনে হয় যেন পাশের ঘরের সঙ্গে কথা বলছি; আবার এখানে পাশের গলি থেকে ফোন করলে মনে হয় মঙ্গলগ্রহ থেকে সিগন্যাল আসছে, কিংবা আমি কালা হয়ে গিয়েছি।"

মামাটি রসিক। বললো, "নিজের মামাকে তুলতে চাইছো—'হাই' বলে, কিন্তু এখন আমরা একটু লো আছি।"

রূপসীর বিদেশে পঠনপাঠন। ওখানে বসবাস করে সে আত্মপ্রত্যয়ের অধিকারিণী হয়েছে। সে বললো, "হোয়াট অ্যাবাউট তোমার আদরের বোনের টেলিফোন? ওটা কি 'হংক' করেছে?"

'হংক' মানে যে খারাপ হয়ে পড়ে থাকা তা সাহিত্যিক মামা শিখেছে এই রূপসীর কাছেই। রূপসী বুঝিয়েছিল, বাংলা ভাষার দরজা খুলে দাও মামা, নতুন-নতুন শব্দ দেশ-বিদেশ থেকে তুলে নাও। হংক মানে হর্ন বাজানো—অনেকটা মরে গেলে যেমন শিঙে ফোঁকা বলে বাংলায়।

মামা তারপর ঐ শব্দটা লেখায় ব্যবহার করছে, কিন্তু 'হাই' কথাটা এখনও হজম হয়নি।

"বড্ড ইয়াংকি-ইয়াংকি মনে হয়, কানে খচখচ করে। আফটার অল, মাই ডিয়ার রূপসী, আমাদের মনে রাখতে হবে বাংলা ভাষা ইজ নো অর্ডিনারী ভাষা! স্বয়ং কবিগুরু

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ভাষায় হোল লাইফ লিখে গিয়েছেন এবং স্বয়ং 'সাটাজিট্রে' এই ভাষাতেই চলচ্চিত্র বানিয়েছেন।" রূপসী জানে, সত্যজিৎ রায়ের ওই বিকৃত বানানটাও মামা চয়ন করে এনেছেন ক্লিভল্যান্ড, ওহায়ো থেকে।

টেলিফোনে মামা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। "বালাই ষাট, দুঃখে তোমার মায়ের টেলিফোন পটল তুলবে? ও-পাড়ায় যে টেলিফোন মিস্ত্রি আছে স্বয়ং তাজুদি, তাকে রায়ের লেখা প্রতিটা স্বাক্ষরিত সংস্করণ উপহার দিয়ে যাচ্ছে। খুবই সাহিত্যরসিক মিস্ত্রি—এবং ওনলি সিটি ইন দ্য ওয়ার্লড যেখানে বই, ছবি, মিউজিক ক্যাসেট দিয়ে তুমি সাতখুন মাপ করাতে পারো।"

মামা বললেন, "তোমার মা তো বলেনই, টেলিফোনের লোকের মনোরঞ্জন কিছুতেই করতাম না যদি-না আমার প্রাণাধিক মেয়েরা ফরেনে থাকতো।"

তাজুদির ভীষণ দুঃখ হীরের টুকরো মেয়েরা কেউ এদেশে ঘরসংসার করলো না। ভীষণ রাগ তাজুদির ওই কলাম্বাস সায়েবের ওপর। ওই ভাউণ্ডুলে লোকটা যদি পেটের দায়ে আমেরিকা আবিষ্কার না করতো তা হলে তাঁর মেয়েরা দেশছাড়া হতো না—থাকতো চোখের সামনে এই ভবানীপুর, বেহালা কিংবা কোন্নগরে। তাজুদি সারাক্ষণ টেলিফোনটা বাঁচিয়ে রাখার জন্যে ব্যাকুল। মরবার সময় ওরা চোখের সামনে না থাক, টেলিফোনে নাড়িছেঁড়া আদরের মেয়েদের গলা শুনতে পাবেন।

মামা বলেছে, "তাজুদি, ভবসংসার থেকে যাবার সময় কেউ 'হাই মামি' শোনে না, শুনতে হয় হরিনাম, আর মুখে গঙ্গোদক।"

তাজুদি সব ব্যাপারেই ভীষণ গুছনো, আগাম ভেবে নিয়ে আগাম কাজ করতে উনি তুলনাহীনা। ফোনে তো আমেরিকা থেকে মুখে জল দেওয়া যাবে না। অথচ যা ওজন বেড়েছে, যা হার্টের অবস্থা, যেরকম দুশ্চিন্তা, অকারণে যেরকম বুকের ধুকপুকুনি এবং স্বামীর নিরন্তর খ্যাঁচাখেঁচি তাতে কখন যে ঝপ করে ভবসিন্ধু পার থেকে ডাক আসবে ঠিক নেই। তাই মেয়েদের হাত দিয়ে প্লাস্টিক বোতলে গঙ্গাজল ঢুকিয়ে সিল করিয়ে নিয়েছেন, প্রয়োজনে সন্তানের স্পর্শে পবিত্র গঙ্গোদক হাতড়াতে হবে না।

"কিন্তু তাজুদি, জল বেশিদিন থাকলে পোকা হয়—একেবারে দূষিত জল যে স্বাস্থ্যের পক্ষে কত ক্ষতিকারক তা টিভি-তে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা থেকে শুনেছো নিশ্চয়। কাটা ফল এবং পচা জল—আন্ত্রিক রোগের স্পেশাল এজেন্ট।"

"তোর তাজুদি বোকা, কিন্তু অত বোকা নয়। তা হলে দু-দুটো আমেরিকান মেয়ের মা হতে পারতো না। যখন শ্বাস উঠেছে, খাবি খাচ্ছি, যখন যাবার সময় হয়ে যাবে তখন কোন দুঃখে স্বাস্থ্যের পরোয়া করবো?"

মামা আরও বলেছে, "যার দু-দুটো এন-আর-আই জামাই, তাকে কী ভাবে

খিটখিট করতে সাহস পায় জামাইদা ? আমরা টেক আপ করবো সিরিয়াসলি, বিবাহে
চল্লিশ বছর পূর্তি হলেও বধূ নির্যাতন নট অ্যালাউড। নিষিদ্ধ।"

তাজুদি বলেছেন, "তোর মায়ের কাছেই ছড়াটা শিখেছিলাম ঃ
'মিটমিটে বাতি আর পিটপিটে ভাতার,
কোন দিকে যাইবা গো দুনিয়াই আঁধার'।"

"কলকাতার মিটমিটে বাতির জন্যে ভগবান ছাড়া আর কারও কাছে অভিযো
করার নেই, তাজুদি, কিন্তু জামাইদাকে কথা শুনিয়ে যাও প্রাণ খুলে। আমার ম
তো তোমাকে বলে গিয়েছেন—'অবলার মুখে বল'।"

"তুই ডাক্তার রাজেন রায়চৌধুরীর কাছে নিয়ে গিয়ে ওঁর একটা কানের কল্ ক
দে—আজকাল আমার কোনো কথা ওঁর কানে ঢোকে না। আমার গলা চিরে র
বেরিয়ে যায়, কিন্তু কোনো ফল হয় না। এতো দেখে-শুনে বাপ মা বিয়ে দিয়েছিল
তবু যে এমন কালার খপ্পরে পড়তে হবে কে জানতো!"

মামা বলেছে, "আঃ তাজুদি, পিতৃপুরুষকে নিয়ে অযথা অন্যায়ভাবে টানাটা
কোরো না। চল্লিশ বছর আগে যখন জামাইদাকে স্পেশাল সিলেকশন করা হয়েছি
তখন ওঁর চেহারা ছিল ফিল্ম হিরোর মতন। রোল্স রয়েস, মার্সেডিজ বেন্জ পর্য
মোটর গাড়ির পার্টস-এর জন্যে চল্লিশ বছরের গ্যারান্টি দেয় না।"

টেলিফোনে মামা তাঁর ভাগ্নীকে জানালো, "তোর মাকে ফোনে পাবি কী করে
জামাইদার সঙ্গে ঝগড়ার মিটমাটের পর ভীষণ ভাব হয়েছে, দু'জনেই ফ্ল্যাট খালি ক
বেরিয়ে গিয়েছেন দ্বিতীয় মধুচন্দ্রিমায়।"

মামার এতোক্ষণ ধারণা ছিল মহাসমুদ্রের ওপার থেকেই কথা বলছে রূপসী। কি
দমদম এয়ারপোর্টের নাম শুনে খুব অবাক হলো। মামা বললো, 'তুই অপেক্ষা কর
আমি এখনই আসছি।"

"আমি অবলা বঙ্গললনা নই, মামা। আমি যদি ক্লিভল্যান্ড থেকে জে-এফ-
এয়ারপোর্ট, জে-এফ-কে থেকে ইন্দিরা গান্ধী ইনটারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট টু পালা
ডমেস্টিক এয়ারপোর্ট এবং সেখান থেকে দমদম বিমানবন্দরে আসতে পারি তা হ
দমদম থেকে তোমার বাড়ি অনায়াসে হাজির হতে পারবো।"

মামা রাজি হলো না। "তুই ওখানে একটু অপেক্ষা কর, লাগেজ ক্লিয়ার হোব
আমি ঝট করে চলে আসছি। তোর মা যদি শোনে তোকে একলা কলকাতা
ট্যাক্সিওয়ালার দয়ার ওপরে নির্ভর করে মামাবাড়ি পৌঁছতে হয়েছে তা হলে আমা
রক্ষে থাকবে না। একেই তাজুদি ভীষণ চটে আছেন, সেদিন পোস্ত চচ্চড়ি খে
যাইনি বলে।"

মামা সত্যিই যেন উড়ে এলো দমদমে। রূপসীর বাক্সপ্যাটরার বহর দেখে মামা

চক্ষু চড়কগাছ। হঠাৎ বলে ফেলেছিল, "একি রে ! তুই যে পুরো সংসার গুটিয়ে এনেছিস !"

রূপসীর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। কিন্তু মুখে কিছু বললো না। মামার যা পুরনো স্বভাব, সারাক্ষণ রসিকতা করে যাচ্ছে ঃ "তোকে এরোপ্লেন কোম্পানি এতো মাল তুলতে দিলো ?"

"মামা, তোমার জানা উচিত, বাড়তি ভাড়া দিলে তুমি হাতি পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে আসতে পারো। ওই হাওয়া তো এদেশেও লেগেছে—দিল্লিতে তিনখানা মোটর গাড়ি ওঠানো হলো আজকের প্লেনে।"

"তোরা খুব সারপ্রাইজ দিতে পারিস ! উইদাউট নোটিসে এখানে চলে এলি ! তাজুদি তো খুব লজ্জা পেয়ে যাবেন। ঠিক এই সময়েই সেকেন্ড হনিমুনে পুরীতে।"

মামা জানালো, "যাবার দিনেও তাজুদি দোনোমোনো করছিলেন। হঠাৎ হাত থেকে পড়ে একটা কাঁচের প্লেট ভাঙলো। বললেন, "নিশ্চয় কেউ আসবো-আসবো করছে। আমি ব্যাপারটা পাত্তা দিলাম না। মোটা ইনভেস্টমেন্ট করে ফেলেছি—ওদের দু'জনের জন্যে। দুটো সুইম সুট্ কিনেছি। ওই দেখে খুব রাগ তাজুদির—বললেন, মাসীমা নেই, কার কাছে আর লাগাবো তোকে শাসন করতে। জামাইদাও বাইরে যাবার জন্যে উৎসাহিত—ওঁর কথা কানে তোলা হলো না। শেষ পর্যন্ত তাজুদি রাজি হলেন, যাই জগন্নাথের কাছে—মানত্টা করে আসি। বড়র বেলাতেও করেছিলাম, হাতে-নাতে ফল পেয়েছি।"

মানত্টা কী রূপসী তা প্রথমে বুঝতে পারেনি। মামা খুব খোলাখুলি লোক। বললো, "রূপসীর জন্য সন্তান প্রার্থনা—তাজুদি্ একটু অধৈর্য, 'কী যে সব ওষুধপত্তর বেরিয়েছে ! কেউ মা ষষ্ঠীকে পাত্তা দেয় না ! যার যা খুশি করে'।"

এখানকার মেয়ে হলে লজ্জায় মুখ রাঙা হয়ে উঠতো। কিন্তু রূপসী বিদেশে লেখাপড়া করেছে, সেখানে বসবাস করেছে। সে বললো, "ভগবানের দায়িত্ব ও-দেশের মেয়েরা অনেক কমিয়ে দিয়েছে মামা। তবে ইদানীং বেবি বুম চলেছে, চল্লিশ লাখ প্রেগনেন্সি হয়েছে গত বছরে।"

মামা বললো, "ওসব ব্যাপারে ইন্ডিয়ার কিছু শেখার নেই, ওই একই সময়ে তিন কোটি ভারতবাসীকে গর্ভে ধারণ করেছেন ভারতবর্ষের মায়েরা।"

রূপসীকে মালপত্র সমেত গাড়িতে তুললো মামা। রূপসী জিজ্ঞেস করলো, "তোমাদের এখানে নতুন একটা হোটেল হয়েছে—তাজ বেঙ্গল ?"

"হয়েছে, রূপসী। অনেক চেষ্টা-চরিত্তির পর। সর্বহারার নেতারা ওই পাঁচতারার জন্যে খুব ফাইট দিয়েছেন। আরও ফাইট দেবেন ওঁরা ক্যালকাটাকে তারায়

তারায় ভরিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু মাই ডিয়ার ভাগ্নী, তুমি ওসব জিজ্ঞেস করছো কেন? আমরা জানি, তোমাদের দস্ত থলিকায় ট্রাভেলার্স চেক থাকে, ক্রেডিট কার্ড থাকে—হোটেলে নগদ পয়সাও চাইবে না, বরং ডবল খাতির করবে। কিন্তু মনে রেখো, তোমার স্থায়ী ঠিকানা 'তাজু বেঙ্গল অ্যান্ড নট তাজ বেঙ্গল'। তাজুদি এখন নেই, কিন্তু তাঁর সুযোগ্য ভাই রয়েছে, যে অ্যাজ গুড অ্যাজ তাজুদির মায়ের পেটের ভাই।"

রূপসীর মুখে দীর্ঘ বিমানযাত্রার পরেও চাপা হাসি ফুটে উঠেছে। মামা বলেছে, "স্বয়ং রামপ্রসাদ বলে গিয়েছেন, কুমাতা যদি বা হয়, কুমামা কভু না হয়!"

মামা সত্যিই ভালবাসে রূপসীকে। বললো, "এই মার্কিনী স্পিরিট আমার ভাল লাগে। ক্যালকাটা থ্রি হানড্রেড চলছে—চলো কলকাতা, এখনই। একি প্রেসিডেন্টের ভ্রমণ যে ছ'মাস আগে থেকে আমলারা সব কিছু প্ল্যান করবে! উঠলো বাই তো ক্যালকাটা যাই, কেন হবে না?"

মামা নিজের বাড়িতেই হাজির করেছে রূপসীকে। রূপসী যদি চায়, এখনই টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেবে তাজুদিকে। "তাজুদি হনিমুন কাট করে পরের ট্রেনে যদি ফিরে না আসেন তা হলে অন্য মামা দেখো।"

রূপসী অত ব্যস্ত নয়—ওরা বিলম্বিত হনিমুনে গিয়েছে বিবাহের চল্লিশ বছর পরে—ওদের জ্বালাতন করে লাভ নেই।

যতদিন ইচ্ছে থাকা যায় মামার কাছে। তাজ বেঙ্গলে থাকাটাও আয়ত্তের বাইরে নয়। ডলারের দেশ থেকে আসার এই এক মস্ত সুবিধে। সতেরো-আঠারো দিয়ে টাকাকে ভাগ করলে এখানকার অন্য কোনো খরচকেই তেমন বেশি মনে হয় না।

হোটেল ছাড়াও পথ আছে। মায়ের ফ্ল্যাটের চাবি মামার কাছেই রয়েছে। সাউথ ক্যালকাটায় গিয়ে ওখানে থাকা যায়। মা ফিরে এসে মেয়েকে দেখে অবাক হয়ে যাবেন।

কিন্তু মামার একটাই চিন্তা। ওখানে রান্নার লোক ছুটিতে গিয়েছে।

রূপসী হাসলো। মামা ভুলে যাচ্ছে, সে-রূপসী নেই। এদেশে থাকার সময় ওসব চিন্তা ছিল। মা, রান্নার মাসীমা, কাজের লোক মোক্ষদা, জমাদারনী বিমলা এসব ছাড়া জীবন অকল্পনীয় ছিল। এখন আপনা হাত জগন্নাথ—এই রূপসীই মা মাসীমা মোক্ষদা বিমলা কমবাইনড—প্লাস আরও কিছু। কারণ রূপসী সোফার। রূপসী নাপতেনীও বটে। স্বামীর চুল প্রত্যেক পনরো দিন অন্তর মেয়েদেরই কাটতে হয়। যদিও ওকাজটা রূপসী ইচ্ছে করেই গত দেড় মাস ধরে করেনি। ঘরের এতো কাজ করেও রূপসী শ্রেফ গৃহবধূ নয়—নিজেও

রোজগার করেছে। রোজগারের আগে দুনিয়ার সেরা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে লড়াই করে পরীক্ষা দিয়েছে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে—এবং সবাই জানে রূপসী খারাপ ফল করেনি।

এখানে থাকতে থাকতেই রূপসীর খেয়াল চেপেছিল সে বিদেশে যাবে। কেন যাবে, গিয়ে কী হবে, তারপর কী হবে, এসব ভাবেনি রূপসী। সবাই যেতে চায়, ঐটাই যাওয়া, যাদবপুরের ছাত্রী রূপসীও যেতে চেয়েছিল।

তাজুদি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। ফুল্লরা মাসীমার বড় মেয়ে তখন আমেরিকান সায়েব বিয়ে করেছে। লিন্ডসে দা-কে নিয়ে পরিবারে নানা গুঞ্জন। তাজুদি বলেছিলেন, "শেষে ফুলির মেয়ের মতন কিছু হয়ে বসুক।"

রূপসী তার মামাকে উকিল খাড়া করেছিল। "তাজুদি, হবার হলে মানুষ বাথটবেও ডুবে মরে, সমুদ্রে যেতে হয় না। তুমি ভুলে যাচ্ছো, সুবর্ণরেখা প্রথমে আমেকিরায় হয়নি—এই যাদবপুরেই তাদের প্রথম দেখা লিণ্ডসে বাবাজীবনের সঙ্গে।"

"তুই গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর, সায়েব বিয়ে করবি না," তাজুদি কাতর আবেদন করেছিলেন।

"বিয়েই করছি না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। বিয়ে করবার জন্যে কেউ স্কলারশিপ যোগাড় করে না—করে পড়াশোনার জন্যে।"

মামা বলেছে, "আজেবাজে সায়েব বিয়ে করবে কেন? রূপসীর একটা রুচি আছে—যার তার ভাগ্নী সে নয়।"

সায়েবের সঙ্গে বিয়ে হয়নি রূপসীর। কিন্তু মার্কিন ক্যামপ্যাসে আলাপ হয়েছে অনুরাগ দেশাই-এর সঙ্গে। ব্রাইট, বোল্ড, গুজরাতি যুবক। ওদের পরিবারের সঙ্গে গুরুদেবের শান্তিনিকেতনের কী সব সম্পর্ক ছিল। পারিবারে বাংলার চর্চাও ছিল কিছু-কিছু।

অনুরাগ দেশাই এক সময় ভবানীপুরেও বসবাস করেছে। ফলে তার বাংলা সম্পর্কে জ্ঞান কম নয়।

এই অনুরাগের সঙ্গেই রূপসীর অনুরাগ। আত্মীয়স্বজন কী বলবে এ নিয়ে তাজুদির প্রথমে দ্বিধা ছিল। কিন্তু রূপসীর মামা মনোবল দিলো—"গুজরাতি বাঙালী তো পাল্টি ঘর। খুব মিশ খায়, তাজুদি। আপনি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর ডক্টর আই জি প্যাটেলকে দেখুন—বাঙালী বউয়ের কথায় উঠছেন বসছেন। আপনি কবি সুধীন দত্তর স্ত্রী রাজেশ্বরীর রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনুন—পনরো কোটি বাঙালী লজ্জা পেয়ে যাবে, এমন উচ্চারণ, এমন নিষ্ঠা, এমন সাধনা বাংলা গানে।"

রূপসীর বাবার তখন অন্য চিন্তা। "গুজরাতিরা ভেজিটেরিয়ান হয়—মেয়েটার প্রোটিন খাওয়ার কী হবে?" তখন তাজুদি অনেকটা মনস্থির করে ফেলেছেন। স্বামীকে

এক দাবড়ি লাগালেন, "নিজের বউকে হপ্তায় ক'দিন মাছ গাইয়ে রেখেছো ? বাঙালী স্বামীদের আর্থিক মুরোদ কত !"

জামাইদা তখন বেগতিক দেখে বাংলা ও গুজরাতের যৌথ ইতিহাস খোঁজখবর করছেন। "রবি ঠাকুরকে তো মহাত্মা গান্ধীই গুরুদেব বানিয়েছিলেন। দু'জনের মধ্যে খুব টান ছিল।"

রূপসীর বিয়ে কলকাতাতেই হয়েছিল। মামা রসিকতা করেছিল, "খুব সাবধান তাজুদি, জামাইকে কখনও বুঁদিয়া আনতে বলবেন না। আমেদাবাদে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের এক সন্ন্যাসী খুব বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন উৎসবে বুঁদিয়া অর্ডার দিয়ে। বোঁদের বদলে এলো ঝুড়ি ঝুড়ি গোবরের ঘুঁটে। মিষ্টান্নের ব্যাপারে গুজরাতিরা একটু বেরসিক অন্তত বাঙালীদের তুলনায়।"

বিয়ের পর তাজুদি খুশি—অর্থাৎ কি না বেজায় খুশি। নিজের আনন্দ চেপে রাখতে পারছিলেন না। "কী সুন্দর বাংলা বলে ! কার সাধ্য বলে পাল্টি ঘরের জামাই নয় শুধু ওই নামটুকু ছাড়া। আমাদের মোক্ষদা তো ঠিক না বুঝে দেশলাই দেশলাই করছে !"

তাজুদি আরও গর্ব করেছিলেন, "জামাই আমার স্কলার মানুষ। বিদেশের অমুক বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট করেছে। আবার সেই সঙ্গে বাড়তি পড়েছে দর্শন। সাত রাজার ধন এমন মানিক আমি কোথায় পেতাম ? স্বীকার করছি, আমার মেয়েও কম যায় না। সে-ও ডক্টরেট না করলেও পড়াশোনা ভাল করেছে, গড়ন-পিঠন খুব ভাল, লম্বাও বটে। কিন্তু রঙ তো দুধে-আলতায় নয়, একটু চাপা। সে তুলনায় আমার জামায়ের রঙ মাখনের মতন।"

মামা রসিকতা করেছে, "রূপে গুণে সায়েব, স্বভাবে বাঙালী, এমন জিনিস গুজরাত ছাড়া এ যুগে কোথাও পাবে না, তাজুদি। তুমি ভাগ্যবতী।"

"তোমরা সবাই আশীর্বাদ করো, বেঁচেবত্তে থাকুক।" তাজুদি সবাইকে বলেছিলেন একটু চাপা গর্বের সঙ্গেই।

দীর্ঘ বিমানযাত্রার শেষে মামার বাড়ি পৌঁছে, কিছু খেয়ে রূপসী বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছিল।

পাখাটা জোরে চালিয়ে দিয়ে মামা বলেছিল, "এয়ারকুলার নেই, তোর একটু কষ্ট হবে।" কাঠের জানালাগুলো টেনে দিয়েছিল যাতে আলো না আসে। মামা বলেছিল, "যতক্ষণ খুশি বিশ্রাম নে—ঘুমই হচ্ছে জেট-ফ্যাটিগের শ্রেষ্ঠ ওষুধ। যখন যা খাবার ইচ্ছে হবে আমাকে ডাক দিস।"

অনেক দিন পরে রূপসী অন্য এক ধরনের সুখ ও নিরাপত্তা অনুভব করছে। এখানে কিছু করতে হবে না নিজের হাতে, যত কষ্টই থাক মামার বাড়িতে সব ক

নিঃশব্দে হয়ে যাবে। তেমন হলে, মামা নিজেই হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করবে। ভাগ্নীদের খুব ভালবাসে মামা। বলে, "ভাগ্নে যখন হয়নি তখন ভাগ্নীদের মধ্যেই তো মামার প্রকাশ ও বিকাশ।"

চোখ বন্ধ করে, টান-টান হয়ে শুয়েছে রূপসী। গরম তেমন নেই—কিন্তু এই ভিজে গরমের সঙ্গে শরীরের অনেক দিন সম্পর্ক ছিল না। ব্লাউজের বগল ভিজে যায়, নাইলন এদেশে অচল হওয়া উচিত—কিন্তু পৃথিবীর যত নাইলন সব যে এদেশের দিকে ছুটছে।

রূপসীকে মামা একটু বিপদে ফেলে দিয়েছিল। বলছিল, "জোড়ে ভ্রমণ হলে আরও আনন্দের কারণ হতো। কিন্তু প্রয়োজনে অর্ধেক পেয়েই পণ্ডিতরা খুশি।"

অনুরাগের খোঁজখবর করেছিল মামা কিন্তু প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চাইছিল রূপসী। মামার তো সব সময় রসিকতা। আমেরিকানদের সম্বন্ধে খোঁজখবর করার মানে হয় না—ওখানে তো গুণী লোকের ভাল থেকে আরও ভাল আরও ভাল হয়। ভাল হওয়ার শেষ নেই বলেই তো দেশটা ওইভাবে এগিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর সব দেশের লোকদের বুকে জ্বালা ধরিয়ে।

মামা জিজ্ঞেস করেছিল, আমেরিকায় একটা খবর পাঠিয়ে দিতে হবে কি না। রূপসী চুপ করে থাকায় মামা ভুল বুঝলো। ক্ষমা চেয়ে বললো, "ওহো, আমার খেয়ালই থাকে না, টেলিগ্রাম ওদেশে অচল হয়ে গিয়েছে। একটা ফোন করো—লজ্জার কিছু নেই। মামা গরীব হলেও একটা আন্তর্জাতিক ফোন বিল-এর ধাক্কা সইতে পারবে।"

রূপসী এড়িয়ে গেল—বললো, "ও ওখানে নেই, ওহায়ো স্টেট-এর কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

রূপসীর মনে পড়লো, বিয়ের পরে অনুরাগ আগে কলকাতা থেকে বিদেশে ফিরে গিয়েছিল। তখন ওকে ফোন করবার জন্যে কী পাগলামি ! খেয়ালই নেই টেলিফোন ধরে কত সময় কেটে যাচ্ছে। মায়ের বিল এসেছিল, সতেরো হাজার টাকা। ভীষণ লজ্জা লেগেছিল। মা কিন্তু খুশি হয়েছিলেন। "আমরা গরীব। কিন্তু ওই ছেলে তো পণ নেয়নি। সতেরো হাজার টাকায় অনুরাগকে তো আমরা পেতাম না।"

"পণ-ফন ওসব ইতিহাসের ডাস্টবিনে চলে গিয়েছে মা। এখন হামভি মিলিটারি তুমভি মিলিটারি। বিয়ে করে কাউকে ধন্য করে দিচ্ছো না।"

তাজুদি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেননি। কারণ দুষ্টু লোকরা তাঁদের সমালোচনা করেছে—কায়দা করে খরচাপাতি না করেই হুমদো হুমদো দুটো মেয়েকে পার করে দিলো তাজুগিন্নি।

মায়ের শূন্য ফ্ল্যাটেই চলে এসেছে রূপসী। জেট-ক্লান্তি কাটিয়েই মামার বাড়ি থেকে বিদায় নিয়েছে রূপসী, মামার হাজার অনুরোধ সত্ত্বেও।

রূপসীর মনে হয়েছে এইভাবে একলা থাকাটাই এই মুহূর্তে তার পক্ষে ভাল হবে। বিদেশে থেকে-থেকে কোন সময়ে প্রাইভেসির ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে রূপসী। যখন মানসিক সঙ্কট চলেছে তখন মনে হচ্ছিল আপনজনের কাছে গিয়ে বুকটা হাল্কা করাই ভাল। অথচ জেট প্লেনে এতো দূরে এসে মনে হচ্ছে, আপনজনেরা কাছাকাছি থাকুক, কিন্তু তারা যেন যখন তখন মনের অন্দরমহলে ঢুকতে না চায়।

রূপসীকে মোকাবিলা করতে হবে নিজের সঙ্গে। অনুরাগের সঙ্গে সম্পর্কটা যে এইরকম অবস্থায় এসে পৌঁছবে তা কল্পনা করা যায়নি।

কে একজন লিখেছিল, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর-অন্তর মেয়েরা পাল্টে যায়—আদর্শ স্বামীরা এই নতুন রমণীটিকে নতুনভাবে আবিষ্কারের উল্লাস উপভোগ করেন। পুরুষরাও পাল্টায়—পাঁচ বছর আগেকার সেই অনুরাগ আর আজকের অনুরাগ দেশাই কোনোক্রমেই এক নয়।

ক্যামপাসের পি-এইচ-ডি স্কলার অনুরাগ, যাকে রূপসী পছন্দ করেছিল, সে অন্য মানুষ ছিল। সেই অনুরাগ একদিন রবীন্দ্রনাথের উর্বশী কবিতা নির্ভুল আবৃত্তি করে রূপসীকে অবাক করে দিয়েছিল। বিস্ময় প্রকাশ করতে দেখে অনুরাগ উল্টো আক্রমণ করেছিল—রবীন্দ্রনাথ যে একমাত্র বাঙালীদের সম্পত্তি তা তো কোথাও লেখা নেই। আমার মা আমেদাবাদে মাস্টার রেখে বিয়াল্লিশখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছিলেন। আমার বাবা আমেদাবাদে রক্তকরবী স্টেজ করিয়েছিলেন, নিজে অভিনয়ও করেছিলেন। ক্যামপাসে বাঙালী নেহাত কম ছিল না, কিন্তু অনুরাগ দেশাইয়ের কাছে তাদের রবীন্দ্রসাহিত্যজ্ঞান অতি সামান্য।

অনুরাগের হিরো পঙ্কজ মল্লিক—তাঁর গানের ক্যাসেট আমেদাবাদ থেকে আমেরিকায় গিয়েছিল। অনুরাগ ইচ্ছে করেই রূপসীকে চটিয়ে দিয়েছিল। এই প্রথম একজন বাঙালী মেয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল যে পঁচিশখানার কম রবীন্দ্রসঙ্গীত জানে।

রূপসী রাগ দেখিয়েছিল। প্রত্যেক বাঙালী মেয়েকেই গাদা গাদা গান মুখস্থ করে মোবাইল গীতবিতান হয়ে ঘুরতে হবে এমন দিব্যি তো রবীন্দ্রনাথ দিয়ে যাননি।

"আমি রবীন্দ্রনাথ অপছন্দ করি না, কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত না-শিখলে জীবন অসম্পূর্ণ তা বিশ্বাস করি না। আমার ফার্স্ট লাভ আমার নিজস্ব বিষয়, যা পড়তে এদেশে এসেছি, সেকেণ্ড লাভ ফিলজফি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দর্শন আমার ভাল লাগে। ওই দর্শনের আলোকে রবীন্দ্রনাথ আমার মন্দ লাগে না।"

এই সময়েই সেই বিখ্যাত রসিকতা হয়েছিল। ক্যামপাসের পরিচিতরা জানতো না কার মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্যে অনুরাগ দেশাই দর্শনের বাড়তি

ক্লাশে জয়েন করেছে। রূপসীও ব্যাপারটা বুঝে ওই বিষয়ে অনুরাগের সহপাঠিনী হয়েছে। মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই এক মস্ত সুবিধে--কত রকমের জ্ঞানান্বেষণের সুযোগ রয়েছে। ফিজিক্সের ছাত্র কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে পড়ছে ল্যাটিন, অর্থনীতির ছাত্র শিক্ষা নিচ্ছে ব্যাবিলনের সভ্যতা সম্পর্কে। কমপিউটরের গবেষক নিচ্ছে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের পাঠ।

ওদের দু'জনকে দর্শনশাস্ত্রে ডগমগ দেখে বিজনেস ম্যানেজমেন্টের ছাত্র শুভজিৎ ব্যঙ্গ করেছিল—পুরনো কথা আছে, ফিলজফি বেক্‌স্ নো ব্রেড! দর্শনে রুটি তৈরি হয় না।

রূপসী এর উত্তর জানতো না। বলতে যাচ্ছিল, একমাত্র রুটি খেয়েই মানুষ বেঁচে থাকে না, মনের খোরাকও চাই।

কিন্তু অনুরাগ তাকে রক্ষা করেছিল তার শাণিত বুদ্ধির দীপ্তিতে। সে বলেছিল, "ভাই শুভজিৎ, জেনে রেখো, দর্শন ছাড়া পৃথিবীর কোনো ব্রেডই তৈরি হতো না। কারণ রুটি তৈরির আগেই আদৌ বেঁচে থাকার প্রয়োজন আছে কি না এই দার্শনিক সিদ্ধান্ত মানুষকে নিতে হয়েছে। রুটিওয়ালা হয়তো সোজাসুজি ঠিক এইভাবে জীবনের প্রশ্নটার মুখোমুখি হয় নি, কিন্তু দর্শন চেষ্টা করে সেইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে রাখতে যা সাধারণ মানুষকে বিশেষ কোনো মুহূর্তে উদ্বেল করে তোলে।"

অনুরাগ সেদিনই বলেছিল, "বিজনেস ম্যানেজমেন্টের মুশকিলই হলো ব্যবসায়ীর কাজের জন্য দাম দিতে চাইলেও চিন্তার জন্যে দাম দেবার উৎসাহ দেখায় না।"

সেদিনই অনুরাগকে স্বামী হিসেবে পাবার ইচ্ছে হয় রূপসীর। যদিও বিয়ের পর দু'জনেই চেষ্টা করেছে বার করতে কে আগে অপরকে ভালবাসতে আরম্ভ করেছিল।

সেইসময় রূপসীর লেখক মামা আমেরিকায় উপস্থিত ছিল। মামা রসিকতা করেছিল, "বিজনেস ম্যানেজমেন্টের ছাত্র হলে তোমাদের এই সমস্যা হতো না। হেনরি ফোর্ড নোট করে গিয়েছেন, ভাবী স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের তিরিশ মিনিট পরেই তিনি বুঝতে পারলেন এই মেয়েটি তাঁর জীবনসঙ্গিনী হবার যোগ্য। লাইক মাইনডেড পার্সন—সমমানসিকতার মানুষ। যেমন তোমরা। তোমরা প্রেমে গদগদ হয়ে সারাক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নেই—একই সঙ্গে তোমরা দু'জনে কোনো এক ধ্রুবর দিকে তাকিয়ে আছো?"

অনুরাগ তখনই ফাঁস করলো, হেনরি ফোর্ড হেরে গিয়েছেন। রূপসী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে তার লেগেছিল মাত্র ১৮ মিনিট। প্রথম সাক্ষাতে কী তার চোখে মায়া অঞ্জন লাগিয়ে দিয়েছিল অনুরাগ দেশাই তা প্রথমে গোপন রেখেছিল। রূপসীর শরীর? তার ব্যক্তিত্ব? তার কথা বলার ভঙ্গী? তার হাসি?

শরীর বললে, প্রথমে সুখ হতো রূপসীর, কিন্তু পরে নিরাপত্তা বোধ করতো না। মেয়েদের শরীর পারফিউমের গন্ধের মতন—একটু অসাবধানী হলেই উবে যায়। তখন তো দেহের ভালবাসা টেকে না। আসলে, রূপসী পছন্দ করবে একটা প্যাকেজ—রূপ, যৌবন, ব্যক্তিত্ব, মানসিকতা সব কিছু নিয়ে মিক্স্‌ড গ্রীল। কিন্তু এবার এতোদিন পরে অনুরাগ যা ফাঁস করেছে তা ভীষণ ধাক্কা দিয়েছে।

রূপসী তো যখন প্রথম অনুরাগকে ভেট করেছিল তখন বেশবাসের উগ্রতা রাখেনি। রূপসী সেদিন তো জিন্‌স্‌ পরে নি—পরেছিল একটা দিশী তাঁতের শাড়ি। মার্কিন পরিবেশে যদিও ওটা বিলাসিতা। কারণ কাপড় কাচা কঠিন কাজ—তাঁতের শাড়ি ধোলাই ও ইস্ত্রি করবার জন্যে বিলিতি ওয়াশিং মেশিনগুলো আবিস্কৃত হয়নি। এবার উত্তেজনার মাথায় কথাটা অনুরাগ ফাঁস করে দিলো।

কী একটা ফিগার ঢোকাচ্ছিল ওর ব্যক্তিগত কমপিউটার যন্ত্রে যার ডাক নাম পি-সি। সেইটা 'কি' করতে-করতে অনুরাগ বললো, "আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল তোমার হিসেববোধ। ক্যামপাস লনে বসে যখন তুমি বললে, দুটো কোক কিনে লাভ নেই। একটা কিনে ভাগ করে নেওয়া যাক। লেটস্‌ স্পিল্ট এ কোক। আমি বঝলাম, এ মেয়ে অপচয়, নষ্ট পছন্দ করে না। এ মেয়ে সংসারের লক্ষ্মী হবে।"

আঁতকে উঠেছিল রূপসী। এ জানলে সে বড় একটা কোক নিয়ে, এক সিপ আস্বাদ করে, বাকিটা গার্বেজ টিনে ফেলে দিতো। আদিম গুজরাতি মনোবৃত্তি নিয়ে আদিম সম্পর্কের ভিত্তিভূমি রচনা হয়েছে, এটা ভাল কথা নয়।

কিন্তু সঙ্গীত, দর্শন, চিত্রকলা এসব তো মিথ্যা মুখোস ছিল না অনুরাগের। ক্লিভল্যাণ্ডের মিউজিয়ামে গিয়ে ভারতীয় চিত্রকলা সম্পর্কে কত সুন্দর কথা বলেছে অনুরাগ। ওর এক মামা শান্তিনিকেতনের কলাভবনে অনেকদিন নন্দলালের সঙ্গে কাজ করেছেন। বেঙ্গল স্কুলের ছবি ভাল লাগতো না রূপসীর—প্রেমপর্বে অনুরাগই ওকে শিখিয়েছিল কী করে অবন-গগন-নন্দলালের ছবি তারিফ করতে হয়। তারপরেই হয়তো ঘড়ি দেখেছে অনুরাগ। রাতে ল্যাবরেটরিতে কাজ রয়েছে। সময় নষ্ট করেনি কৃতী ছাত্র অনুরাগ দেশাই।

সেই অনুরাগের সঙ্গে কয়েকটা ঘন্টা যেন কয়েকটা মিনিট মনে হতো। এমন লোকের সঙ্গে সারাজীবনটাই ক্লান্তিবিহীনভাবে কেটে যেতে বাধ্য।

কিন্তু এমন পরিণতি হবে কে জানতো ! অনুরাগ এবার নিশ্চয় বুঝেছিল অবস্থাটা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। রূপসীর ধৈর্য এবার শেষ হতে পারে। কিন্তু সে তখনও ব্যাপারটা তোয়াক্কা করলো না। রাত্রে বিছানার পাশে রাখা কমপিউটারকে কীসব নির্দেশ দিতে লাগলো।

মামা সরল মনে জিজ্ঞেস করেছিল, "হ্যাঁরে, সব ভাল তো? অনুরাগ কেমন আছে?"

"অনুরাগ আছে মাইনাস হিজ অনুরাগ।" রূপসীর এই কথা মামা রসিকতা হিসেবে নিয়েছিল।

মামা বলেছিল, "তুই চলে আয় আমাদের এই লাইনে।"

অনুরাগ যে ভীষণ সফল তা মামা খবর পেয়েছে। কিন্তু কিসে সফল তা মামা জানে না। মামা আরও জানে, আমেরিকায় ভীষণ সাফল্য কিছু চিন্তা আনে—পুরনো ব সম্পর্ক একঘেয়ে মনে হয়, নতুন অনুরাগ জন্মায়।

অন্য কোনো মেয়ের প্রতি অনুরাগ জন্মালে জন্মাবে! অন্তত প্রমাণ হবে মানুষটা এখনও রক্তেমাংসে গড়া, একটা কারও জন্যে কিছুটা সময় দিচ্ছে, একটা কারও কাছে াক্ষিণ্য পাবার তৃষ্ণা রয়েছে শরীরে। কিন্তু এই অনুরাগ একেবারে আলাদা—সে রারোগ্য নেশার শিকার হয়েছে।

এই কথা শুনলে মামা পর্যন্ত ভীষণ চিন্তিত হবে। মা তো পা ছড়িয়ে কাঁদতে ুরু করবেন। ওদেশে অনেকে প্রথম বয়সের ধাক্কা কাটিয়ে দ্বিতীয় পর্বে মদ কিংবা াগের খপ্পরে পড়ছে। অনুরাগ কী মাত্রাহীন হুইস্কি সেবন করছে?

রূপসী মিথ্যে কথা বলবে না। "আমরা ধোয়া তুলসীপাতা নই, মামা। আমরা বরকম ড্রিংকসের স্বাদ জানি—কিন্তু এখনও ড্রিংকস আমাদের স্বাদ পায়নি। আমরা াড়িতে ওসব হাঙ্গামা রাখি না। যদি অনুরাগ প্রত্যহ একটু ড্রিংক নিয়ে বসতো, ব ভুলে গিয়ে রূপসীকে একটু সান্নিধ্য দিতো, তা হলে আপত্তি ছিল না। কিন্তু তার পদ আরও বেশী।"

রূপসী এবার কিছু চেপে রাখেনি। মামাকে বলেছে, "তোমার জামাই এখন জ্ঞানিক গবেষণার কাজে ইস্তফা দিয়েছে। তুমি এখন আর একজন রিসার্চ য়েনটিস্টের মামাশ্বশুর নও।"

অনুরাগের চাকরি গিয়েছে ভেবে মামা আঁতকে উঠলো।

"চাকরি যায়নি, মামা। ও ছেড়ে দিয়েছে।"

"পলিটিক্স! কর্মক্ষেত্রের পলিটিক্স এমন হয় যে মানুষ কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য য়।" অভিজ্ঞ মামা বলে উঠলেন।

তাও হয়নি অনুরাগের ক্ষেত্রে। ওকে ল্যাবরেটরি থেকে না যেতে অনুরোধ রেছিল, তবু ছেড়েছে।

মামা হয়তো ভাবছে, ল্যাবে কোনো মেয়ের সঙ্গে আকস্মিকভাবে একটু-আধটু ড়িয়ে পড়া। কিন্তু ওসব কিস্সু নয়। স্রেফ টাকা! রূপাইয়া! ইউ এস গ্রীনব্যাক! র্থাৎ ডলার।

"আমেরিকান হাওয়া লেগেছে গুজরাতি মনে। যেখানে বেশী টাকা সেই প্রতিষ্ঠানে মানুষ তো যাবেই।" মামার ভাষ্য।

"কিংবা গুজরাতি হাওয়া এখন আমেরিকায় লেগেছে", রূপসী এবার একটু তিক্ত

মামারও দোষ আছে। সেবার ক্লিভল্যাণ্ডে বেড়াতে গিয়ে বললো, আর্ট মিউজিয়াম দেখবে না, দেখবে রকিফেলারের আদি কীর্তিভূমি। ৩২ নম্বর রিভার স্ট্রীট ক্লিভল্যাণ্ড—যেখানে জন ডি রকিফেলার একজন ইংরেজ সায়েব মরিস ক্লার্কের সঙ্গে ছোট্ট একটা দোকান খুলেছিলেন। সেই রকিফেলার যিনি ছোট্ট একটা দোকান থেকে শুরু করে যথাসময়ে বিশ্বের এক নম্বর ধনী হয়েছিলেন—আমেরিকার পয়লা নম্বর মিলিয়নিয়ার।

অনুরাগ এসব খোঁজখবর রাখতো না। রকিফেলার এখনও আমেরিকান হিরো নয়। কিন্তু বই পড়ে দূর থেকে ইণ্ডিয়ানরা ব্যাপারটা বুঝতে পারে না, ভাবে আমেরিকানরা ওদের বড়লোকদের পূজো করে। মামা যাবার সময় রকিফেলারের জীবন সম্পর্কে একখানা বই অনুরাগকে উপহার দিয়ে গেল।

মামা তো চলে গেল এবং রকিফেলারের জীবনীটা অনুরাগের মাথায় ঢুকে গেল। কী করে বড়লোক হওয়া যায় এইসব বই নিয়ে বুঁদ হয়ে বসলো। রকিফেলারের জীবন ওর ভীষণ ভাল লেগে গিয়েছে। "গুজরাতিরা তো ওই সবই পছন্দ করবে—রকিফেলার, কার্নেগি, ফোর্ড এট্‌সেটরা ; থরো, এমারসন, মার্টিন লুথারকিং এসব নিয়ে কোনো কৌতূহল নেই।"

"রকিফেলার বলতে আমাদের কলকাতার রকে বসা আড্ডাবাজ বেকার বোঝায়।" স্ত্রীর কথাটা অনুরাগ কানে নিল না। "ভদ্রলোক সাত বছর বয়স থেকে টাকা সম্পর্কে মাথা খাটিয়েছেন। সংসারে ফাইফরমাশ খাটলে বালক বয়সে সিকি আধুলি যা পেতো সব একটা ভাঁড়ে জমা রাখতো জন ডি রকিফেলার। যখন দশ বছর বয়স তখন একটা লোক জনের বাবার কাছে এসে বললো, আমার পঞ্চাশ ডলার ধার দরকার। সাড়ে সাত পার্সেন্ট সুদ দেবো। বাবা বললেন, তোমার দরকার বুঝছি, কিন্তু আমার কাছে টাকাটা নেই। দশ বছরের ছেলে দরজার আড়াল থেকে ওদের কথা শুনছিল। হঠাৎ বেরিয়ে এসে সে জিজ্ঞেস করলো, কাকু, সুদ কী জিনিস? পাড়ার কাকু সস্নেহে বোঝালেন, কেউ যদি তার নিজের টাকা অন্যকে দেয় ... হলে তাকে ধন্যবাদ হিসাবে এক বছরে প্রতি একশো ডলারে সাত ডলার দিতে হয়, এর নাম সুদ।"

"কবে এই সুদ পাওয়া যাবে?"

"ঠিক একবছর পরে।"

"কতদিন পাওয়া যাবে?"

"যতদিন না টাকাটা শোধ হচ্ছে।"

"আমার কাছে পঞ্চাশ ডলার আছে, তোমায় এনে দিচ্ছি। তুমি আমাকে তিন ডলার পঁচাত্তর সেন্ট সুদ দেবে?"

"কোথায় এই টাকা পেলে?"

"খেটে রোজগার করেছি. জমিয়েছি ভাঁড়ে।"

সেই আরম্ভ হলো দশ বছরের ছেলের বিশ্বজয়—রকিফেলার ডলারকে কখনও কুড়েমি করতে দেননি, ডলারকে খাটিয়েছেন তাঁর নিজের জন্য।

রকিফেলার-এর ভূত অনুরাগের ঘাড়ে চেপেছে। রূপসী ব্যাপারটা তখনও সিরিয়াসলি নেয়নি। বলেছে. "তুমি, যার ভক্ত সেই রবীন্দ্রনাথ এদেশের অতিমাত্রায় লক্ষ্মীপূজো পছন্দ করেননি।"

রূপসী বলেছে, "রকিফেলারের হচ্ছে সুদখোরের জীবন। তাই ওঁর নিজের লোকরাই ওঁকে অক্টোপাস, অ্যানাকোন্ডা বলে ডাকতো। ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ। হিন্দুরা কখনও সুদ সহ্য করতেন না।"

শেষ কথাটায় একটু কাজ হলো। অনুরাগ নিজেকে একজন আদর্শ হিন্দু বলে মনে করে।

কিন্তু ফল ভাল হলো না। লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করে রূপসীর সঙ্গে সে তর্কে নামলো। অনুরাগের বক্তব্য : রূপসী না-জেনেই তাকে ভুল তথ্য দিয়েছে।

"রকিফেলার শতকরা সাড়ে সাত শতাংশ সুদে সন্তুষ্ট, কিন্তু প্রাচীন হিন্দুদের ধর্মসূত্র অনুযায়ী সুদের হার ছিল ১৫ শতাংশ। বিনা সিকিউরিটিতে সুদের পরিমাণ অনেক বেশী ছিল। স্বয়ং মনুর তালিকা অনুযায়ী দেয় সুদের হার : ব্রাহ্মণ ২৪ শতাংশ, ক্ষত্রিয় ৩৬ শতাংশ, বৈশ্য ৪৮ শতাংশ এবং শূদ্র ৬০ শতাংশ। সমুদ্রযাত্রার ব্যবসায়ে সুদের হার ছিল ২৪৫ শতাংশ। আমাদের পূর্বপুরুষরা সুদ ভালবাসতেন না তা বলা যাবে না। বউ ধার করলে তার দায়দায়িত্ব স্বামীকে নিতে হতো প্রাচীন ভারতে। কিন্তু স্বামীর ঋণের জন্যে মেয়েদের কোনো দায়দায়িত্ব ছিল না।" অনুরাগ রসিকতা করেছিল।

অর্থোপার্জনের জন্য অনুরাগ এবার কিছু ব্যবসা করবেই। গুজরাতে অনেকেরই নাকি একটা 'ধান্দা' থাকে—নিজের কাজের বাইরে আরও একটা কাজ।

"কিন্তু বিজনেসে মূলধন লাগে। আমরা মূলধন কোথায় পাবো? কিছুদিন আগেও তো আমরা ছাত্রছাত্রী ছিলাম।"

স্ত্রীর কথায় অনুরাগ তখনকার মতন ঠাণ্ডা হলেও একেবারে শান্ত হয়নি।

এবারেও মামা ক্ষতি করেছে। দেশ থেকে একখানা সংস্কৃত গল্পের বই পাঠিয়েছিল ভাগ্নীজামাইকে। সেই বই পড়ে অনুরাগ আবার উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

সংস্কৃত বইতে লেখা : "সংযমী পুরুষ অর্থ দ্বারা অর্থ উপার্জন করতে পারে। স্বপ্ন থাকলে, চেষ্টা থাকলে অর্থ ব্যতীত শ্রী লাভ করা যায়। একজন দরিদ্র খবর পেলো বিশাখিল রাজ্যে এক ধনী সদ্বংশজাত দরিদ্রদের অর্থ ধার দেন। সেখানে গিয়ে দেখলো ওই ধনী এক বণিকপুত্রকে ভর্ৎসনা করছেন। মাটিতে পড়ে থাকা ওই মরা ইঁদুর দেখো। কুশলী ব্যক্তি ওর থেকেও পয়সা রোজগার করতে পারে, আর তুমি পয়সা নষ্ট করছো।"

এই কথা শুনে নতুন ছেলেটি বললো, "এই ইঁদুরটি আমি আগাম হিসেবে নিচ্ছি এবং রসিদ লিখে দিচ্ছি।"

তারপর অনুরাগ বই থেকে স্ত্রীকে পড়ে শোনালো : "দুই মুষ্টি ছোলা মূল্যস্বরূপ গ্রহণ করিয়া আমি এক বণিকের নিকট তাহার মার্জারের আহার্য হিসাবে উহা বিক্রয় করিলাম। সেই চানা পিষ্ট করিয়া এবং এক কলসী জল লইয়া আমি নগরীর বহির্দেশে একটি ছায়ানিবিড় চত্বরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অতিশয় ভদ্রতা সহকারে একদল কাঠুরিয়াকে সেই চানা ও জল প্রদান করিলে তাহারা প্রত্যেকে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে দুই খণ্ড করিয়া কাষ্ঠ প্রদান করিল। আমি সেই কাষ্ঠখণ্ডগুলি বিক্রয় করিয়া যে মূল্য পাইলাম তাহার কিয়দংশ ছোলা ক্রয় করিয়া দ্বিতীয় দিবসে আবার কাঠুরিয়াদিগের নিকট হইতে কাষ্ঠখণ্ড সংগ্রহ করিলাম। তিনদিন এইভাবে আমি কাষ্ঠখণ্ড ক্রয় করিলাম। অতঃপর সহসা অতিবৃষ্টিতে কাষ্ঠের অভাব উপস্থিত হইলে আমি ওই কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া বেশ কিছু উপার্জন করিলাম। ওই ধন দ্বারা একটি বিপণী স্থাপন করিয়া বাণিজ্য করিতে-করিতে স্বীয় বুদ্ধিবলে এখন প্রভূত বিত্তশালী হইয়াছি।"

টাকার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে অনুরাগ। টাকাই তার ধ্যানজ্ঞান। গবেষণার কাজ ছেড়ে দিয়ে সে মার্কিনী জমির দালালি শুরু করেছে।

রূপসীর পক্ষে কত বড় অপমান! সে কি করে বাপমায়ের কাছে মুখ দেখাবে?

কিন্তু অনুরাগের যুক্তি : যস্মিন্ দেশে যদাচার! এখানে একজন জিওলজিস্ট মাছ ভাজার লাইসেন্স নিয়ে দোকানে মাছ ভাজছেন পয়সা বেশী বলে। ইতিহাসের অধ্যাপক জীবনবীমার দালাল হলেন স্রেফ পয়সার জন্যে। ডাক্তার নিজের পেশা ছেড়ে জমিজমা নিয়ে মেতেছেন।

এসব যুক্তি মোটেই ভাল লাগেনি রূপসীর। কিন্তু যা হবার তা হয়েছে। এখন অনুরাগ দেশাই দিনরাত পয়সার পেছনে ছুটছে। পয়সাই তার ধ্যানজ্ঞান—সারাদিন কত জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। বাড়িতে এসেও শুধু ফোন করে। তারপর মাঝরাত পর্যন্ত শেয়ারবাজারের খেয়াল।

আজকাল লোকজন দরকার হয় না, শেয়ার ব্রোকাররা বাড়িতেই যন্ত্র বসিয়ে দিয়ে যায়, যাতে গভীর রাতেও কেনাবেচা চলে।

শুক্রবার অনুরাগ কী সব করে। টেলিফোন এবং কমপিউটারে আমেরিকান ডলার পাঠিয়ে দেয় টোকিওতে, ফ্রাঙ্কফুটে, লন্ডনে, প্যারিসে। সোমবার আবার ডলারকে ঘরে ফিরিয়ে আনে। ডলার, ইয়েন, মার্ক, স্টারলিং-এ কীসব ঠোকাঠুকি হয় তা অনুরাগ ভেবেছিল রূপসী বুঝবে, কিন্তু ওই বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

শনিবার-রবিবারও অনুরাগ বেরিয়ে পড়ে জমিজমার খোঁজে—দুশো মাইল দূরে কোথায় বন আছে, পাহাড় আছে যা একদিন জনপদে পরিণত হতে পারে। কেনাবেচা ঠিক সময়ে করলে অনেক অর্থ। এর নাম রিয়েল এস্টেট।

অনুরাগ ভেবেছিল রূপসীও এই ব্যবসার ব্যাপারে আগ্রহ নেবে যেমন নিয়েছিলেন হেনরি ফোর্ডের বউ। না-হলে ১০০ ডলারের মাসমাইনের চাকরি করে বাড়ি ফিরে এসে হেনরি ফোর্ডের পক্ষে নতুন ধরনের মোটর গাড়ি তৈরি করা সম্ভব হতো না।

রূপসীর এসব খুব খারাপ মনে হয়েছে। সে মনে করিয়ে দিয়েছে, "অনুরাগ, তুমি তো আগে এমন ছিলে না।"

"তুমি মনে করছো টাকাই সব। কিন্তু নিউ ইংলন্ডের প্রবাদ কী বলছে দেখো। টাকা সম্বন্ধে ঈশ্বরের মনোভাব কী তা যাঁদের তিনি ধনী করেছেন তাঁদের স্বভাবচরিত্র দেখলেই বুঝতে পারবে।"

অনুরাগ ওসব মন্তব্য তোয়াক্কা করে না। সে চাইছে টাকা, আরও টাকা, আরও টাকা।

অনুরাগ গান ভুলে গিয়েছে, ছবি ভুলে গিয়েছে। নিজের বিজ্ঞান ভুলে গিয়েছে। দর্শন যে একদিন জানতো তাও মনে হয় না।

কমোডিটি বিজনেস নিয়ে এখন পড়াশোনা করছে অনুরাগ—ডাল, ভোজ্যতেল, বীজ, গম, এটসেটরা। শিকাগো গ্রেন মার্কেটের সঙ্গে সারাক্ষণ যোগাযোগ রেখে চলেছে।

অনুরাগ যে টাকার প্রেমে পড়েছে তা মনে থাকছে না।

টাকা নিয়ে কী হবে? অনুরাগ কেন দেখছে না, এদেশের মানুষ টাকা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা হারাচ্ছে। রূপসী অ্যাগাসিজ-এর সেই বিখ্যাত উক্তিটা তার স্বামীকে দেখিয়েছে। একটা সামান্য কাজের জন্যে অনেক ডলার প্রস্তাব করায় ভদ্রলোক সোজা বলেছিলেন, আমার এতো সময় নেই যে ডলার কামাবার জন্যে সময় অপচয় করবো।

রূপসী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। টাকা সম্বন্ধে এই নির্লজ্জ লোভ তার নেই। অনুরাগ ওর কথা কানে নেয়নি। রূপসী আরও চটেছে। জাতের কথা মনে পড়েছে। গুজরাতি বেনেদের সঙ্গে বাঙালী ব্রাহ্মণের ওই তফাত। টাকা হি জীবনম্ নয়।

টাকা সম্বন্ধে একটা বিচিত্র অনীহা ঘিরে ধরেছে রূপসীকে। টাকা নিয়ে চিবিয়ে খাবে নাকি ? একটা লোক ক্রমশ টাকার কাদার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। কে তাকে বাঁচাবে ?

"অনুরাগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই দিনগুলো ভুলে গেলে কেমন করে ? তখন সাচ্ছল্য ছিল না, একটা কেক দু'জনে ভাগ করে খেয়েছি, কিন্তু তখন পৃথিবী অনেক সবুজ ছিল।"

রূপসী অনেক ইঙ্গিত দিয়েছে। বিজনেসের বাইরে একটা সুন্দর জীবন আছে। অর্থই এই পৃথিবীকে চলমান রাখেনি। পৃথিবীর যা কিছু সেরা তা আজও বিনামূল্যে পাওয়া যায়। কিন্তু কে শোনে ওইসব কথা ?

অবশেষে নিরুপায় হয়ে রূপসী দেশে চলে এসেছে। মানুষটা সম্বন্ধে তার বিশ্বাস ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। টাকার স্লট মেশিন বিয়ে করে এই পৃথিবীতে কেউ আনন্দ পায় না।

রূপসী হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছে চলে আসার। টেলিফোনে ট্রাভেল এজেন্টকে ফোন করেছে। সেদিনই এয়ারপোর্টে টিকিট ডেলিভারি নিয়েছে। ভাগ্যে পাশপোর্টখানা ইন্ডিয়ান, ভিসার হাঙ্গামা নেই নিজের জন্মভূমিতে ফিরতে।

অনুরাগ বিজনেসের সুবিধের জন্যে পাশপোর্ট বদল করছে। ও করুক, রূপসী করবে না। টাকার ওপর ওই রকম ভালবাসা নেই কলকাতায়। ওখানেই ফিরে যাচ্ছে রূপসী। একটা চিঠি লিখে এসেছে রূপসী। "টাকা এমনই এক রূপসী যে অন্য রূপসীকে সহ্য করতে পারে না। তুমি তোমার ডলারপ্রেম চালিয়ে যাও, আমি আপাতত ঘুরে আসি সেখান থেকে যেখানে টাকার অক্টোপাস বাঁধন নেই—মানুষ যেখানে টাকার রেশমী ফাঁসে স্বেচ্ছাবন্দী নয়, যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মেছিলেন। তুমি থাকো সেখানে যেখানে বহুবছর যুদ্ধ করে ক্রীতদাস প্রথা তুলে দিয়েও মানুষ আবার স্বেচ্ছায় লক্ষ্মীর ক্রীতদাসত্ব গ্রহণ করেছে। আমার টাকা সম্বন্ধে কোনো মোহ নেই।"

রূপসী নিজের বাপের বাড়িতে বিছানায় পাশ ফিরলো। আশা করি অনুরাগ বুঝবে, রূপসী তার আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে। রূপসী এমনভাবে এসেছে যে পিছনের সেতু পুড়ে গেলেও কিছু এসে যাবে না। উঃ কী সুন্দর এই কলকাতা ! এখানে টাকা নিয়ে পাগলামি নেই। এখানে মানুষ এখনও স্বাভাবিক। সবার ওপরে অর্থ সত্য এই কথাটা এখানে পৌঁছয়নি। রূপসী নিশ্বাস নিয়ে বাঁচতে চায়—যে বাতাসে রূপোর গন্ধ নেই। বিয়েটা ভাঙছে--কিন্তু কিছু করার নেই। তৃতীয় একটা শরীর নিয়ে টানাটানি হলে তবেই বিয়ে ভাঙবে এমন কথা নেই। আত্মারও একটা ভূমিকা আছে বিবাহিত জীবনে।

ঘুম থেকে উঠে ভুজিয়াওয়ালার দোকানে গিয়েছিল রূপসী। গরম মুড়ি এনেছে। দিদিমণির ওই কাণ্ড দেখে কাজের লোক মোক্ষদা অবাক। মোক্ষদার ধারণা দিদিমণি কেক খাবে।

হেসেছে রূপসী। কেক কিনে বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে ওর হাতে টাকা দিয়েছে রূপসী। গতকালই এয়ারপোর্টে বেশ কিছু ডলার ভাঙিয়ে নিয়েছে রূপসী।

একখানা 'লাইলন' শাড়িও পেলো মোক্ষদা। খুব খুশি—এখন পরবে না, পূজোর সময় ঠাকুর দেখতে বেরুবে 'লাইলন' পরে।

আশীর্বাদ করছে মোক্ষদা। "মায়ের দুঃখু দূর করো, এবার পেটে ছেলে ধরো। এবারেই ছেলে পেটে নিয়ে এখানে চলে এলে না কেন ? মা যত্ন-আত্তি করতো।"

"ছেলে ধরায় অনেক সুখ গো, দিদিমণি। তোমার মাকে জিজ্ঞেস কোরো।" মোক্ষদা জানালো সে তিনবার পেটে ধরেছে, আরও ধরতো।

"ধরলে না কেন ?"

"ওই যে, পেটের চিন্তা ! একবার পেট হওয়া মানেই আর একটা পেট নিয়ে আসা। প্রতিদিন পেট ভরাতে হয়, দিদিমণি।"

রূপসীর গাড়ি এসে গিয়েছে। মামার পরামর্শে সারাদিনের জন্যে গাড়ি ভাড়া করেছে সে। ট্যাক্সি ধরার ঝামেলা নেই, একটু খরচ বেশী, কিন্তু নিজের গাড়ির মতন। আসলে মোর দ্যান নিজের গাড়ি, ক্লিভল্যান্ডে নিজের গাড়ি আছে কিন্তু চালক নেই—আপনা হাত জগন্নাথ !

এখন কী করবে রূপসী ? আত্মীয়দের কাছে যাবার ইচ্ছে নেই রূপসীর। ওর কী রকম একটা ভয়, জেরার মুখে অনুরাগের খবরটা বেরিয়ে পড়বে। এমনিই তো মা-মাসীদের ধারণা, বিয়ে ভাঙবার জন্যেই ওদেশে লোকে বিয়ে করে। ওরা বোঝে না, মানুষের একটামাত্র জীবন। ঘরসংসার তো যাবজ্জীবনের জেলখানা নয়—শাস্তির কোটা শেষ হলে আবার মুক্তি।

রূপসীর মনে পড়লো, বিয়ের পরে অনুরাগের সঙ্গে একটা ছবি দেখতে গিয়েছিল। মনে দাগ কাটবার মতন ছবি। একজনের সংসার ভেঙেছে—বউ চলে গিয়েছে। শূন্য সংসারে লোকটা কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। তখন সে ফিরে এলো ছোট্ট শহরে যেখানে সে পড়াশোনা করেছিল। সেখানে সে ছাত্রজীবনের ডায়রি খুলে বসলো—কাদের সঙ্গে ভাব ছিল, একটু-আধটু ডেটিং ছিল। তাদের খুঁজে-খুঁজে ফোন করতে লাগলো নিঃসঙ্গ লোকটি।

এখানেও অনেক ঘটনা ঘটেছে রূপসীর জীবনে। ছাত্রী অবস্থায় অনেক গল্পগুজব করেছে ওরা। রাস্তায় হেঁটেছে, লেকে বসেছে, সিনেমায় গিয়েছে, কফি হাউসে ভিড় করেছে। দু'একজন ছেলে বন্ধু ছিল, কিন্তু বেশির ভাগই বান্ধবী।

ডায়রি রাখার অভ্যাস ছিল না। কিন্তু নামগুলো এখনও বিস্মরণ হয়নি। আমেরিকান নোট বইতে নামগুলো লিখতে আরম্ভ করলো রূপসী।

এবার সুমিত্রার কথা মনে পড়ছে। ওদের সঙ্গে পড়তো, হাসিখুশি প্রাণবন্ত মেয়ে। খুব পিছনে লাগতো কল্যাণ সেনের। কল্যাণ থেকে ক্যালি—তারপর কালো—অবশেষে কেলো। সহপাঠিনীরাও আজকাল হেকো, ডেকো, কেলো এইসব নাম দেয়। অধ্যাপক পঞ্চানন চক্রবর্তীর নাম দেওয়া হয়েছিল পেঁচো।

এই কল্যাণকেই শেষ পর্যন্ত বিয়ে করলো সুমিত্রা। সুখী দম্পতি। রূপসীর বিয়ের সময় ছেলেকে নিয়ে এসেছিল। সবে তখন সেকেন্ড চাইল্ড হয়েছে, ওকে আনেনি। ব্যালানস্‌ড ফ্যামিলি পোর্টফোলিও—এক ছেলে, এক মেয়ে। কল্যাণ নামকরা কোম্পানিতে ভাল কাজ করে। বাড়িতে টেলিফোন ছিল। নিজেদের গাড়ি। ওরা ভেরি ভেরি হ্যাপি।

"কল্যাণ, এখনও সেতার প্র্যাকটিশ করছো তো?" রূপসী জিজ্ঞেস করেছিল। সুমিত্রা বলেছিল, "করতেই হবে। মার্চেন্ট অফিসের বক্সওয়ালাকে বিয়ে করতাম না। রবিশঙ্করের সেতারের আসরেই তো ওর সঙ্গে আলাপটা জমলো কলামন্দিরে। ওখানেই তো জানলাম, ও একটু-আধটু সেতার বাজায়।"

সুমিত্রার ফ্ল্যাটে বেল বাজলো। ও নিজেই দরজা খুললো।

"চিনতে পারছিস?"

"ওমা! রূপসী, তুই? কবে এলি ইউ-এস-এ থেকে?"

"এসেছি হঠাৎ—তোদের খোঁজখবর করতে। কল্যাণ কীরকম সেতার-টেতার বাজাচ্ছে খোঁজ করতে।"

সুমিত্রার কাপড়টা একটু ময়লা। "বর ট্যুরে গিয়েছে বুঝি? তাই এইরকম বেশবাস!"

অনুরাগের খবর চাইবার আগেই ও আক্রমণ করতে চায়। হয়তো অনুরাগের রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা জিজ্ঞেস করে বসবে। ও তো জানে না গত চার বছর একবারও গান গাইতে বসেনি অনুরাগ।

ওকে একটা ফরাসী পারফিউম উপহার দিলো রূপসী। নাম 'পয়জন'—বিষ। "তবে খাবার জন্যে নয়—বরের মন যাতে অন্য কোনো রমণী বিষাক্ত না করতে পারে তার জন্যে সুগন্ধের মোহমায়া। যখন বরের সঙ্গে কোম্পানির পার্টিতে যাবি—সুরক্ষা হিসেবে ব্যবহার করবি।"

সুমিত্রা উপহার নিয়েও রসিকতার উত্তর দিলো না। টেলিফোন নিয়েও কথা উঠলো। রূপসী এন অ্যান্ড ডি কোম্পানির নাম ডাইরেক্টরি বার করে তাতে কল্যাণের রেসিডেনসিয়াল ফোন নম্বর বার করেছিল। যতবারই ফোন করে একটা যান্ত্রিক অথচ

ভূতুড়ে কণ্ঠস্বর ঘোষণা করে,—এই লাইন নেই, দিস লাইন ডাজ নট এগজিস্ট। কখন হয়তো বলে বসবে, কলকাতা ডাজ নট এগজিস্ট!

সুমিত্রা এবারেও চুপ করে রইলো। ওকে এক কাপ চাও খাওয়াতে পারলো না। বললো, "গ্যাস ফুরিয়েছে। তুই বরং একটু চিনির সরবৎ খা। কিন্তু ঠাণ্ডা হবে না।" ওটা ভালই রূপসীর পক্ষে—গলাটা ঠিক নেই।

ছেলেমেয়েসহ সুমিত্রা ও কল্যাণের ছবি খাবারের টেবিলে রয়েছে। সুখী পরিবার বলতে যা বোঝায়। হরলিক্সের সুচিত্রার সংসারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কল্যাণের সঙ্গে প্রেমের একটা সার্থক পরিণতি হয়েছে—নট লাইক অনুরাগ ও রূপসী।

"কল্যাণ যথেষ্ট সময় দেয় তোকে?" জিজ্ঞেস করে রূপসী।

"যত ইচ্ছে সময়। ওটা কোনো প্রবলেম নয়, রূপসী।"

"অ্যাটেনসন? তোর ওপর নজর?"

"সে তো দেবেই। বউ ছাড়া অন্য কাউকে নজর দেবে কোন দুঃখে? বউ তো এখনও দাঁতফোকলা বুড়ী হয়নি।"

রূপসীও দাঁতফোকলা বুড়ী হয়নি। অন্য কোনো মেয়েও উপস্থিত হয়নি অনুরাগের জীবনে। তবু অসুবিধা এসেছে। টাকার পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছে অনুরাগ—এই নেশা মদের নেশা, মেয়েমানুষের নেশা, খ্যাতির নেশা থেকেও ভয়ঙ্কর। এর কিছুতেই নিবৃত্তি নেই।

কিন্তু সুমিত্রার মুখ শুকনো কেন? প্রাউড মাদার। হ্যাপি হাউজ্ওয়াইফ। সুখী দম্পতি।

ব্যাপারটা জানা গেল। সুমিত্রাই আস্তে-আস্তে বললো, চেপে রাখলো না। "তুই তো জানতিস বিয়ের পর বাড়ি থেকে চলে এসেছিল। কোম্পানিই সব দিয়েছিল—ফ্ল্যাট, গাড়ি, ফোন।"

"এন অ্যান্ড ডির খবর কাগজে পড়িসনি?" সুমিত্রা জিজ্ঞেস করছে।

"পৃথিবীতে কত কোম্পানি রয়েছে। তাদের খবর আমেরিকান কাগজে বেরোয় না। বিশেষ করে ইন্ডিয়ার খবর—এসবে ইউ-এস-এতে কারও কোনো আগ্রহ নেই।"

এন অ্যান্ড ডি আট মাস ধরে বন্ধ। অসুস্থ কোম্পানি। কবে খুলবে ঠিক নেই—আদৌ খুলবে কি না কেউ জানে না। প্রথম কয়েক মাস অফিসাররা কিছু মাইনে পেয়েছিল। এখন সবকিছুই অনিশ্চিত।

যেখান থেকে কল্যাণ গাড়ি নিয়েছিল কিস্তিতে তারা গাড়ি নিজেদের কাছে ধরে রেখেছে। লিজিং কোম্পানি একটু বেশী সাবধানী। ফ্রিজটা বিক্রি করে দিয়েছে সুমিত্রা। ফোনের বিল দেওয়া হয়নি। ফোন কেন কাটা, ভাগ্যিস ওই যান্ত্রিক কণ্ঠের মহিলা তা ফাঁস করে দেয় না, শুধু বলে এই নম্বর নেই। ও ফিকস্ড ডিপোজিটগুলো অকালে তুলে নেবার জন্যে ধরাধরি করতে গিয়েছে। জীবনবীমার প্রিমিয়ামও দেওয়া হয় না।

ওর সঙ্গীতের সাধনা অন্তত চলছে, আশা করে রূপসী। "দুঃখের মধ্যেও সুর বেঁচে থাকে, সুমিত্রা। সুর মানুষকে শক্তি দেয়।"

সুমিত্রা একমত হলো না। "ছেলে ও মেয়েকে বাধ্য হয়ে ইংরিজী ইস্কুল থেকে সরিয়ে আনার পর সুর কোনো শান্তি দেয় না, রূপসী।"

"ওর সাধের সেতারটা বিক্রি করে দিয়েছে কল্যাণ। ভাল দাম পেয়েছিল, কেন ছাড়বে ?"

"এক-এক সময় মনে হয় যৌথ পরিবার ছেড়ে না চলে এলেই ভাল হতো। ছেলেমেয়ের কষ্ট কম হতো—সব ভাইয়ের অফিস তো একসঙ্গে বন্ধ হয় না ?"

সুমিত্রা বিদায়বেলায় বলেছিল, "আমাদের সব আছে রূপসী—স্বাস্থ্যবান সন্তান, ছোট্ট গৃহকোণ, দাম্পত্যপ্রেম, রুচি, ভগবানে বিশ্বাস। কিন্তু এক অভাবে সব পাওয়া নষ্ট—টাকার অভাবে।"

আজ কল্যাণীর কথা মনে পড়লো রূপসীর। ইস্কুলে ওর প্রিয় বান্ধবী ছিল। তারপর একসঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক পড়লো একই কলেজে।

কল্যাণীকে সবাই একটু হিংসে করতো। ওর সৌন্দর্যের জন্যে। ভারি মিষ্টি দেখতে—সবাই জানতো একবার দেখলেই বিয়ে হয়ে যাবে। বিয়েতে কোনো কষ্ট হবে না। নিজের সৌন্দর্য সম্বন্ধে ওর কোনো চেতনা ছিল না। কিন্তু ক্লাশের ফার্স্ট গার্ল ইন্দিরা পর্যন্ত ওকে সমীহ করতো।

কালো ও ঈষৎ রোগা ইন্দিরা বলতো, "পড়াশোনায় ভাল হলে মেয়েদের কোনো লাভ হয় না, রূপসী। এই কল্যাণীর দেখবি কত ভাল বিয়ে হয়ে যাবে ; আর আমাকে তখনও চাকরি করে মরতে হবে। যদি দেখি আমি যে-অফিসের কেরানী সেই অফিসের বসের গিন্নি হয়েছে কল্যাণী তাহলেও আশ্চর্য হবো না। তখন তো ওকে ম্যাডাম বলে ডাকতে হবে।"

কল্যাণীর ঠিকানা খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে না। ওর বিয়ের কার্ড রূপসীর মা আমেরিকায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন কলকাতায় বিয়ে হচ্ছে। তারপর তাজুদি দুঃখ করেছিলেন, "শুধু আমার মেয়েরই বিয়ে হলো সেই ধ্যাধেবড়ে গোবিন্দপুরে।"

কল্যাণীর বাপের বাড়িটা রূপসীর স্মরণে আছে। ওখানে একবার মাসীমার সঙ্গে দেখা করে ঠিকানাটা নিয়ে এলেই হলো। সঙ্গে সারাক্ষণের গাড়ি রয়েছে, কোনো অসুবিধে নেই।

কল্যাণীকে উপহার দেবার জন্যে রূপসী নিয়েছে বিখ্যাত আমেরিকান সাবান। প্রোকটর অ্যান্ড গ্যামবেলের তৈরি ক্যালি সোপ। ঠিক যেন ক্রিম দিয়ে তৈরি—মেয়েদের নরম শরীরকে আরও নরম করে দেবে। রূপসীর জন্মদিনে কল্যাণী একবার লাক্স

য়লেট সোপ উপহার দিয়েছিল, বেশ মনে আছে।

গাড়ি এসে থামলো সরু গলির সামনে। পায়ে হেঁটে রূপসী হাজির হলো কল্যাণীর াপের বাড়ির দরজায়।

কল্যাণীর মা খুব খুশি হলেন। "ও মা ! তুমি তো মোটেই মেমসায়েব হওনি ! ঠক যেমনটি ছিলে তেমনটি রয়েছো !"

কল্যাণীকে যে ওইখানেই পাওয়া যাবে তা রূপসী প্রত্যাশা করেনি। একি হাল য়েছে কল্যাণীর ! রূপ কোথায় চলে গিয়েছে ! মাথার কয়েকটা চুল এই বয়সেই সাদা লো কী করে ?

সাবানটা ওর হাতে তুলে দিলো রূপসী। কল্যাণী বললো. "ভাল আছিস নিশ্চয়। খে থাক, সুখে থাকাটা খুব দরকার রূপসী।"

স্বামীর প্রসঙ্গ তুলতে চায় না রূপসী। লোকে যখন ভাবছে তার সুখ রয়েছে তখন ভাবুক না।

কল্যাণী বললো, "যদি বসিস তা হলে ট্যাক্সি ছেড়ে দে। শুধু-শুধু টাকা নষ্ট করবি কেন ?"

রূপসী লজ্জা পেলো। বোঝাতে হলো সারাদিনের জন্যে ব্যবস্থা। কলকাতার সব রাস্তা সে বুঝতে পারে না। কল্যাণী বললো, "সত্যিই তো পারবি কী করে ? এ তো ইংল্যান্ডের রাস্তা নয়।"

কল্যাণীকে বিকেলে বাড়িতে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিয়েছিল রূপসী। ও কিছুতেই রাজী হলো না। অন্য কাজ আছে।

এরপর কল্যাণী একবার বেরিয়েছিল রাস্তার দোকান থেকে জিলিপি কিনতে। বাড়িতে অন্য কোনো লোক নেই।

সেই সময় মাসীমা দুঃসংবাদটা দিয়েছিলেন। "কল্যাণী এখন বাপের বাড়িতেই রয়েছে। খুব বিপদ চলেছে।"

'কার যে কখন বিপদ আসে মা, এদেশে। ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দিলাম। তারপর আপিসে কী একটা গণ্ডগোল। ওদের ডিপার্টমেন্টর সায়েব আর জামাইকে পুলিশ একই সঙ্গে অ্যারেস্ট করলো। অফিসের হিসেবপত্তরের ব্যাপারে মামলা হলো।"

খারাপ খবরটা হলো, কল্যাণীর স্বামী এখন জেলে। দু'বছর জেল হয়েছে।

কল্যাণী ফিরে এসেছে। সঙ্গে জিলিপি। "মনে আছে তোর ? জিলিপি খেতে খুব ভালবাসতিস ?"

"জীবনটাই তো জিলিপির প্যাঁচ !" রূপসী বললো।

"ওর শরীরটা ভীষণ ভেঙে গিয়েছে", কল্যাণী স্বামী সম্বন্ধে বললো। "মনে লেগেছে খুব।"

কল্যাণীর মুখেই শুনলো, কল্যাণীর স্বামীর কোনো দোষ ছিল না। চুরি করেছিল অফিসারের ম্যানেজার।

মায়ের মুখেই রূপসী শুনলো, ম্যানেজার ছাড়া পেয়েছে বিচারে। মস্ত উকিল এস দত্ত ম্যানেজারের হয়ে এমন আর্গুমেন্ট করলো তিন দিন ধরে !

কল্যাণীর স্বামীর পক্ষেও দত্তমশায়ের সওয়াল করার অসুবিধে ছিল কোথায় রূপসী ভাবছে।

মাসীমা বললেন, "ওই উকিলের যা ফি। অত টাকা দিয়ে আমরা কী করে ওঁকে রাখতে পারবো ? আমাদের কম দামের জুনিয়র উকিল।"

মাসীমার শেষ কথা, "আমাদের কপাল পুড়লো, মা। আমার নির্দোষ জামাই জেল খাটছে টাকার অভাবে, স্রেফ টাকার অভাবে !"

অনেক কষ্টে মাধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করলো রূপসী। মাধুরী সুন্দর ছবি আঁকতো ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে বড় আর্টিস্ট হতে পারতো।

সেই মাধুরী এখন চামড়ার ব্যাগ তৈরির কারখানায় কাজ করে।

"এই ব্যাগ তো তোদের ইউ এস এ-তেও যায় ! মিসেস মোরারকা তো বড়লোক হয়ে গেলেন চামড়ার ব্যাগ এক্সপোর্ট করে।"

মাধুরী দিন-রাত খেটে কোনোক্রমে মাসে পাঁচশো টাকা বাড়িতে আনে।

মাধুরীকে নিয়ে রূপসী এসেছে কোয়ালিটি রেস্তোরাঁয়। অর্ডার দিয়েছে খাবারের।

"এই, এতো অর্ডার দিস না। অনেক টাকা লেগে যাবে। টাকা নষ্ট করিস না—কখন টাকার দরকার হবে কিছু ঠিক নেই।" মাধুরী বলেছে।

মাধুরী নিজেও একসময় এইভাবে রেস্তোরাঁয় অনেক টাকা খরচ করেছে। তখন স্বামীর ওপর কন্ট্রোল ছিল, ভেবেছিল এইভাবেই দিন কাটবে।

"জানিস রূপসী, দুষ্টু গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।"

মাধুরীর ডাইভোর্স হয়ে গিয়েছে। "হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না, রূপসী নির্লজ্জভাবে অন্য মেয়ের সঙ্গে শোবে আর আমাকে তা মেনে নিতে হবে ?"

মাধুরীর মা তবু চাপ দিয়েছিলেন, মানিয়ে-শুনিয়ে চলতে। "মা বোঝেন না আমার শরীরে কখন রোগটোগ ঢুকিয়ে দিতো। এক-একটা লোকের কোনো দয়ামায়া থাকে না।"

"আমি মিসেস মোরারকার ওখানে কাজ পেয়ে বেঁচেছি ভাই, যত কম মাইনেই হোক। মায়ের ভীষণ দুশ্চিন্তা ছিল, স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে খাবো কী ?"

"হ্যাঁরে, আসল কথাটার উত্তর দে। এই যে ব্যাগ এক্সপোর্ট হচ্ছে, এতে

কত সংসার টিকে রয়েছে। মিসেস মোরারকা বলছিলেন, হঠাৎ নাকি হাওয়া বদলাতে পারে। এই ধরনের জিনিস মেমসায়েবদের পছন্দ নাও হতে পারে। আউট অফ ফ্যাশন হলে আমাদের অনেকের সর্বনাশ হবে। তুই তো ওখানে রয়েছিস, একটু নজর রাখিস।"

রূপসী অসহায় বোধ করলো। ওখানে রূপসীর কথা শুনবার মতন কে আছে? আর রূপসী তো আদৌ ফিরবে না বোধহয়। মাধুরী তা জানে না।

বাড়ি ফিরবার সময় রূপসীর মা আঁচলে চোখ মুছলেন। "সতী সাবিত্রী হও মা। আমার দুঃখ তো ভগবান বুঝলেন না।" ডাইভোর্সের দুঃখ নয়। মাসীমা বললেন, "ওই তো আমার মাসতুতো দিদির মেয়েরও তো ডাইভোর্স হলো। জামাইদা মস্ত উকিল—আবার বিয়ে দিয়ে দিলেন। আমার মেয়েটার আবার বিয়ের কথা ভাবতে পারলাম না টাকার অভাবে।" এই বলে মাসীমা আবার চোখ মুছলেন।

মাধুরী রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিল রূপসীকে। বলেছিল, "আমার কপাল। নিশ্চয় স্বামী যা চাইতো তা দিতে পারিনি। স্বামীকে সুখী রাখিস ভাই, বিশেষ করে একটু সারপ্রাইজ, একটু রোমান্স। ও-দেশের মেয়েরা কী করে রে স্বামীকে অনুরক্ত রাখতে?"

রূপসী উত্তর দেয়নি। ওর মনে পড়লো, অনুরাগের মধ্যে রোমান্সের সব ধারা শুকিয়ে গিয়েছে—এক-একটা ঝরনাধারা যেমন আচমকা শুকিয়ে যায়। তবে অন্য কোনো রমণী নেই, স্রেফ অর্থ। ওনাসিসের জীবনী বেরিয়েছে—চাঞ্চল্যকর বই। যে-মানুষ বিশাল ধনী হয়েও রোমান্স চালিয়ে গিয়েছে—মারিয়া কালাস, জেকলিন কেনেডি এদের শয্যাসঙ্গিনী করেছে। জিনিসটা সহজে হয়নি নিশ্চয়—যাই বলুক, আমেরিকার সবচেয়ে বিখ্যাত বিধবার মন জয় ছেলেখেলা নয়। অনুরাগ প্লেনে বসে, বিজনেসের মাঝে-মাঝে বইটা পড়েছে এবং রূপসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। রূপসী ভেবেছে, অনুরাগ অন্তত প্রেমের পাঠ কিছুটা নতুন করে শিখেছে।

কিন্তু ব্যাপারটা অন্য। ওনাসিসের প্রেমপর্বগুলো ওর মাথাতেই ঢোকেনি। ওর নজরে পড়েছে, কোনো মূলধন ছাড়াই ওনাসিস পৃথিবীর বিখ্যাত ধনী হয়েছেন। প্রথম প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল ইস্কুলের ছাত্র হিসেবে। একবার ইস্কুল যেতে যেতে ওনাসিস দেখলো একটা দোকান পুড়ে গিয়েছে। পোড়া জিনিস জলের দরে বিক্রি হচ্ছে। জলখাবারের পয়সা দিয়ে ওনাসিস সমস্ত আধপোড়া পেনসিল কিনে নিলো। তারপর কিনলো একটা ছুরি। ধৈর্য ধরে সমস্ত পেনসিলগুলো সে ব্যবহারের উপযোগী করলো। এবার সেগুলোই সস্তা দরে বেচে দিলো নিজের সহপাঠীদের মধ্যে—বেশ কিছু টাকা জমিয়ে ফেললো ওনাসিস।

মিসেস কেনেডি, মারিয়া কালাস এদের কী করে জয় করলো ওনাসিস তা লক্ষ করবার সময় নেই অনুরাগের। টাকা যদি জল হয় তা হলে গুজরাতিরা মাছে মতন—সাঁতার শিখতে হয় না ওদের। রূপসী সমস্ত রাগটা জাতের ওপর চাপি হাল্কা হতে চায়।

টাকার ব্যাপারটা ভাল নয়। সেই কত দিন আগে পিটার কুপারের লেখায় রূপসী পড়েছিল। সেই মোজেসের সময় থেকে টাকা নিয়ে যারা মাতামাতি করে তার বিপজ্জনক লোক।

কলকাতায় যখন রূপসী ফিরে এসেছে তখন অতোটা চিন্তা নেই। বাঙালীরা টাকার চাকর নয় তা অনুরাগকে রবীন্দ্রনাথ ও রামকৃষ্ণের রচনা থেকে শুনিয়ে দি এসেছে রূপসী।

এখন একবার সুলতার খোঁজ করা যাক। সুলতা সান্যাল। কী চমৎকার নাচতে সুলতা—নটীর পূজায় অংশ নিয়ে রূপোর মেডাল পেয়েছিল ইস্কুলে। সুলতা তখ হিরোইন—ওর সঙ্গে একটা গ্রুপ ফটোতে দাঁড়িয়েছিল রূপসী।

সুলতাকে সারপ্রাইজ দেবে রূপসী। ওকে একটা লেডিজ হ্যান্ডব্যাগ উপহার দেবে ক্লিভল্যান্ডের ভাল দোকান থেকে কিনেছিল—স্প্রিং কালেকশন, বসন্ত সংগ্রহ। অব জানা ছিল না, জিনিসগুলো এই কলকাতা থেকেই যায়।

সুলতার মা ও বাবা দু'জনে বাড়িতে ছিলেন। রূপসীকে চিনতে পারলেন। বললে "ওমা! কী সুন্দর দেখতে হয়েছো।" এরপর একটা পিক্যুলিয়র বক্তব্য। "স্বামী ভালবাসার জল না পেলে এমন শ্রী হয় না মেয়েদের।" বয়োজ্যেষ্ঠরা জানে না, প্রসাধ কোম্পানিরা পিছনে থাকলে এবং শরীরের মালিক একটু সচেতন থাকলে শরীর অন্য কারও দয়াদাক্ষিণ্য ও জলসিঞ্চন ছাড়াই থাকতে পারে। শরীর কখনও-কখন মনকে ফাঁকি দিতে পারে।

ভীষণ বোকামি করেছে রূপসী। সুলতা কোথায় জিজ্ঞেস করতেই মাসীমা কান্না ভেঙে পড়লেন। "তুমি জানো না সুলতার খবর?"

সুলতা নেই। বিয়ের এগারো মাস পরে সুলতা রান্নাঘরে স্টোভের আগুনে পু মারা গিয়েছে। হাসপাতালে তিন দিন যুদ্ধ করেছিল। যাবার সময় বলে গিয়ে দুর্ঘটনা। কেউ দায়ী নয়। কিন্তু মাসীমা জানেন, ওটা দুর্ঘটনা নয়, আত্মহত্যা। নিজে প্রাণ নষ্ট করে সুলতা শান্তি পেয়েছে শ্বশুরবাড়ির অপমান থেকে।

কী আশ্চর্য, শ্বশুরবাড়ির ওপরে প্রচণ্ড বিরক্তি দেখাচ্ছেন না সুলতার ম কোনোরকম প্রতিশোধের আগুনও জ্বলছে না ওঁর মনে।

সুলতার বৃদ্ধ বাবাও বারান্দায় চুপ করে বসে বাংলা কাগজ পড়ছেন। "দো আমাদেরও, মা। বিয়ের কথাবার্তার সময় উনি লম্বা-চওড়া কথা বলে এলেন। এ

দেবো, ওই দেবো। বিয়ের সময় দিলেন না, মাসের পর মাস কথার খেলাপ করলেন। শ্বশুর শাশুড়ী বললেন, জোচ্চোরের মেয়ে। সুলতার মনে লেগে গেল। আমি তো ওঁকে বলি, যা দেবে না তা বলতে গেলে কেন?"

সুলতার বৃদ্ধ বাবা অসহায়ভাবে কাগজ থেকে মুখটা বার করে নিলেন। কী আশ্চর্য, দোষটা তিনি নিজের ঘাড়ে নিচ্ছেন। "রূপসী, তোমরা মা আমাকে ভুল বুঝো না। আমি অস্বীকার করছি না কথার খেলাপ করেছি। জিনিসগুলোর যে অতো দাম তা আমার জানা ছিল না। দেওয়া হলো না স্রেফ টাকার অভাবে।"

না, মেয়েদের সঙ্গে আর দেখা করবে না রূপসী। কিছু ছেলেকেও তো চিনতো পসী। শুভজিৎ মিত্র—পড়াশোনায় অতো ভালো হয়েও মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল। বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে কতো কষ্ট স্বীকার করেছে শুভজিৎ।

শুভজিৎ কি এখনও বিপজ্জনকভাবে বেঁচে রয়েছে? সিস্টেমটা ভেঙেচুরে মানুষের উপযোগী করে তোলার স্বপ্ন দেখতো শুভজিৎ। তার জন্যে যদি রক্তপাত য় হোক। এতো মানুষ রয়েছে এই দেশে—কিছু ঘর শূন্য হয়ে যদি ভবিষ্যৎটা নিশ্চিত হয় হোক।

শুভজিৎ সেই শহীদনগর কলোনির ছিটেবেড়ার ঘরে নেই। শুভজিৎ উঠে গিয়েছে লেকপুর পার্কে। শুভজিতের ওয়াইফ বললো, বম্বে থেকে ফিরে এয়ারপোর্ট থেকে সো কাজে চলে যাবে শুভজিৎ।

কাজ বিদেশী কোম্পানিতে। মিডলটন রো-তে ওর অফিসে ধাওয়া করেছে পসী। শুভজিৎ বলতো, টাকা থেকেই সব গোলমাল। পৃথিবীতে যত নোংরা শক্তি আছে তার মধ্যে 'মানি পাওয়ারই' সবচেয়ে নোংরা।

শুভজিৎ-এর জন্যে ছোট্ট একটা আয়না এনেছে রূপসী—মেড ইন ফ্রান্স, বিপ্লবের ধাত্রীভূমি। আমেরিকার কিছু তো ও নেবে না।

শুভজিৎ সুন্দর সুট পরেছে—চমৎকার শার্ট—ব্রাইট টাই। শুভজিৎ বললো, "এসব বিলিতি নয়, এ দেশেই তৈরি হচ্ছে। পার্ক অ্যাভিন্যু কলেকশান।"

শুভজিৎ মেড-ইন-ইন্ডিয়া কাপে কফি খাওয়ালো। লেডি সেক্রেটারির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো। "আমাদের কলেজ বান্ধবী—এখন ইউ এস এ-তে সুখী জীবন। জাতীয় সংহতির মূর্ত প্রতীক—বিয়ে করেছে গুজরাতি সায়েনটিস্টকে।"

সংশোধন করে দেওয়া উচিত ছিল—সায়েনটিস্ট নয়, গুজরাতি রিয়াল এস্টেট স্পেকুলেটরকে। কিন্তু পারলো না রূপসী।

শুভজিতের সেই সব স্বপ্নের কী হলো! 'বাবা ও মা বাঁচিয়ে দিলেন—ফিরে আসতে সাহায্য করলেন। আন্দোলনটার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কিছু হলো না—ছেলেগুলো টিকে থাকতে পারলো না।"

"কেন ? এমন তো কথা ছিল না।"

শুভজিৎ অবাক করে দিলো। "আমি অনেক ভেবে দেখেছি, রূপসী। অতো কষ্ট অতো রক্তপাত ব্যর্থ হলো স্রেফ টাকার অভাবে।"

তার অর্থ, আজকাল বিপ্লবও হবে না টাকা ছাড়া ! শুভজিৎ অফিসের কাজে একা ট্রাঙ্ককল্ বুক করলো দিল্লীতে। তারপর বললো, "সমগ্রর স্বার্থ ছেড়ে এখন কয়েকজনে স্বার্থ নিয়েই বেঁচে থাকার চেষ্টা চালাচ্ছি, রূপসী। দেখি, তোমার উপহারটা দাও ফ্রান্সের আয়নায় আমাকে কীরকম লাগছে দেখি।"

যাবার আগে রূপসী জানতে চেয়েছিল, "সুন্দরবনের সেই জঙ্গলঘাঁটি থেকে এ পার্ক অ্যাভিন্যু তো অনেক দূরে। পৌঁছলে কী করে ?"

শুভজিৎ বললো, "সুন্দরবন হ্যইড-আউটে যারা ছিল তাদের কেউ বেঁচে নেই আমি ছাড়া। আমিও বাঁচতাম না, যদি-না আমার মায়ের কিছু পিতৃদত্ত গহ থাকতো। যদিও দুঃখ থাকে, তবু বলতে পারো, টাকার জোরেই আমি বেঁ গিয়েছি।"

এইসব লোককে আয়না উপহার দিতে নেই। হয়তো শুভজিৎ ভুল বুঝলো, কি বুদ্ধিমান ছেলে, হজম করে গেল। বললো, "একটা টাইম দাও। টলিতে নিয়ে যাবে রীণাও সঙ্গে থাকবে। টলির চিকেন টিক্কা কাবাব তোমার ভাল লাগবে।"

রূপসী যে বিয়ের পর চিকেন কেন মাছও ছেড়ে দিয়েছে তা বললো না। অনুরাগে সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। সবচেয়ে দুঃখের, যার জন্যে রূপ নিরামিষাসী হলো সেই অনুরাগ এখন বিজনেসের প্রয়োজনে মাংস খায়। বীফ পর্যন্ত শ্বশুরবাড়ির লোকরা বিশ্বাস করবে না। ভাববে বাঙালী বউয়ের খপ্পরে পড়ে অনুরাগের এই অধঃপতন হলো।

টেলিভিশনে শ্যামলদাকে দেখে উল্লসিত হলো রূপসী। লেনিনের ছবিতে মা দিচ্ছেন শ্যামলদা, খুব ধীরে-ধীরে, যাতে টি ভি ক্যামেরাম্যানকে কষ্ট পেতে না হয় তারপর আরও একটা সাক্ষাৎকার। বেলভিউ থেকে বেরিয়ে আসছেন শ্যামল লাটসায়েবের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে। এখানেও টি ভি ক্যামেরাম্যানকে যা হুটোপাটি না করতে হয় তার জন্যে শ্যামলদা খুব ধীরে-ধীরে হাঁটলেন।

শ্যামলদা অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু জেলে সময় কাটিয়েছেন অনেক। নিজের জ কখনও ভাবেননি। পার্টি অফিসে একটা বেঞ্চিতে পড়ে থাকতেন। যা মাইনে পেতে তার প্রায় সব চলে যেতো পার্টি ফাণ্ডে—কিন্তু স্বপ্ন ছিল অনেক, মানুষের মঙ্গল হ এমন কিছু করবেন।

সেই সুযোগ অনেক সাধনার পরে এসেছে। ক্ষমতায় এসেছে শ্যামলদার দল। ওয়ান্ডারফুল—মানুষের দুঃখ যারা মনে-প্রাণে বুঝেছে তারা ক্ষমতায় এলে মানুষের ঙ্গল হতে বাধ্য। রূপসীর মনে কোনো সন্দেহ নেই।

শ্যামলদা দেখা করলেন তাঁর দপ্তরেই । রূপসী বললো, "আপনার শেখানো ইংরিজী গজে লেগে গিয়েছে, শ্যামলদা। আমেরিকায় ইংরিজী নিয়ে আমাকে মাথা ঘামাতে য় না।"

"শ্যামলদা, আপনারা সুযোগ পেয়েছেন, আমরা ভীষণ খুশি। আমার মনে আছে, আমাদের ক্লাসের অমর যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। আপনি নিজে রিকশ করে কে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। দেড় ঘন্টা আউটডোরে দাঁড়িয়ে রইলেন। ওদের থিল কাজকর্মে আপনি বিরক্ত হলেন, ক্লাশে বললেন, সমাজব্যবস্থার পারিবর্তন না ল এরা কখনোই শায়েস্তা হবে না।"

রূপসীর দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে শ্যামলদা ফাইল সই করতে লাগলেন।

"খুব ব্যস্ত থাকতে হয় আপনাকে, শ্যামলদা ?"

"ভীষণ। এই দ্যাখো না, বেলভিউ, উডল্যান্ড, বি এম বিড়লা হার্ট ফাউন্ডেশন, ঠারি হাসপাতাল সব জায়গাতে যেতে হবে আজকে। প্রত্যেক জায়গায় রয়েছেন -আই-পি অর্থাৎ ভেরি ইমপর্টান্ট পেশেন্ট। লাটসায়েব, পার্টির সিনিয়র কমরেড, ন্দ্রীয় উপমন্ত্রী, সবাই অসুস্থ। এঁদের তো দেখতে যেতেই হবে—টি ভি আসবে। নগণকে তো সারাক্ষণ বোঝাতে হবে আমরা হাত গুটিয়ে বসে নেই, আমরা চেষ্টা লাচ্ছি।"

"মেডিক্যাল কলেজে যেখানে অমর অজ্ঞান হয়ে যাওয়ায় আপনি কয়েক ঘন্টা সে ছিলেন ?"

শ্যামলদা হাসলেন। "ওটা তো সরকারী হাসপাতাল—আমাদের অধীনে। ওখানে ওয়ার উপায় নেই। গেলেই কোনো একটা ছুতোয় ঘেরাও করে বসবে। ওখানে াটকে গেলে উডল্যান্ডে কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রীকে দেখতে যাওয়া হবে না, কেন্দ্র ভুল বুঝতে ারে। ওখানে টি ভি থাকবে—নিশ্চয় দিল্লীর খবরেও দেখাবে। তুমি জানো তো খন জাতীয় কার্যক্রমে ইংরিজী খবর হয়। এখন আমাদের দেখাচ্ছে—অ্যাট লং ন্ট।"

শ্যামলদার জন্যেও উপহার নিয়ে এসেছে রূপসী। দাড়ি কামানোর ব্লেড। বললেন, মড ইন ইউ-এস-এ তো ? ভাল করেছো। দাড়ি কামিয়ে সুখ পাওয়া যাবে। টি -তে যা আলো ফেলে—দাড়ি একটু থাকলেই জনগণ বুঝতে পারেন। তোমাকে কটা মজার কথা বলি, রূপসী। আমি রাশিয়া গিয়েছিলাম কয়েক বছর আগে। ড নিয়ে যাইনি—রাশিয়ান ব্লেড যে অতো খারাপ আমার জানা ছিল না। মপোরারি দাড়ি রাখতে শুরু করলাম। আমি এখনই ফিরে এসে বুঝতে পেরেছি

কিছু একটা পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। ওই দাড়ি কামানোর ব্লেড মানুষ বেশিদিন সহ্য করবে না।"

"কিন্তু শ্যামলদা, দেশের কী অবস্থা হয়েছে! রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, আবর্জনা। লোকে আপনাদের অসৎ বলে না, কুড়ে বলে না। জনগণও তো রয়েছে আপনাদের সঙ্গে। আপনি মানুষের ভালর জন্য বিয়ে করলেন না। সারাজীবন কষ্ট করলেন। অথচ...."

শ্যামলদা ব্লেডের প্যাকেটটা নিয়ে খেলতে লাগলেন। তারপর কী ভেবে দাড়িতে হাত বুলোলেন। "অনেক ভেবেছি, রূপসী। জনগণও একদিন জিজ্ঞেস করবে, সব কিছু থেকেও কোনো কিছু হলো না কেন? উত্তরটা তুমি শুনে রাখো—রাস্তা সারাতে চাই, হাসপাতালে বেড বাড়াতে চাই, ওষুধ বিতরণ করতে চাই, ডাক্তারদের যন্ত্রপাতি দিতে চাই, নার্সদের, কর্মীদের সুখী করতে চাই—কিন্তু ফিনান্স মিনিস্টার টাকা দেয় না। সব ব্যর্থ হলো টাকার অভাবে। দেশব্রতীরা স্বাস্থ্যমন্ত্রী না হয়ে ফাইভস্টার নার্সিংহোমের ভিজিটিং পি-আর-ও হয় টাকার অভাবেই।"

হাতব্যাগে হাত দিতেই একটা লিপস্টিক বেরিয়ে এলো। ফরাসী লিপস্টিক এখন ক্লিভল্যান্ডে সুন্দরীদের বিশেষ প্রিয় হয়েছে। একটা নয়, দুটো নয়, চৌষট্টিটা শেডে পাওয়া যায়। দোকানে গেলে কমপিউটার ম্যাচিং করে দেয়—ঠোঁটের ওপর দিয়ে কী এক লেজার আলো চালিয়ে কোন কোন রঙ দিনের কোন সময় কোন জামার সঙ্গে মানাবে তা বলে দেওয়া হয়।

রূপসী দেখলো টকটকে লাল রঙ-এর লিপস্টিক—যার বাংলা নাম করেছিল কণিকা 'ঠোঁটকাঠি'। আর সেই দুষ্টু ছেলেটা, ভুল করে যার বাবা নাম রেখেছিল সুবোধ, বলেছিল, প্রকৃত বাংলাটা হওয়া উচিত 'ঠোঁটলাঠি'।

এই গল্পটা অনুরাগকে বলেছিল রূপসী। তখন বিজনেসের বিষ ওর সমস্ত মাথায় ছড়িয়ে পড়েছে। তাৎপর্যটা বুঝবার যখন চেষ্টা করছিল সেই সময় লং ডিসট্যান্স কল এলো। পনরো মিনিট ধরে ফ্লোরিডার কোন এক জঙ্গল সম্বন্ধে কীসব আলোচনা হলো। দশ বছর পরে কীভাবে ওই জঙ্গলের দাম দশ গুণ হবে তা এক ডাক্তারকে বোঝালো অনুরাগ। তারপর ওই ঠোঁটলাঠি প্রসঙ্গে ওর আর তেমন আগ্রহ রইলো না। রূপসী বোঝাবার চেষ্টা করলো, ঠোঁট রাঙানো যে লাঠি পুরুষের হৃদয় ভাঙতে সাহায্য করে যে-জন্যে মেয়েদের ভ্রূকে কামদেবের ধনুর সঙ্গে তুলনা করেছেন সংস্কৃত কবি পক্কবিম্বোধরোষ্ঠির কথাও উঠেছিল—ওর মাথায় অন্য আইডিয়া খেলে গেল ফ্লোরিডার ওষ্ঠ ভূমিতে ডালিমের চাষ অসম্ভব নাও হতে পারে। কোথায় মেয়েদের ওষ্ঠ আর কোথায় ফ্লোরিডা। দশ বছর পরে রূপসীর ডালিম-ওষ্ঠের দাম যেহেতু দশ গুণ দামী হবে না সেহেতু ফ্লোরিডা এখন অনুরাগের প্রধান আকর্ষণ।

কণিকা দাশগুপ্ত। বিয়ের পরেও কণিকা দাশগুপ্ত থাকলো। "এমন ভেবে-চিন্তে বিয়ে যে নামটাও পাল্টাতে হবে না," কণিকা রসিকতা করে চিঠি লিখেছিল রূপসীকে। রূপসী উত্তর দিয়েছিল, "যদি সুযোগ হয় দাশগুপ্তমশাইকে নিয়ে এখানে চলে আসিস। গুজরাতি আতিথেয়তার ত্রুটি হবে না বদ্যি দম্পতির জন্যে।" কণিকাও পুরনো রসিকতা ভোলেনি। লিখেছিল, "লিপস্টিক ওখানে খুব সস্তা নিশ্চয়।"

"সস্তা নয়, তবে ভ্যারাইটি। মাথা খাটিয়ে একজোড়া ঠোঁটকে কতরকমভাবে রঙিন করা যায় তা নিরন্তর বার করে যাচ্ছে।"

যতো রঙের লিপস্টিকই বেরুক, শেষ পর্যন্ত বাঙালী মেয়েদের জন্যে লাল ঠোঁটকাঠি। সেই জন্যেই তো ছিল তাম্বুলরাগ—পান খাওয়া রাঙা ঠোঁট। সেই সঙ্গে লালপেড়ে শাড়ি। সিঁথিতে লাল সিঁদুর। বাঙালীরা রাজনীতিতে লাল হলো সেদিন, কিন্তু মনে লাল হয়ে আছে সেই কোন আদ্যিকাল থেকে। অমন যে অমন কালী, তার জিভও লাল!

কণিকাকে পাওয়া গেল। বেরিয়েছিল। ফেরার পথেই দেখা হয়ে গেল। কিন্তু এ কী রূপ কণিকার! একটা কালোপাড় শাড়ি পরেছে কণিকা। কপালে সিঁদুর নেই। ঠোঁটটা ফ্যাটফেটে সাদা। অনেক দিন কোনো প্রসাধনের সঙ্গে যে সম্পর্ক নেই তা বোঝা যাচ্ছে।

কণিকাকে দেখে বুকটা কেমন দুমড়ে উঠলো। রূপসী বললো, "চল, গাড়ি রয়েছে সঙ্গে, আমাদের স্বপ্নের সেই কোয়ালিটিতে গিয়ে একটু বসা যাক।" কোয়ালিটি যে একটা মোস্ট অর্ডিনারী রেস্তোরাঁ তা বুঝতে রূপসীর কয়েক বছর সময় লেগেছে।

কণিকা রাজি হলো না। আজ ওর একাদশী। "তুই একাদশী করিস?" রূপসীর চোখে জল। আমার ধারণা ছিল বিধবারা আচারের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়েছে, অন্তত বাংলায়।

কণিকা হাসলো। "এখনও এক বছর হয়নি, ভাই। সামনের শনিবারে বাৎসরিক। একটা বছর নিয়মকানুন মেনে না চললে ছেলেটার অমঙ্গল হবে। ও অবশ্য যাবার আগে বলেছিল, 'তুমি রঙিন শাড়ি পোরো, মাছ খেয়ো, একাদশী কোরো না। আমি ওসব নির্দেশ শুনতে বাধ্য নই, রূপসী। অতোই যদি আমাকে রঙিন শাড়ি পরিয়ে রাখার ইচ্ছে তা হলে বেঁচে থাকলেই পারতো।" কান্নায় ভেঙে পড়লো কণিকা।

এক বছর হতে চললো, এখনও ইনসিওরের টাকা আদায় হয়নি। সবাই চেষ্টা করছে, সবাই চায় বিধবার ভাল হোক, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিয়মকানুনে আটকে যায়। "টাকা পয়সার ব্যাপার তো, বুঝলেন কি না।" সবাই বলে কণিকাকে।

এই ইনসিওর থেকে ধার নেওয়ার চেষ্টা করেছিল কণিকা, স্বামীর অসুস্থতার সময়।

"অনেক চেষ্টা হলো, কিন্তু ওকে রাখা গেল না।"

"ভাগ্য!" বললো রূপসী। "তুই কি করবি?"

আবার কান্নায় ভেঙে পড়লো কণিকা। "ভাগ্যের ঘাড়ে আর কতো দোষ চাপাবো, রূপসী? ভাগ্যের তো পিঠ কুঁজো হয়ে যাবার কথা।" কাঁদতে-কাঁদতেই কণিকা বলেছে, "ব্রেনের ব্যাপার তো। মাদ্রাজে একটা ভাল হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলেই ঠিক হয়ে যেতো। ইনসিওর থেকে ধারটা যোগাড় করতে পারলাম না। আমি বিধবা হলাম শুধুমাত্র টাকার অভাবে।" কণিকা মুখ চাপা দিয়ে কাঁদছে।

ব্যাগের মধ্যে রাখা লিপস্টিকটা গাড়ি থেকে সোজা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে রূপসী। একজনের ঠোঁট ভেবে আনা—অন্য কারুর ঠোঁটে যাবার কোনো মানে হয় না।

কণিকার বাবার খোঁজও করেছে রূপসী। শ্রদ্ধেয় লোক যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত। মেদিনীপুরে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। মাতঙ্গিনী হাজরাকে মরতে দেখেছেন পুলিশের গুলিতে। জেলে বহু বছর কাটিয়েছেন।

যতীন্দ্রমোহনবাবু দেশসেবার স্বীকৃতিস্বরূপ তাম্রপত্র পেয়েছেন। স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী সেবার ওঁর হাতে তাম্রপত্র তুলে দিয়েছেন। দেশের জন্যে সব কিছু দিয়েছেন। এ-পাড়ায় গান্ধী বলতো সবাই।

যতীন্দ্রমোহনবাবু স্বাধীনতা-সংগ্রামী হিসেবে পেনসন পেতেন। কারও দাসত্ব তাঁর পছন্দ ছিল না।

রূপসী শুনলো যতীনবাবু তেমন ভাল নেই। কণিকা বললো, "শেষ বয়সে বাধ্য হয়ে বাবা কমপ্রোমাইজ করেছেন। চামারিয়াদের নাম শুনেছিস? ওদের ওখানে কাজ নিয়েছেন বাবা—এই লোকজনকে ধরা, পলিটিশিয়ানদের কাছে যাওয়া পোদ্দারদের ফাইল নিয়ে। হাজার হোক, তাম্রপত্র বিজয়ী হিসেবে বাবার একটা সম্মান আছে।"

চামারিয়াদের ওখানে কেন? ওদেরই তো একটা বাড়ি ভেঙে পড়লো, বাজে মালমসলার জন্যে। গোটা দশেক বউ বিধবা হলো ওদের লোভে।

কণিকা বললো, "বাবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু পেনসনের টাকায় চলে না। বাড়িওয়ালা ভাড়া বাড়িয়ে দিলো। শেষ জীবনে এসে বাবা আত্মসম্মান বিক্রি করলেন..." এর পরের কথাটা রূপসী আন্দাজ করে নিয়েছে..."টাকার অভাবে।"

বাড়িতে এসে টেলিগ্রামটা পেলো রূপসী। অনুরাগ পাঠিয়েছে। টেলিফোন করেছিল, কেউ নাকি ধরেনি।

কে ধরবে ? বাড়িতে কে আছে ? কখন অনুরাগ দেশাই ফোন করবে তার জন্যে সারাক্ষণ টেলিফোনের পাশে ওৎ পেতে বসে থাকবার জন্যে রূপসী এখানে চলে আসেনি। অনুরাগকে তো যথেষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে রূপসী। একটা চমৎকার মানুষ কীভাবে মানি চেঞ্জিং মেসিন হয়ে যাচ্ছে, অথচ সে নিজেই বুঝতে পারছে না। মেসিনরা কাজে খুব ভাল কিন্তু তাদের বোধশক্তি থাকে না।

টেলিগ্রামেও মানসিকতা পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ নেই। বলেছে, লাস্ট চার দিনে আমি তৃপ্ত—ফ্লোরিডার বন খুব সস্তা দরে মক্কেলদের কিনিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। অনুরাগ শুধু দালালি করছে না, নিজেও একটা অংশ রাখছে।

রূপসী হিসেব করলো এই চার দিনই সে ক্লিভল্যান্ড ছেড়ে চলে এসেছে—এবং সেই সময়েই অনুরাগ সবচেয়ে 'তৃপ্ত'। চমৎকার ! টাকার বিষে অবশ হয়ে যাচ্ছে ওর সমস্ত অনুভূতি।

কার্ল স্যান্ডবার্গের একটা লেখা থেকে উদ্ধৃতি রেখেছিল রূপসী তার স্বামীর টেবিলে। "টাকার খোঁজে বহু মানুষের 'মৃত্যু' হয় কবরে যাবার অনেক আগে। ভাল-ভাল মানুষ শুকনো কেঁচো হয়ে যায় টাকাকে তাড়া করে।" অনুরাগের কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি—হয়তো বউয়ের লেখাটাও নজরে পড়েনি।

রূপসীর মনে পড়ছে সেই চলচ্চিত্রের কথাটা। যেখানে নায়ক বিবাহবিচ্ছেদের পরে ছাত্রজীবনের পুরনো বান্ধবীদের সন্ধানে বেরুলো। সেইসব বান্ধবী যারা তার জীবনে একসময়ে এসেছিল। যাদের সঙ্গে রয়েছে অনেক রঙিন স্মৃতি।

রূপসী চায় কারুর সঙ্গে অনেকক্ষণ সময় কাটাতে। কাউকে নতুনভাবে, নিবিড়ভাবে আবিষ্কার করতে। এই জন্যেই মামার কাছে আশ্রয় নেয়নি, নিজের স্বাধীনতাটুকু অক্ষুণ্ন রেখেছে। ছবিটাতে একটা চমৎকার দৃশ্য আছে। পুরনো এক বান্ধবীকে নিজের সাময়িক আবাসে নিয়ে এসেছে নায়ক। ভাবছে, একে বিয়ে করবার সুযোগ ছিল। প্রাক্তন বান্ধবী এতো দিন পরে স্বীকার করছে, সে আশা করে বসেছিল, তুমি প্রপোজ করবে। প্রস্তাবের কী ফলাফল হতো তা জানবার অদম্য কৌতূহল নায়কের মনে। কিন্তু বান্ধবী বললো না। কেন বলবে ? কী হলে কী হতো তা নিয়ে মাথা ঘামাবার মতন অতো সময় নেই।

কেউ যদি এই মুহূর্তে কাছে থাকতো ! যদি সবার খবর কারও নখাগ্রে থাকতো ! কলকাতায় অনেক অসুবিধে। বেশির ভাগ মানুষের ফোন নেই। বাড়ি গেলেও প্রাইভেসি নেই। নিরিবিলি কথা বলাটা মস্ত এক বিলাসিতা। মানুষকে তিলে তিলে আবিষ্কার করে তারপর গ্রহণ করার উপায় নেই এখানে। গ্রহণ করবার পরে যতো খুশি আবিষ্কার করো, এই চায় সবাই।

স্মৃতির থলিকা হাতড়ে বেড়াচ্ছে রূপসী। এমন একজন যে জড়িয়ে পড়েনি। যে নিজের পায়ের ওপর বৃত্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ কাগজে সদাপ্রসন্নর কথা দেখলো রূপসী। এই সেই সদাপ্রসন্ন ব্যানার্জি যার সঙ্গে ছাত্রীজীবনে আলাপ হয়েছিল। সদাপ্রসন্ন তখনও ছবি আঁকে, আর্ট স্কুলে ঢুকেও কোর্স শেষ করতে পারেনি। পরীক্ষায় পাস করাটা ওর ধাতে ছিল না। বড় হবে যারা তারা কেন পরীক্ষার দাসত্ব স্বীকার করবে? পরীক্ষাই তো পরে ওদের দাস হবে—ওদের নিয়েই তো পরীক্ষকরা প্রশ্নপত্র তৈরি করবেন।

সদাপ্রসন্নর যে রূপসীর প্রতি অনুরাগ ছিল তা খুব গোপন ব্যাপার নয়। রূপসী ওর সঙ্গে কফি খেয়েছে, ঘুরে বেরিয়েছে, ছবি দেখেছে তা মিথ্যে নয়। কিন্তু প্রণয় তো ওয়ান-ওয়ে ট্রাফিক নয়।

সদাপ্রসন্নর জানা উচিত, রূপসীর একটা ন্যূনতম লাইফস্টাইল আছে। সেই ন্যূনতম জীবনযাত্রার একটা খরচ আছে। রূপসী তার ছবিতে আগ্রহিনী। তার সাধনাতেও কৌতূহলী। কিন্তু মানুষটা সম্বন্ধে খোলাখুলি কোনো কথা হয়নি।

রূপসীর বান্ধবীরা ওকে টিটকিরি দিয়েছে। যদি ওইরকম মেয়েকে সত্যিই চাও, পরীক্ষায় পাস করো, আর্ট কলেজে অধ্যাপনা করো, নিদেনপক্ষে বিজ্ঞাপন এজেন্সিতে ঢোকো।

সদাপ্রসন্ন নড়েচড়ে বসেনি। সদাপ্রসন্ন তখন কীসব আঁকতো। মানুষের বঞ্চনার ছবি, যন্ত্রণার ছবি, হতাশার ছবি। ভীষণ ডার্ক। কোথাও যেন কোনো ভরসা নেই। ওই সব অন্ধকার ছবি বিক্রি হতে চায় না। পয়সা দিয়ে কে দুঃখ কিনবে এবং বাড়িতে টাঙিয়ে রাখবে?

সদাপ্রসন্ন কিন্তু মেনে নেয়নি। সমঝোতার মধ্যে নেই সদাপ্রসন্ন। যারা কমপ্রোমাইজ করে তারা সহজে বড় হয় না।

রূপসী যখন চলে যাচ্ছে তখনও বান্ধবীরা ওকে টিটকিরি দিয়েছে। যথাসময়ে ওর বিয়ের খবরেও নিরাশ হয়নি সদাপ্রসন্ন। একজন বান্ধবী আমেরিকাতে লিখেছিল রূপসীকে : একজন পাগল এখনও তোমার গুণ ও রূপগ্রাহী। কী পেয়েছে তোমার মধ্যে তা সে-ই জানে। সে বলেছে, এ-জন্মে না পাওয়া গেলেও ওয়ার্থ ওয়েটিং পরের জন্ম তো রয়েছে।

অর্থাৎ শুধু এ জন্মে নয়, আরেক জন্মের জন্যে অপেক্ষা।

বিড়লা আকাদমীতে সদাপ্রসন্নর ছবির প্রদর্শনীতে বেশ ভিড়। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে সদাপ্রসন্ন হিমসিম খাচ্ছে—মিস্টার মজুমদার, মিস্টার কানোড়িয়া, মিসেস ভারতিয়া, মিসেস সিংঘানীয়া। মিস্টার নন্দী বম্বে থেকে ফ্লাই করে আসছেন স্পেশালি; সদাপ্রসন্নর ছবি সম্বন্ধে লিখতে। মিস্টার কাশ্যপ, মিস্টার মোদীও আসবেন।

অনেক দিন পরে রূপসীকে দেখে সদাপ্রসন্ন একটু প্রসন্নই হলো। কিন্তু সবিনয়ে বললো, "শুধু আমার ছবি চেয়ো না, রূপসী। সব বুক্‌ড্। মিস্টার ইনামদার বোম্বাই

থেকে এসে রাগ করছেন, শূন্য হাতে ফিরে যেতে হবে। ছবির দাম ডবল করে দিয়েছি তবু ভিড় কিছুতেই কমলো না।"

অর্থাৎ সদাপ্রসন্ন থেকে সদাপ্রসন্নর ছবির মূল্য বেশী। তোমার সৃষ্টির চেয়ে তুমি যে মহৎ যে লিখেছিল সে বিশ্বসংসারের কিছুই জানে না।

সদাপ্রসন্নকে অনেক কষ্টে তাজ বেঙ্গলে নিয়ে এসেছে রূপসী। এখন রাত ন'টা। যে-সদাপ্রসন্ন আগে মদ স্পর্শ করতো না সে এখন স্কচ পছন্দ করে।

"তোমাদের এখন নিশ্চয় অনেক পয়সা," সদাপ্রসন্ন বলেছে।

চুপচাপ বসে আছে রূপসী। "ওই সব সাড়ে সতেরো দিয়ে ডলারকে গুণ আমার আসে না।" "দেখো, ডলার একদিন একশো হবে, তখন হিসেব করতে অসুবিধে হবে না।"

হিসেবটা সদাপ্রসন্ন অনেকটা অনুরাগের মতোই শিখে ফেলেছে মনে হচ্ছে। সদাপ্রসন্ন তার ছবির কথা বলতে চায় না, শ্রেফ তার সাফল্যের কথা। "বম্বেতে আমার ছবির জন্যে আমবানিরা হায়েস্ট দাম দিয়েছে।"

অনেকক্ষণ ড্রিংক করেছে সদাপ্রসন্ন। সঙ্গ দেবার জন্যে রূপসীও কিছুটা গলায় ঢেলেছে।

সদাপ্রসন্ন বলেছে, "থ্যাংক গড। তুমিও হ্যাপি, আমিও হ্যাপি। ভাগ্যে কোনো অঘটন ঘটেনি ; তা হলে তুমি ও আমি দু'জনেই মুশকিলে পড়ে যেতাম। বস্তাপচা আদর্শের সম্মানে বিয়ে করলে তুমি আমার আদর্শের সঙ্গে ঘর করতে, আমার সঙ্গে নয়।"

সদাপ্রসন্ন দাবি করেছে, সে অনেক ম্যাচিওর হয়েছে। ম্যাচিওর কীভাবে হয়েছে তাও বর্ণনা করেছে সদাপ্রসন্ন। দিল্লীর শিল্পপতি কাঠুরিয়া, ওঁর ছোট মেয়ে প্রতিমা। ওর সঙ্গে ছিলাম আড়াই বছর। একই বেডরুমে। প্রতিমা কাঠুরিয়া শুধু আর্ট ভালবাসে না, আর্টিস্টও ভালবাসে। কাঠুরিয়া আমাকে নতুনভাবে লন্চ করলো। প্রতিমা আমার চোখ খুলে দিলো। দুনিয়াতে বড়লোকদের কতো দুঃখ, কতো কষ্ট। যে যা চায় তা দাও—ভগবান তৃপ্ত হবেন।

"আমি ওইসব কালো কালো রঙ, গোমড়া গোমড়া ভাব, ওই নেগেটিভ মানসিকতা ত্যাগ করলাম প্রতিমা কাঠুরিয়ার অনুপ্রেরণায়। ভেরি নাইস উয়োম্যান—বড়লোক, এ ছাড়া কোনো দোষ নেই। স্ত্রীর মতো প্রশ্রয় দিয়েছে আমাকে কিন্তু স্ত্রীর মতো সারাক্ষণ শাসন করেনি। ফলে আমি বিকশিত হয়েছি—আমার ছবির এতো কদর হয়েছে।"

আরও হুইস্কি সেবন করেছে সদাপ্রসন্ন। বলেছে, লেখক শিল্পী এসব তো একজাতের জমি, স্বীকার করবে তো ? স্যামুয়েল জনসন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন তাও স্বীকার করবে। প্রতিমা কাঠুরিয়া একদিন আমাকে পড়িয়েছিল জনসনের উক্তি—নো

ম্যান বাট এ ব্লকহেড এভার রোট একসেপ্ট ফর মানি। একমাত্র বোকচন্দর ছাড়া সবাই টাকার জন্যে লেখে। কার্ল মার্কস পর্যন্ত প্রায় একই কথা বলে গিয়েছেন ১৮৬০ সালে। আর্টিস্টদেরও ওই একই কথা।

পুরনো দিনের ছবিগুলো কোথায় গেল, জানতে চেয়েছে রূপসী। প্রতিমা কাঠুরিয়ার নজর ছিল আমার ওপর কিছুদিন। যখন তোমার বিয়ের খবর পেলাম, যখন ঠিক করলাম প্রতিমার রক্ষিত হয়েই আমাকে দিল্লী যেতে হবে তখন সব গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিলাম। সরস্বতী পূজোর ভাসান ছিল সেদিন—খড়কুটোর সঙ্গে ভেসে গেল, কোনো অসুবিধে হলো না।

রাত অনেক হয়েছে। বেসামাল সদাপ্রসন্নকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে চলেছে রূপসী। প্রতিমা ও সদাপ্রসন্নর সম্পর্ক এখন নেই। "প্রয়োজন নেই। আমি যা পাবার পেয়ে গিয়েছি, প্রতিমারও কৌতূহলের নিবৃত্তি হয়েছে। আমার কাছ থেকে ওর নতুন কিছু পাবার নেই। তবে আমরা গুড ফ্রেণ্ডস। দিল্লীতে আমার এগজিবিশনে আসে।"

রূপসীর মাথাটাও টলছে। কেন ড্রিংক করলো শুধু-শুধু? সদাপ্রসন্ন বসেছে সামনের সীটে। রূপসী পিছনে। "পরস্ত্রী তুমি—দূরত্ব থাকুক রূপসী। মদ মানুষকে বেহেড করে দেয়—ব্রেক ফেল করে।"

রূপসীর শরীরটা জ্বলছে। হঠাৎ মনে হচ্ছে সদাপ্রসন্ন যে একদিন একটু হাসি পাবার জন্যে হা-পিত্যেশ করতো সে সুযোগ পেয়ে অপমান করছে রূপসীকে—তার ব্যক্তিত্বকে, শরীরকে, এভরিথিং।

রূপসী জ্বলে উঠলো। "সদাপ্রসন্ন, আমি তোমার স্ত্রী নই, রক্ষিতা নই—জাস্ট এ ফ্রেণ্ড। একজন ওয়েল উইশার মাত্র। তোমার এগজিবিশন দেখলাম। যত খুশি লোক ঠকাও, কিন্তু নিজেকে ঠকাচ্ছো কেন? যেগুলো আঁকছো ওগুলো ছবি? আগে কী কাজ তুমি করেছো মনে করো!"

রূপসী আশঙ্কা করেছিল সদাপ্রসন্ন জ্বলে উঠবে। হয়তো গাড়ি থেকে নেমে পড়ে পিছনের সীটে উঠে রূপসীকে চড় মারবে।

কিন্তু কী আশ্চর্য! কিছুই হলো না। নিজের বাড়ির সামনে এসে সদাপ্রসন্ন বললো, "আজ আমি মত্ত। তাই বাড়িতে নিয়ে গেলাম না।"

কাঁদছে সদাপ্রসন্ন। গাড়ি সচল হবার আগে সদাপ্রসন্ন বললো, "আমি এখনও নিজেকে ঠকাইনি রূপসী। আমি ভাল ছবি আঁকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু খারাপ হয়ে গেলাম স্রেফ টাকার অভাবে।"

টাকার অভাব! টাকার অভাব! কথাগুলো সমস্ত রাত ধরে রূপসীর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে। ঘুম আসেনি, কিন্তু ঘোর ছিল।

ভোর হয়েছে অনেকক্ষণ। রূপসী এবার রাতের পোশাক ছেড়ে শাড়ি পরে নিলো। কাগজে সদাপ্রসন্নর ছবির ভূয়সী প্রশংসা বেরিয়েছে। "যেভাবে আধ ঘন্টার মধ্যে প্রদর্শনীর সব ছবি বিক্রি হয়ে গেল তার থেকেই প্রমাণ হয় সদাপ্রসন্ন এখন প্রথম সারিতে।"

কাল খুব ঝুঁকি নিয়েছিল রূপসী। ঐভাবে ওর সঙ্গে বেরুনো নিরাপদ হয়নি। কিছু একটা অঘটন ঘটে গেলে কিছু বলবার থাকতো না। আবার মনে হলো, সদাপ্রসন্ন শেষ হয়ে গিয়েছে—প্রতিমা কাঠুরিয়ারা ওর কোনো কিছু অবশিষ্ট রাখেনি।

রেডিওতে মীরার ভজন শুরু হয়েছে। মনের মধ্যেও কোনো এক উদাসী কিছু একটা গাইবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠছে।

অথচ কেমন এক অনিশ্চয়তা ঘিরে ধরছে রূপসীকে। যে-কলকাতাকে সে অনেক দিন আগে চিনতো, যে কলকাতাকে কলকাতায় রেখে সে সুদূর বিদেশে পাড়ি দিয়েছিল, সে যেন নেই। লেফট লাগেজে অনেক সময় মাল বদলি হয়ে যায়। ব্যাগটা একই রকমের, একই রঙের, কিন্তু ভিতরের জিনিস আলাদা।

কলকাতা কোথায় যেন হেরে গিয়েছে। মীরার ভজন শুনতে-শুনতেই আর একজনের কথা মনে পড়লো। মহীতোষদা। অসামান্য মানুষ মহীতোষদা। রূপসীদের পুরনো বাড়ির সামনেই থাকতেন।

কম বয়স থেকেই মহীতোষদার মধ্যে ধর্মভাব ছিল। ওঁর মায়েরও ছিল ধর্মে মতি। সোজা চলে যেতেন দক্ষিণেশ্বরে, বেলুড়ে, ভারত সেবাশ্রম সংঘে। মা আনন্দময়ীর সঙ্গেও ছিল ওঁর মায়ের যোগাযোগ। মহীতোষদা কৃতী ছাত্র ছিলেন। ইস্কুলে কলেজে অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। গান গাইতেন অসামান্য। সেই মহীতোষদা শেষ পর্যন্ত বৈরাগ্যের পথ ধরলেন। যে বয়সে লোকে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকে, তাদের সান্নিধ্য পেলে ধন্য হয়, যে বয়সে ছেলেরা সিনেমায় যায়, বাবরি চুল রাখে চিত্রাভিনেতাদের স্টাইলে, সেই বয়সে মুণ্ডিতমস্তক হলেন মহীতোষদা। সাদা পাঞ্জাবি ও কাছাবিহীন কাপড় পরা সেই ব্রহ্মচারীকে রূপসী দেখেছে ঠাকুরের জন্মদিনে, আর্তদের সেবা করে চলেছেন নীরবে।

মহীতোষ মহারাজের পরে কী একটা নাম হয়েছে। কয়েক বছর কংখলে তপস্যা করে কাটিয়ে দিয়েছেন। ওঁর সঙ্গে দেখা হলে মন্দ হতো না। ভক্তির পথে, সন্ন্যাসের পথেই তো চিরদিনের ভারতবর্ষ মোক্ষের সন্ধান করেছে। বিবেকানন্দ তো বলেছিলেন, আমরা স্বর্গসুখের সন্ধান করি না, আমরা চাই মোক্ষ, মুক্তি। এই শাশ্বত বাণীই তো অভিনব রূপ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানে।

মহীতোষ মহারাজ একবার অনুপ্রাণিত হয়ে রচনা করেছিলেন অসামান্য কাব্য যা রূপসী পড়েছে কোনো এক সাপ্তাহিক পত্রিকায়। বিবেকানন্দর অনুপ্রেরণায় রচনা ঃ

আ-হা, আবার সেই মধুর বাণী, সেই চিরচেনা কণ্ঠস্বর।
কন্টকিত অন্তর, রোমাঞ্চিত প্রাণ,
নেই বন্ধন মায়াজাল।
নেই জীবনের আকর্ষণ।
শুধু আছে প্রভুর মধুর গম্ভীর আহ্বান।
যাই প্রভু যাই।
ওই তিনি বলছেন,
মৃতের সৎকার করুক মৃতেরা,
সংসারের ভালোমন্দ দেখুক সংসারীরা,
ওসব ফেলে তুই চলে আয়।
যাই প্রভু যাই॥
নির্বাণ-সমুদ্রের অপূর্ব বিস্তার সামনে—ওই।
অসীম শান্তির ওই পারাবার,
মায়ার বাতাসে নেই তরঙ্গ-বিক্ষেপ,
আমি যাই।
আমি যে জন্মেছি তাতে খুশি,
দুঃখ যে পেয়েছি তাতে খুশি,
জীবনে যত ভুল, তাতে খুশি,
নির্বাণে চলেছি, তাতে খুশি।

মহীতোষদা যেদিন সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন সেদিনটাও মনে আছে। রাণুমাসীমা পুত্রশোকে কাতর—আবার কতো মেয়ে তাঁকে প্রণাম করছে এমন সন্তানের গর্ভধারিণী হওয়ার জন্যে।

অনেক চেষ্টায় মহীতোষদার খবর পাওয়া গেল। কলকাতা থেকে বেশ দূরে নির্জন সমুদ্রতীরে আশ্রম গড়েছেন মহীতোষদা—স্বামী নির্বাণানন্দ নাম নিয়েছেন।

মুক্তির সন্ধানে সংসারের সমস্ত বন্ধন অগ্রাহ্য করে মহীতোষদা ভারতবর্ষের প্রান্তরে-প্রান্তরে ঘুরেছেন। চরম দুর্যোগে দুঃখী মানুষের সেবা করেছেন। হিমালয়ের গহনে বসে পাঠ করেছেন সংস্কৃত সাহিত্যমালা। নিজেই অনুবাদ করেছেন যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

মহীতোষদাই দিতে পারেন রূপসীকে দু'দণ্ডের শান্তি। মহীতোষদা ভীষণ স্নেহপ্রবণ। এতো স্নেহভালবাসা নিয়ে তিনি কী করে মাকে কাঁদিয়ে সংসার ত্যাগ করতে পারলেন তা শুধুমাত্র তিনিই জানেন।

অনেকক্ষণ ড্রাইভ করে মহীতোষদার আশ্রমের সন্ধান পেলো রূপসী। হীতোষদাকে সব বলবে রূপসী। কোনো কিছুই লুকিয়ে রাখবে না সর্বত্যাগী পুরুষের ছে থেকে।

মহীতোষদা অনেকদিন পরে রূপসীকে দেখে খুশি হলেন। রূপসী যে এতো বিদ্যাবতী য়েছে এবং একজন বিদ্যাপতি লাভ করেছে তা জানতেন না। বিদেশে বসবাস করছে বং সামান্য কয়েকদিনের জন্যে দেশে এসে যে আশ্রমে ছুটে এসেছে তাতেই তৃপ্তি হীতোষদার।

মহীতোষদা জানেন না, এছাড়া পথ নেই রূপসীর। একজন প্রাণবন্ত পুরুষকে াল্যদান করেছিল, সে এখন একটা মানি এক্সচেঞ্জার হয়ে দূরদূরান্তে ছুটে বেড়াচ্ছে। দূর কলকাতা হাতছানি দিলো—সেই আকাশ যা একদিন রামকৃষ্ণকে, রবীন্দ্রনাথকে, বেকানন্দকে আশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু কোথায় কী যেন হয়ে যাচ্ছে, দেশটা দিশাহারা তে আরম্ভ করেছে। রূপসী জানে, এই দেশ এই সভ্যতা এখনও শূন্য হয়নি। ইখানেই কোথাও তার ঈপ্সিত শান্তি খুঁজে পাবে রূপসী।

মহীতোষদা এসব জানেন না, জানবার প্রয়োজন নেই, কোন আগুনে জ্বলে পুড়ে রছে রূপসী।

রূপসী বুকের মধ্যে কিছুটা শান্তি অনুভব করছে। আশ্রমে উপনিষদের বাণী পঠিত চ্ছে। মহীতোষদা বলছেন সেই পূর্ণের কথা যা কিছুতেই অপূর্ণ হয় না। পূর্ণ থেকে পূর্ণকে বিয়োগ করলেও পূর্ণ থেকে যায়।

সূর্য অস্তাচলের পথে। সমুদ্রতীরে ধীরপদক্ষেপে ভ্রমণ করছেন মহীতোষদা। কোনো খেদ নেই তাঁর।

শেষ মুহূর্তে রূপসী স্তম্ভিত হলো। বাধার কথা জানতে চাইছিল রূপসী—সাধনার কথা, তপস্যার কথা। একটু ভেবে মহীতোষদা হঠাৎ বললেন, আরও দ্রুত এগুনো যেতো। কিন্তু টাকার অভাব।

রূপসী চমকে উঠলো। মোক্ষও তা হলে বিলম্বিত হয় টাকার অভাবে! জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে তৃষিত ধরিত্রী যেন চাতক পাখির মতন বলছে—টাকা দাও, টাকা দাও। টাকার অভাবে সব শূন্য হয়ে যাচ্ছে এই মানব-অরণ্যে।

রূপসী ফিরে এসেছে গভীর রাত্রে। তার সমস্ত শরীর কাঁপছে। তা হলে ওই লোকটা যে ক্লিভল্যাণ্ডে বসে টাকা রোজগারের চেষ্টা করছে সে তো অন্যায় কিছু করছে না। অনুরাগ যা করছে সেও এক তপস্যা।

টেলিফোন বাজছে। অনুরাগের গলা কী পরিষ্কার শোনাচ্ছে? অনুরাগ বলছে, "তোমার অভাবে বাড়ি মরুভূমি। কবে আসছো?" জানতে চাইছে অনুরাগ।

টাকা যখন সর্বত্রই ঈশ্বর হয়ে বসে আছে তখন অনুরাগ কী দোষ করলো ?

"আমি নিজেকে আবিষ্কার করেছি অনুরাগ। আমি আগামী কাল যাচ্ছি। তুমি এয়ারপোর্টে থেকো", এই বলে টেলিফোন নামিয়ে দিয়ে রূপসী নিশ্চিন্ত হলো।

"হাই, মামা ! আমি রূপসী বলছি। আমি ফিরে যাচ্ছি কাল সকালেই। বরের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল, মিটে গিয়েছে।"

কী নিয়ে ঝগড়া, মামা জানতে চাইছে। "কী নিয়ে আবার ! যা নিয়ে দুনিয়ার সব জায়গায় ঝগড়া—টাকা।" রূপসী ফোন নামিয়ে দিলো।

বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে কখনও কখনও। হাওড়া থেকে আমি বিদেশ পাড়ি জমাবার সুযোগ পেয়েছি।

নামমাত্র বিবাহ

সুদূর আমেরিকায় শীতাতপনিয়ন্ত্রিত লিভিংরুমের সুকোমল আশ্রয়ে বসে সুপ্রতীক সেন বললেন, "বাঙালীদের সম্বন্ধে জমকালো গল্প লিখতে হলে আপনাদের বিদেশেই আসতে হবে শংকরবাবু!"

বক্তব্যটা আমার মনঃপূত হচ্ছে না আন্দাজ করে সেনমশাই ব্যাখ্যা করলেন, "যতদূর খবর পাই বাংলার পরিচিত পরিবেশে গল্প ক্রমশই ফুরিয়ে আসছে, যেমন শেষ হয়ে আসছে সবুজ অরণ্য ও স্রোতস্বতী নদী। ওদেশে মানুষ আছে অনেক, কিন্তু তাদের জীবনস্রোত গতানুগতিকতায় বন্দী। ওখানে হতাশা আছে, বঞ্চনা আছে, পরাজয় আছে। কিন্তু স্বপ্ন নেই, সংঘাত নেই, সাফল্য নেই। প্রতিবাদ নেই, বন্ধন ছিন্ন করার স্পর্ধা নেই। মানুষ অতিমাত্রায় হিসেবী হয়ে উঠেছে। যে-পরিবেশে মানুষ সব কিছু মেনে নিতে ব্যগ্র সে-পরিবেশে জমাট গল্পের জন্ম হয় না। বিদেশের এই পরিবেশে বোস ঘোষ সেন সাহা মুখার্জি ব্যানার্জির সংখ্যা কম, কিন্তু এরা আকর্ষণে অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অনাবাসী বাঙালীর বুকের মধ্যে একটা করে গল্প জমা হয়ে রয়েছে : আপনাকে কেবল সেটি সংগ্রহ করে লিখে ফেলতে হবে।"

সুপ্রতীক সেনের বয়স পঁয়ত্রিশ। সুঠাম, বুদ্ধিদীপ্ত শরীর। আপাতত তিনিই আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, অনেক শহর ও অনেক পথ ঘুরে মধ্যপশ্চিম আমেরিকার এই ছোট্ট শহরে আমি উপস্থিত হয়েছি।

আমার কাপে গরম কফি ঢেলে সুপ্রতীক সেন বললেন, "দেশে থাকতে সাহিত্যিক যাযাবরের একটা অবিস্মরণীয় লাইন পড়েছিলাম—'বিজ্ঞান দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ।' এখানে বাঙালীদের দেখলে আপনার অন্যরকম মনে হবে। স্বদেশ থেকে বুকের মধ্যে আবেগ নিয়ে এসেছিলাম আমরা এদেশে তার সঙ্গে যোগ হয়েছে বেগ। আবেগ কিন্তু বিদায় হয়নি—বেগ ও আবেগের চমৎকার লুকোচুরি খেলা চলেছে এখানকার বোস ঘোষ মজুমদার তরফদারের মধ্যে।"

সুপ্রতীক বললেন, "সে বোধহয় ১৯৬৮ সালের কথা, পত্রপত্রিকায় আপনার প্রথম আমেরিকা ভ্রমণের কাহিনী পড়তে লাগলাম ; স্বপ্ন জেগে উঠলো, ওই স্বপ্নের দেশে

একবার যেতেই হবে। তা পাকে-চক্রে এখানে হাজির হলাম। তখন ভেবেছি আমেরিকা সম্বন্ধে আপনি কতো জানেন। দু'দশক পরে অনেক চেষ্টা করে আপনাকে নিজের বাড়িতে আনতে পেরেছি ; আপনি বলছেন, মার্কিন দেশ সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না। আপনি আমার কাছ থেকে দেশটা সম্বন্ধে খবরাখবর নিচ্ছেন !"

সুপ্রতীক বললেন, "এর মধ্যে কী প্রচণ্ড ড্রামা রয়েছে আপনি লক্ষ্য করুন। বাদুড়বাগান লেনের একটি ছেলের হাতে আপনার একটা লেখা পৌঁছলো, তারপর কতো জিনিস ঘটে গেল। সে মন দিয়ে পড়াশোনা করলো, পরীক্ষায় ভাল করলো, পাসপোর্ট ভিসার দুস্তর ঝামেলা পেরিয়ে এদেশে পড়তে এলো। দেশে ফিরবো বলেছিল, কিন্তু ফেরা হলো না।"

সুপ্রতীক এবার হেসে উঠলেন। "বাদুড়বাগানের ভাড়াটেবাড়ির ছেলে ইউ এস এ-তে বাড়ি কিনেছে। এই যে ভদ্রাসনটি দেখছেন এটি আমার নিজস্ব। আরও যা আশ্চর্য, শংকরবাবু, আমি এখন ইউ এস সিটিজেন, ইণ্ডিয়ার সঙ্গে খাতায়-কলমে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ যে দেশকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছি তা বুকের মধ্যে গেঁথে বসে আছে। প্রতিদিন রাত্রিবেলায় আলো নিভিয়ে যেমনি শুয়ে পড়ি অমনি বাদুড়বাগান লেন আমার কাছে চলে আসে। আমি ঘুমোবার আগে পর্যন্ত বাদুড়বাগান লেনেই বসবাস করি। সেই সরু গলিটা, সেই ভাঙাচোরা বাড়িটা কোন সময়ে আমার আদরের ধন হয়ে উঠেছে। অথচ আমার জন্মের দেশে ঢুকতে গেলে এখন সরকারী অনুমতি প্রয়োজন হয় ; বেশিদিন থাকতে হলে লোয়ার সার্কুলার রোডে ফরেনার্স রেজিস্ট্রেশন অফিসে আমাকে নাম লেখাতে হয়। অভিমান হয়, রাগ হয়—কিন্তু পরের মুহূর্তেই আমি বুঝতে পারি এসব অসুবিধে আমি নিজেই সৃষ্টি করেছি। কেউ আমাকে আপনার আমেরিকা ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়তে বলেনি, কেউ আমাকে বাদুড়বাগান লেন ছেড়ে বিদেশে আসতে বাধ্য করেনি ; আমার ইণ্ডিয়ান পাসপোর্ট কেউ কেড়ে নেয়নি ; আমি নিজেই ওটা অকেজো করে দিয়েছি। সবই যেন কেমন পাকে-চক্রে হয়ে গিয়েছে, যার নিমিত্ত আপনি। অথচ আপনি কেমন মনের সুখে সেই হাওড়া শিবপুরে বসবাস করছেন ; সুযোগ বুঝে অনেক দিন পরে আবার দেশ দেখতে এসেছেন।"

একটু থামলেন সুপ্রতীক সেন। তারপর বললেন, "আপনি এদেশে এসেছেন খবর পেয়েই কেন জানি না ইচ্ছে হলো একটু মোকাবিলা করার। আমি খোঁজখবর করে ফোনে আপনাকে বোস্টনে পাকড়াও করলাম। আপনারা স্বদেশে দুষ্প্রাপ্য, কি বিদেশে আয়ত্তের বাইরে নয়। আপনি অনুগ্রহ করে আমার এখানে আসতে এবং আমার অতিথি হতে রাজি হয়ে গেলেন। শুক্রবার রাত্রিতে বাঙালীদের সঙ্গে সাহিত্যালাপ ও জলযোগ, ওটা নিমিত্তমাত্র—আপনি এসেছেন ডিসকভারি অফ বেঙ্গলে। আপনি জানেন, বিদেশ ছাড়া আর কোথাও এখন বাঙালীদের আবিষ্কার করা যাবে না। আমাদের সংখ্যা এই বিশাল দেশে মাত্র হাজার চল্লিশেক—কিন্তু চল্লিশ

উপন্যাসের উপাদান আমরা বুকে নিয়ে প্রবাসে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এমন উপন্যাস নবাসীদের কাছে যার কোনো তাৎপর্য নেই, কিন্তু বাঙালীদের পক্ষে মহামূল্যবান।"

সুপ্রতীক সেন সুরসিক। পাসপোর্ট পাল্টালেই যে জাতীয়তা পাল্টায় না তাও বোঝা যায় মানুষটির সঙ্গে কথা বললে। সুপ্রতীক সাংসারিক কাজেও সমান সুদক্ষ। বাড়িটা ঝকঝকে তকতকে রেখেছেন। যে জিনিসটি যেখানে থাকবার ঠিক সেখানেই রয়েছে। রান্নাঘরটি তো ছবি তোলার মতন—কে বলবে এই গৃহে কোনো গৃহিণী নেই।

সুপ্রতীক হাসতে-হাসতে বললেন, "বাদুড়বাগানে আমি কিন্তু ভীষণ অগোছাল ছিলাম। ওয়াল্স অগোছালো অলওয়েজ অগোছালো কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। সব নির্ভর করে ট্রেনিং-এর ওপর। আমেরিকা এখনও বাঙালীদের দুটো বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারে—তা হলো স্বাধীনতা ও শৃঙখলা। যে-মানুষ জীবনযাত্রায় পরনির্ভর সে-মানুষ কী করে প্রকৃত স্বাধীন হতে পারে? আমেরিকান জীবনযাত্রার প্রেশারকুকারে তিন মাস সিদ্ধ হয়ে আমার পরনির্ভরতা উধাও হয়ে গেল, শংকরবাবু। যে-লোক জীবনে তৈরি করেনি এবং খাওয়ার পরে চায়ের কাপ টেবিলের তলায় গুঁজে রেখেছে সেই লোক বাসনমাজা, কাপড়কাচা এবং ইস্ত্রি থেকে দিশী-বিলিতী রান্না সব শিখে ফেললো। আজকাল এক-একসময় মনে হয় প্রকৃত আত্মনির্ভরতা থাকলে কলকাতার জীবনসংগ্রামে আমরা অতোটা পরনির্ভর হয়ে উঠতাম না। সেই সঙ্গে শৃঙখলা—প্রতিটা দিন, প্রতিটা মাস, প্রতিটা বছর যদি একটা পরিকল্পনা মাফিক সাজিয়ে না নেওয়া যায় তা হলে এখানে কল্কে পাওয়া খুব শক্ত।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "ভীষণ প্রতিযোগিতার বাজার, তাই না?"

"প্রতিযোগিতা বলে প্রতিযোগিতা! এবং শুধু নিজের দেশের মানুষের সঙ্গে নয়। আমি হয়তো একটা কাজ স্থানীয় কারও তুলনায় ভাল করছি, কিন্তু সেখানে হঠাৎ হয়তো একজন জাপানী অথবা সুইডিশের আবির্ভাব হলো। দরজা এখানে খোলা রয়েছে, কখন যে কে এসে কাকে চ্যালেঞ্জ জানাবে ঠিক নেই। অনিশ্চয়তাকে প্রশ্রয় দিয়েই এই দেশ নিশ্চয়তাকে নিশ্চিত করতে চায়।"

"এতো ধকল আমাদের দেশের মানুষদের সহ্য হবে না, সুপ্রতীকবাবু।"

সুপ্রতীক হেসে উত্তর দিলেন, "আমিও এদেশের হালচাল দেখে প্রথম দিকে তাই ভাবতাম। তারপর এই প্রতিযোগিতার ব্যাপারটা ক্রমশ সহ্য হয়ে গেল। আসলে সারাক্ষণ নতুনের চোখরাঙানি না থাকলে পুরাতন অতিমাত্রায় শ্লথগতি হয়ে পড়ে। আমাদের দেশে ইস্কুল কলেজ থেকে আরম্ভ করে হাসপাতাল, কলকারখানা এইজন্যে উন্নতি করছে না। এখানে কতো প্রতিষ্ঠান যে প্রতিযোগিতায় পিছু হটতে-হটতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে তার ঠিক নেই। এরা মৃত্যু নিয়ে মাথা ঘামায় না—যে এগোতে পারছে না সে যে মুছে যাবে তা সবাই মেনে নিয়েছে।"

আমি ওঁর কথাগুলো লিখে নিচ্ছিলাম।

সুপ্রতীক বললেন, "প্রতিযোগিতার পরিবেশ গড়ে উঠলে আমরা যে বিপদে পড়বে না তার প্রমাণ এদেশের বাঙালী সমাজ। এখানকার প্রত্যেকটি বাঙালী জা প্রতিযোগিতায় শুধু পাস-মার্ক পেলেই চলবে না, স্থানীয় লোকদের থেকে ভাল কর হবে আমাদের, তবেই তো বিদেশে আমরা বেঁচে থাকতে পারবো।"

"আপনি বলছেন, আমরা এদেশে সারাক্ষণই জিতে যাচ্ছি?"

"সেটা বলা হয়তো সম্পূর্ণ ঠিক হবে না। অনেক সময় আপনি যে কাজটা শিখেছে সেই কাজটারই বাজারদর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমার বন্ধু সুশীল পোদ্দার এদেশে এসেছি জিওলজিস্ট হিসেবে—কিন্তু এদেশে ভূতত্ত্বের বাজার পড়ে গেল। সুশীল এদেশে মনোবৃত্তি গ্রহণ করে, স্পোর্টিং স্পিরিটে এই বয়সে বৃত্তি পাল্টালো। বিদেশের পাস করা জিওলজিস্ট এখন রিয়াল এস্টেট এজেন্ট, যাকে বলে কিনা বাড়ির দালাল ভালই করছে সুশীল—বৃত্তি পরিবর্তনের জন্যে তার ফ্যামিলিতে কোনো উদ্বেগ নেই আমাদের দেশে কোনো কলেজের শিক্ষককে বাদামভাজার দোকান দিতে বললে তি হয়তো আত্মহত্যা করে বসবেন। শুনলে অবাক হবেন, সুশীল চুল ছাঁটার ট্রেনিং- নিয়ে রেখেছে, রিয়েল এস্টেটে কিছু গোলমাল হলে একটা হেয়ার ড্রেসিং সেলু ফ্রানচাইজ নিতে পারবে।"

সুপ্রতীক সেনের নিঃসঙ্গতার কারণ সম্পর্কে আমার কৌতূহল স্বাভাবিক। এ বিষয়েও খোলাখুলি কথা হলো। সুপ্রতীকের মন্তব্য, "রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতি স্বাধীনতার মতন সামাজিক স্বাধীনতাও একটা মস্ত জিনিস। আপনি একলা থাকে না বিবাহিত, না অবিবাহিত অবস্থায় কারও সঙ্গে ঘর করছেন এ-বিষয়ে এদেশে কার কোনো মাথাব্যথা নেই। আপনি যেরকম থাকতে চান সেরকম থাকুন ; শুধু আমা ঘাড়ে চাপবেন না—এই হচ্ছে এদেশের সামাজিক নীতি। এর সুফল হলো আপ সব অর্থে স্বাধীন ; আর কুফল হলো আপনি নিজের ব্যাপার ঠিকমতন সামলা না পারলে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। এই নিঃসঙ্গতা ভয়াবহ হতে পারে। বাঙালীরা সাধারণ নিঃসঙ্গ হয় না ; কারণ দেশ থেকে আমরা পৈতৃক শরীরটুকু ছাড়াও কিছু মূল্যবো নিয়ে এসেছি—আমাদের নিজেদের মধ্যে টান আছে। আর নিজের জাতের প্রতি টান এদেশে খারাপ চোখে দেখা হয় না। আমরা যাকে প্রাদেশিকতা বলে গালাগালি ক সেইটাই এখানে স্বাভাবিক মনে করা হয়। তুমি যদি ইতালিয়ান হও তা হ ব্যবসাবাণিজ্যের ব্যাপারে একটু ইতালিয়র দিকে ঝুঁকবেই ; তুমি ইতালিয় অ্যাকাউন্টে রাখবে না তো কে রাখবে? তোমার আপিসে ইতালিয় কর্মী কিছু থাকতেই পারে এদের চাকরি দিয়ে তুমি যদি কমপিটিশনে টিকে থাকতে পারো তা হলে কার বলবার আছে?"

"দৃষ্টিকোণটি বেশ অভিনব," আমাকে স্বীকার করতে হলো।

সুপ্রতীক বললেন, "এদের বক্তব্য, তুমি যাদের জন্যে দরদ অনুভব করছো তারা ইতালিয় বংশোদ্ভব হলেও আমেরিকান, সুতরাং তোমার ভালবাসায় আমেরিকাই উপকৃত হচ্ছে। এই জন্যেই তো ইহুদিরা চড়া গলায় ইজরায়েলকে সাপোর্ট করে, মদত দেয়। আমাদেরও কোনো বাধা নেই। আমরাও যতো ইচ্ছে ভারতবর্ষকে ভালবাসতে পারি ; ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি। আপনি দেখবেন, তৃতীয় প্রজন্মের ভারতীয়-আমেরিকানদের কাছ থেকে ওই লাভটাই অক্ষত থাকবে—তারা হিন্দি অথবা বাংলায় কথা বলতে না-পারলেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভালবাসা মুছে যাবে না। এদেশে সবাই আমেরিকান, আমিও আমেরিকান, কিন্তু ভারতীয়-আমেরিকান হিসেবে আমার বাড়তি কিছু উত্তরাধিকার আছে এই কথা ভাবতে এরা গর্ববোধ করবে।"

নিজের প্রসঙ্গে ফিরে এলেন সুপ্রতীক। "যারা ছাত্র হিসেবে এদেশে আসে তাদের সঙ্গে আমেরিকার পরিচয়টা অনেক নিবিড় হয়। কর্মসূত্রে যারা আমেরিকাবাসী তাদের অনেক সময় এদেশের সঙ্গে পরিচয়ই হয় না। কোনোক্রমে দুপুরবেলায় আমেরিকায় কাজ করে তারা প্রতিদিন বিকেলে ইন্ডিয়ায় ফিরে যায়। দেশ থেকে আনা বউ হলে তো কথাই নেই। আমেরিকা কি জিনিস তা তারা বুঝতে শুরু করে ছেলেমেয়ে ইস্কুলে পড়তে শুরু করলে। তখন যেসব সমস্যার উদয় হয় তা আপনাদের লক্ষ্য করা উচিত। এইসব পরিবার দেখলে সহজেই বুঝতে পারবেন দুটো সভ্যতার পার্থক্য কোথায়।"

আমি চুপচাপ সুপ্রতীকের কথা শুনে যাচ্ছি। তিনি বললেন, "আমি এদেশেও ছাত্রজীবনের কিছুটা কাটিয়েছি। তারপর, শংকরবাবু, এদেশের মেয়েও বিয়ে করেছিলাম। বাবামায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। নিজের ইচ্ছাটুকু ছাড়া অন্য কারও ইচ্ছার বিন্দুমাত্র মূল্য নেই এই সভ্যতায়—সুতরাং বিয়েতে অন্য কোনো অসুবিধে হয়নি। বাদুড়বাগানের বরের সঙ্গে আটলান্টার অ্যালিসার সম্পর্ক কী রকম হতে পারে তা আপনাকে পরে একদিন বিস্তারিতভাবে বলবো। এখন শুধু জানিয়ে রাখি, আমি মাতাল ছিলাম না। দেহমিলনে অক্ষম ছিলাম না, আমার স্ত্রীরও পরপুরুষে আকর্ষণ ছিল না, প্রাণবন্ত ঘরণী ছিল সে। তবু আমাদের বিয়ে টিকলো না। আমাদের ডাইভোর্স হয়ে গেল। ওই জিনিসটা এখানে সর্দিকাশির মতন—সবারই এক-আধবার হচ্ছে, মাথা ঘামাবার কিছু নেই। কয়েকদিন বিশ্রাম নাও, নিজেকে সবল করে তোলো, তারপর আবার সঙ্গীসংগ্রহে মন দাও। আমার বাবা-মা বিয়েতে যতো কষ্ট পেয়েছিলেন, বিয়েভাঙায় কষ্ট পেলেন তার অনেক বেশি। তারপর পরামর্শ দিলেন দেশের মেয়ে বিয়ে করতে। আমি প্রতিবাদ জানাইনি। তখন ওঁরা দেশের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন। সেই বিজ্ঞাপনের কাটিং আমার কাছে পাঠালেন। বিজ্ঞাপনটা পড়ে আমার মাথা ঘুরে গেল।"

আমার মুখের দিকে তাকালেন সুপ্রতীক। "বাংলায় যে এমন একটা কথা তৈরি হয়েছে তা আমার জানা ছিল না।"

শব্দটা জানবার জন্যে আমার আগ্রহ হচ্ছে।

সুপ্রতীক জানালেন, " 'নামমাত্র বিবাহিত' ডাইভোর্সি পাত্রের জন্য পাত্রী চাই।...বিজ্ঞাপনের কয়েকটা উত্তর বাবা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়েদের বাপমায়েরা তাঁদের মেয়েদের আমেরিকায় কর্মরত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে কতটা ব্যাকুল তা আমার ধারণা ছিল না। কিন্তু আমার মনের মধ্যে তখন শুধু ওই 'নামমাত্র বিবাহিত' কথাটা ঘুরপাক খাচ্ছে। অ্যালিসার সঙ্গে আমার প্রাক্‌বিবাহ প্রণয় হয়েছে, তারপর বিবাহ করে আমরা ঘরসংসার পেতেছি ; আমাদের সন্তান হয়নি ; কিন্তু আমাকে নামমাত্র বিবাহিত বলা চলে না। একদিন কথাটার অর্থ চিন্তা করতে করতে আমি অনেকটা ড্রিংক করে বসেছিলাম। নেশার ঘোরে আমি অ্যালিসাকে টেলিফোন করে ফেললাম। জানতে চাইলাম আমাদের বিবাহকে 'নামমাত্র বিবাহ' বলা চলে কি না।

অ্যালিসার সঙ্গে আমার বিবাহ বিচ্ছিন্ন, কিন্তু সেও অবাক হয়ে গেল। বললো, "প্রতীক, আমরা বিবাহ করেছিলাম, বিবাহিত জীবন যাপন করেছিলাম। আমরা ভবিষ্যতে যাই করি, আমাদের বিবাহটা জীবনের একটা পরিচ্ছেদ হয়ে থাকবে।"

আমি এখানে দেশ থেকে সদ্য-আগতা এক বাঙালী বধূকে জিজ্ঞেস করলাম এর অর্থ। সে যা বললো তাতে আমার মাথা ঘুরে গেল। দুম করে বাবাকে চিঠি লিখে দিলাম, "নামমাত্র বিবাহ শব্দটির মধ্যে ইঙ্গিত রহিয়াছে বিবাহের পরে দেহসম্পর্ক হয়নি। মিথ্যাচারের ওপর কোনো চিরস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে ওঠা যুক্তিযুক্ত নয়। আমি রীতিমত বিবাহিত এবং ডাইভোর্সড।"

"আমি আমার মার্কিনী বন্ধুমহলে যতই কথাটা আলোচনা করেছি ততই তারা বিস্মিত হয়েছে। নামমাত্র বিবাহিত শব্দটি একমাত্র ভারতবর্ষেই আবিষ্কৃত এবং ব্যবহৃত হতে পারে বলে তাদের ধারণা।"

আমার কাপে আরও কিছুটা কফি ঢেলে সুপ্রতীক বললেন, "আমি বুঝলাম, সব ব্যাপারে ভারতর্ষের সঙ্গে তাল রেখে চলার ক্ষমতা আমি হারিয়ে ফেলেছি। বাবাকে লিখে দিলাম—আমার বিবাহে প্রয়োজন নেই।"

এবার হা-হা করে হাসলেন সুপ্রতীক। "দেশে গিয়ে যদি পারেন, এই নামমাত্র বিবাহিতদের সম্বন্ধে একটু উল্লেখ করবেন। এমন একটা অদ্ভুত শব্দ কী করে আমাদের সামাজিক বিজ্ঞাপনের অঙ্গ হয়ে উঠলো তা অনুসন্ধান করলে হয়তো নতুন কিছু জানতে পারবেন। তবে আমার সম্বন্ধে কোনো চিন্তা করবেন না। যেসব কারণে বাদুড়বাগানের ছেলেরা বিয়ে করে তার কোনোটাই এখানে নেই। ওখানে প্রশ্ন ঃ রান্না করে খাওয়াবে

কে ? উত্তর ঃ মাইক্রোওয়েভ যন্ত্র। তাছাড়া এদেশে এতো তৈরি খাবার পাওয়া যায় ! রান্না না জানার জন্যে এখনও একটি লোক পৃথিবীর কোথাও অনাহারে মারা যায়নি। জামাকাপড় কাচবার জন্যে বউ প্রয়োজন হয় না, ওয়াশিং মেশিন আছে। অসুখ করলে হাসপাতাল আছে। এমন কি, মরে যাবার পর বুক চাপড়ে শোক করার জন্যেও প্রফেশনাল কোম্পানি আছে। বলবেন, সারাদিন খেটেখুটে এসে একটু সময় কাটানো, একটু কথাবার্তা। তার জন্যে টি-ভি আছে—আটাশটা চ্যানেল। টেলিফোন আছে—যার সঙ্গে খুশি গল্পগুজব করা যেতে পারে। আমার এক বন্ধু আছে—এখান থেকে একত্রিশ মাইল দূরে থাকে। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় আধ ঘন্টা ফোনে আড্ডা হয়—ওরও বউ নেই।"

সাজানো সংসারের চাবিটি আমার হাতে দিয়ে সুপ্রতীক সেন কর্মক্ষেত্রে বেরিয়ে গেলেন। বললেন, "প্রাণখুলে খান, বই পড়ুন, লেখালিখি করুন. ফোন করুন। এ-অঞ্চলে আপনার ভক্তের সংখ্যা বেশী না হলেও শূন্য নয়। স্থানীয় বঙ্গীয় সমাজের টেলিফোন তালিকা আমার টেবিলের ওপরেই রইলো। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসছি।"

আমি জানি নিয়মানুবর্তিতার দেশ আমেরিকা। এখানে কর্মক্ষেত্রেও কঠিন শৃঙ্খলা। বললাম, "আমার জন্যে নিজের অসুবিধে সৃষ্টি করবেন না।"

সুপ্রতীক বললেন, "আপনি একটুও ভাববেন না। একই আপিসে অনেকদিন কাজ করছি—পুরনো চাল ভাতে বাড়ে। তাছাড়া আমাদের বাঙালী ব্রেন, প্রচণ্ড চাপের মধ্যেও কী করে একটু ফাঁকি মারা যায় তা খুঁজে বার করে নিতে পারে। আপনার অবগতির জন্যে জানাই, ফাঁকি মারতে খোদ আমেরিকানও কম যায় না। বাইরে ওই রকম বলে বেড়ায় সব কিছু স্কেডিউলের শিকলে বাঁধা। ওসব মিটিং কা বাত—সবাই যদি পুরনো যুগের আমেরিকানের মতন নিষ্ঠাবান হতো তা হলে জাপানিদের হাতে জাতটার এই বে-ইজ্জতি হতো না।"

নরম বিছানায় শুয়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে আমি 'নামমাত্র বিবাহিত' শব্দটি সম্পর্কে চিন্তা করছি। পাত্রপাত্রী স্তম্ভে শব্দটি লক্ষ্য করেছি কিন্তু কথাটা কেন বিস্ময় জাগায়নি তাই ভাবছি।

এদেশে বিবাহ থেকে মানুষের প্রত্যাশা অনেক। অন্নবস্ত্র সুরক্ষার জন্যে এদেশের মেয়েরা স্বামীর গলায় মালা দেয় না। এমন কি সেক্সও বিবাহসম্পর্কের বাইরে যথেষ্ট পাওয়া যায়। সত্য কথা বলতে কি. বিবাহ মানেই বাধাবন্ধনহীন দেহবিলাসের ওপর নিয়মশৃঙ্খলার আধিপত্য। আসলে বিবাহ একটা বিরাট জিনিস। অ্যালিসা ঠিকই বলেছিল সুপ্রতীককে, বিয়েটা নামমাত্র বিবাহে পর্যবসিত যাতে না হয় সেই জন্যই ডাইভোর্স করেছি আমরা।

আমার হঠাৎ মনে হলো, ভারতবর্ষে আমরা প্রায় সকলেই নামমাত্র বিবাহিত। কারণ, আদর্শবিবাহিত জীবনের বিস্তৃতি ও গভীরতা আমাদের অজ্ঞাত। আমরা স্রেফ একদিন উপোস করে ঘন্টাখানেকের ওং ভোং করে সন্ধ্যেবেলায় একটি উপোসী মেয়ের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিই। তারপর ঘরসংসারের নাম করে একটি মেয়ের অন্নবস্ত্রের যোগান দিই। তারপর আমরা সন্তান উৎপাদন করি, সন্তান মানুষ করতে-করতেই আমরা ল্যাজেগোবরে হয়ে যাই। যুগলজীবনের গভীরে প্রবেশের প্রচেষ্টাই নেই আমাদের মধ্যে, অথচ আমরা বিবাহিত। সুতরাং 'নামমাত্র বিবাহিত' শব্দটি আমাদের ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থে প্রযোজ্য।

বিবাহ প্রসঙ্গে আচমকা রূপার কথা মনে পড়ে গেল। রূপা একসময় চৌধুরী ছিল। বিয়ের পর হয়েছিল রূপা মিত্র। তারপর বিশেষ বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এখন তার পদবী কী হয়েছে কে জানে! অথচ রূপার সঙ্গে আমার একবার দেখা হওয়া প্রয়োজন। কত ঘটনা যে সুদূর কলকাতায় শুরু হয়ে সুদূর প্রবাসে হাজির হয়েছে, কিন্তু অসমাপ্ত রয়ে গিয়েছে তার ঠিকঠিকানা নেই।

ওই যে বঙ্গীয় সম্মেলনে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বললেন, আমরা সবাই ভাগ্যসন্ধানে বিদেশ পাড়ি দিয়েছিলাম তা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। অবশ্য ভাগ্য বলতে যদি শুধু বৃত্তি ও অর্থ বোঝায়।

রূপা মিত্রর তো বৃত্তি ও অর্থ কোনোটার ওপরেই তেমন আকর্ষণ ছিল না। কবে কোথায় হাওড়ার এক অখ্যাত গলিতে রূপার শাশুড়ীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, তার জের বিদেশে টানার কোনো মানে হয় না। কিন্তু তাঁকে আমি কথা দিয়েছিলাম, সুযোগ পেলে আমি রূপাকে খুঁজে বার করবো।

মাসীমা আমাকে পুরো বিশ্বাস করতে পারেননি। আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, "হাজার কাজে ব্যস্ত, তুমি ভুলে যাবে।" আমার থেকে শত গুণ ব্যস্ত লোক পৃথিবীতে আছে, আমি ভুলবো না, মাসীমাকে আমি আশ্বাস দিয়েছিলাম।

আমি তখনই শুনেছিলাম, রূপা ও প্রতিমাদি দু'জনেই এই যেখানে আমি এই মুহূর্তে শুয়ে আছি তার কাছাকাছি কোথাও বসবাস করেন।

(প্রতিমাদির গল্প পরে বলা যাবে।)

রূপা কোনোদিন আমার সঙ্গে বিদেশ থেকে পত্রালাপ করেনি, শুধু এদেশে পৌঁছে আমাকে একটা রঙিন পিকচার পোস্টকার্ড পাঠিয়েছিল। তাতে লিখেছিল, "শংকরদা, অবশেষে আপনার আবিস্কৃত দেশে হাজির হয়েছি, পরে বিস্তারিত খবরাখবর দেবো।"

পরে আর কোনো খবরাখবর সরাসরি রূপার কাছ থেকে আসেনি। কিন্তু মাসীমার কাছে আমি যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তা বোম্বাই থেকে মার্কিন মুলুকের বিমানে চড়েই আমার মনে পড়েছিল। জীবনটা কেমন এক ধারাবাহিক উপন্যাসের মতন এগিয়ে

চলেছে—কত চরিত্র সেখানে উপস্থিত হচ্ছে, বিস্তারিত হচ্ছে, আবার কিছু সময়ের জন্যে হারিয়ে যাচ্ছে পরিসমাপ্তির আগে। কত মানুষের সঙ্গে হঠাৎ পরিচয় হলো, কত সুখ-দুঃখের ইতিহাস আমার চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হলো, ভাবলে এক-একসময় বিস্ময় লাগে। ঈশ্বর আমাকে অনন্ত সুযোগ দিয়েছেন। বহুমানবের তীর্থশালায় প্রবেশের অনুমতি পেয়ে আমি ধন্য।

বেঙ্গল সোসাইটির সভ্যতালিকায় রূপার নামটা যে অতো সহজে খুঁজে পাবো তা কল্পনা করিনি।

রূপার টেলিফোন নম্বর আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে; আর আমি ভাবছি, আচমকা এইভাবে রূপাকে টেলিফোন করাটা যুক্তিসঙ্গত হবে কি না। ভারতবর্ষে মানুষের বিন্দুমাত্র প্রাইভেসি নেই, তাই সেখানকার মানুষ বিদেশে এসে প্রথমেই প্রাইভেসির ভক্ত হয়ে ওঠে। প্রাইভেসির অভাব যে কী নিদারুণ অস্বস্তির কারণ হতে পারে তা মার্কিনীরা জানে না। প্রাইভেসি শব্দটার অর্থ গোপনীয়তা বললে সবটা পরিষ্কার হয় না। 'গোপনীয়তা' শব্দটার মধ্যে কিছুটা লুকনো-লুকনো ভাব আছে।

হাওড়ার যে পরিবেশে আমি মানুষ হয়েছি, সেখানে প্রাইভেসি মানে কলঘরের দরজা ভিতর থেকে আঁটবার ব্যবস্থা যাতে মেয়েরা নিশ্চিন্তে কাপড় ছাড়তে পারে। প্রাইভেসির প্রসার যে অনেক বিস্তৃত তা সমাজের উঁচুতলায় না-উঠলে পরিপূর্ণ বোঝা যায় না। আমেরিকান মেয়ে ক্যাথারিন আমাকে বলেছিল, 'প্রাইভেসি মানে নিজেকে নিজের কাছে রাখার অধিকার। তোমরা কোনোদিন প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা সবাইকে প্রাইভেসির অধিকার দিচ্ছো। পরের ব্যাপারে অকারণ নাক গলিয়ে গলিয়ে তোমাদের প্রত্যেকটা মানুষের নাকে কালসিটে পড়ে গিয়েছে; তাই তোমরা নিজেদের আবিষ্কার করতে পারছো না।' ক্যাথারিনের বলার অধিকার আছে, সে হাওড়ার টিকিয়াপাড়ায় এবং বাগনান গ্রামে ন'মাস কাটিয়ে গিয়েছে। তার গবেষণার বিষয় ছিল পাড়াপড়শীদের সম্পর্ক।

রূপার মুখের ছবিটা আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠছে। রূপা স্বভাবতই বিরক্ত হতে পারে, সাতসমুদ্র পেরিয়ে আমি তাকে তাড়া করছি কেন? যে সব কথা সে ভুলতে চাইছে তা আমি কেন গায়ে পড়ে তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি? আমি যতদূর জানি, বহু বছর সে দেশে ফেরেনি, আমার জানাশোনা লোকের কাছে সে চিঠি লিখেছে এখনও শুনিনি। আসলে দেশের সঙ্গে সে বোধহয় কোনো যোগাযোগই রাখতে চায় না।

রূপার মনোভাব যদি সত্যিই অমন হয় তা হলে আমার বলবার কিছু থাকতে পারে না। হাজার হোক, একটা জীবন নিয়েই আমাদের হিসেবনিকেশ। যে দেশে আমি জন্মেছি সে দেশেই যে আমাকে মরতে হবে তার কোনো আইন নেই—বার্ধ

সার্টিফিকেটের সঙ্গে ডেথ সার্টিফিকেটের কোনো সম্পর্ক নেই। যে দেশে আমি শৈশব, কৈশোর ও যৌবন কাটিয়েছি তার থেকে দূরে আসবার সরকারী পাসপোর্ট যদি আমার মিলে থাকে তা হলে সে দেশের সঙ্গে সব যোগাযোগ ছিন্ন করার অধিকারও আমার আছে।

আমি দ্বিধায় পড়ে গেলাম। রূপাকে ফোন করাটা আমার কী ঠিক হবে? নানা জনপদ ঘুরতে-ঘুরতে আমি যদি রূপার বাড়ির খুব কাছাকাছি এসেও থাকি তাতে কী এসে যায়? কত হাজার-হাজার লোক প্রতিদিন এই দেশে আসছে। তাদের অনেকেরই বসবাস কলকাতায়, তারা তো রূপার প্রাইভেসি ভঙ্গ করছে বলে শুনিনি। কিন্তু মাসীমার কথাও আমার মনে পড়ে যাচ্ছে। মাসীমা বিছানায় শুয়ে বলেছিলেন, "মনে থাকবে তো?" স্বীকার করছি, আমি মাসীমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। যে মানুষ আর পৃথিবীতে নেই তাকে কোনো কথা দেওয়া থাকলে তা পালনের চেষ্টা করা উচিত এমন একটা রেওয়াজ সব সমাজে আছে। কিন্তু এর মধ্যে কোথাও ফাঁকিও আছে। মাসীমা যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন কত লোককে ডেকে ডেকে তিনি কত অনুরোধ করেছেন, কেউ সে সব অনুরোধ রাখেনি। সুতরাং শেষ অনুরোধের কোনো বাড়তি মূল্য থাকাটা অর্থহীন।

না। এতোদূর যখন এসেছি তখন রূপার সঙ্গে যোগাযোগ করাটাই যুক্তিযুক্ত। মধ্যপশ্চিমের এই শহরে আমি সুপ্রতীক সেনের আকর্ষণেই ছুটে আসিনি : আমার প্রধান লক্ষ্য অবশ্যই রূপা। এরপর আছেন প্রতিমাদি। দেশটা যতই বড় হোক মানুষকে খুঁজে পাওয়া এখানে ততটা শক্ত নয়। তার একটা কারণ টেলিফোন। টেলিফোন ছাড়া কোনো বাড়ি এদেশে আছে কি না সন্দেহ। ধন্য আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেলসায়েব তোমার আবিষ্কার! কোনো মানুষই তোমার থেকে পাঁচ সেকেণ্ডের বেশি দূর নয়। এই অসাধারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিক মার্কিন সভ্যতার ভিত্তিভূমি। কেউ কখনও বিনা নোটিসে কারও বাড়ি হাজির হয় না; প্রথমেই টেলিফোনে সময় ঠিক করে নিতে হয়। টেলিফোন খারাপ অথবা চেষ্টা করেছিলাম কনেকশন হয়নি এই বুজরুকি মার্কিন দেশে অচল। ভারতবর্ষে নিজেদের কত দোষ মানুষ বিকল টেলিফোন ও বিফল ডাকবিভাগের ওপর চাপিয়ে দেয়। সুপ্রতীক সেনের মুখেই শুনেছিলাম, যেমন দেশ তেমন টেলিফোন, বলে একটা প্রবাদ মার্কিন সমাজে চালু আছে। টেলিফোন যন্ত্র যে আদৌ খারাপ হতে পারে তা মার্কিন দেশে বসবাস করলে বিশ্বাস হয় না।

আজকাল আবার টেলিফোন থেকে কত বাড়তি পাওনা। এই যে একলা মানুষ সুপ্রতীক সেন। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় যন্ত্রটিকে রিডিরেক্ট করে যেতে পারেন। মনে করুন, সুপ্রতীক তাঁর বন্ধু অবিনাশের বাড়িতে যাচ্ছেন।

সমস্ত কল্ বিনাবাক্যব্যয়ে অবিনাশের ফোনে চলে যাবে। অন্যত্র কনফারেন্স কল্-এর কথা লিখেছি।

শহরের তিন বন্ধু একসঙ্গে তিন পাড়া থেকে একত্রে টেলিফোনে আড্ডা দিতে পারেন। আড্ডা জিনিসটা আমেরিকানদের মনঃপূত নয়, তাই বলা হয় কনফারেন্স। আমাদের দেশে অফিসের আড্ডাকে যেমন প্রায়ই মিটিং বলা হয়। দেশী সায়েবরা চা খেতে-খেতে প্রাণ খুলে গল্পগুজব করছেন, কিন্তু দর্শনপ্রার্থীকে বেয়ারা বলছে সাব 'মিটিন' মে হ্যায়।

এবার সমস্ত দ্বিধা ত্যাগ করে রূপার নম্বরে ডায়াল করলাম। রূপা ফোন ধরলো না, কিন্তু রূপার সেই পুরনো কণ্ঠস্বর ভেসে উঠলো। "হাই ! রূপা বলছি। আমি একটু বেরুচ্ছি, ফিরবো দশটা নাগাদ। যদি কিছু বলবার থাকে বলে ফেলো।"

আমি বুঝলাম যান্ত্রিক টেলিফোন অপারেটর কাজ করছে। একটি টেপ রেকর্ডার থেকে রূপার নিজস্ব কণ্ঠস্বর যা শোনা যাচ্ছে। সুপ্রতীকের কাছে আজ সকালেই শুনেছি, বন্ধুবান্ধবরা অনেক সময় মজা করে গালাগালি রেকর্ড করে রাখে। যেমন : "তুমি হতচ্ছাড়া সারাক্ষণই বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়াও। কতদিন আর এমন বাউণ্ডুলে থাকবে ? বাড়ি ফিরেই লুচি, আলুরদম আর চিকেন কারি রাঁধতে বসবে, আমরা জনা পাঁচেক অতিথি হাজির হচ্ছি।" অনেক সময় ইংরিজীর দেশে বাংলায় মেসেজ দেওয়া থাকে বিশেষ কারও জন্যে। প্রথমে ইংরিজী ঘোষণা। তারপরেই হয়তো : "জগদীশ, শালা তোর মুখদর্শন করতে চাই না। সেই জন্যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। দুপুরটা আমার ফ্রি, বাড়িতেই থাকবো, রান্নাবান্নাও করা আছে—কিন্তু তোর জন্যে নয়।" যন্ত্রকে কেন্দ্র করেও নানা রসিকতা চলে এইভাবে। রেকর্ডেড বাণী শুনে জগদীশ বুঝবে আজ দুপুরে তার নেমন্তন্ন রয়েছে। বন্ধু নিশ্চয় বাজার করতে বেরিয়েছে।

সুপ্রতীক বললেন, "ঘুমোবার সময়ে, অথবা টানা বিশ্রাম নেবার প্রয়োজন হলে, অথবা কোনো কাজ মন দিয়ে করার সময় এই রেকর্ডার চালানো যায়। নির্দিষ্ট সময়ের পরে আপনি দেখে নিন কেউ ফোন করেছিল কি না। যোগাযোগ ব্যবস্থা ত্রুটিহীন বলে আপনার প্রাইভেসি নষ্ট হবে তা এদেশের লক্ষ্য নয়। টেলিফোনের কল্যাণে দূর যেমন নিকট হয়েছে, তেমন ইচ্ছে করলে কাছে থেকেও দূরত্ব সৃষ্টি করা যায়।"

রূপার ফোনে হেঁয়ালি করার ইচ্ছে হলো। মজা করে বললাম, "আমি কে তা আন্দাজ করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়, রূপা। তবে যদি ইচ্ছে করো একবার এই নম্বরে ফোন করো...।"

আমার টেলিফোন নামিয়ে রেখেছি। ভালই হয়েছে, রূপা বাড়িতে ছিল না। এখন রূপার প্রাইভেসিকে সম্মান করা গেল, তার ইচ্ছে হলে যোগাযোগ করবে, ইচ্ছে না হলে ফোন করবে না।

আমেরিকান সোফায় আধশোয়া অবস্থায় ক্রমশ ইন্ডিয়ায় ফিরে যাচ্ছি। দেশে যখন থাকি তখন প্রায়ই বিদেশ দেখার ইচ্ছে হয়, কিন্তু বিদেশে এলেই দেশের জন্যে মন কেবলই আনচান করে। আমি বেহালায় ঘোষাল লেনের রূপাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। সরু রাস্তাটা সরু হতে হতে এমন সরু হয়ে গিয়েছিল যে সেখানে রিকশ ঢোকাও কষ্টকর ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরীতে ইংরেজের শাসনকালে এইসব পথঘাট কীভাবে সরকারী স্বীকৃতি পেয়েছিল তা আন্দাজ করা অসম্ভব। হয় তখনও নগরপরিকল্পনা সম্বন্ধে কোনো ভাবনা-চিন্তা ইংরেজের মস্তিষ্কে প্রবেশ করেনি, না-হয় ঘুষ নামক মহাশক্তি তখনও সক্রিয় ছিল। কালা আদমির মহল্লায় মানুষ কীভাবে বসবাস করবে সে সম্বন্ধে কোনো মাথাব্যথা ছিল না।

সেই সরু গলিতে আমি রূপাকে নানা রূপে দেখেছি। বেহালা ঘোষাল লেনের সেই সরু গলি পেরিয়ে, ভারতবর্ষকে পিছনে ফেলে রেখে রূপার মতন মেয়ে যে কখনও এই সুদূর দেশে আসতে পারবে তা আমার কল্পনার অতীত ছিল। এই আসার পিছনে আমারও একটু ইন্ধন ছিল কি না তা আমার ঠিক মনে পড়ে না। কিন্তু মাসীমা যখন খুব মানসিক যন্ত্রণা পেতেন তখন বলতেন, "কী যে হলো! কেন যে রূপাকে তুমি আরও পড়বার জন্যে উৎসাহ দিলে!" আমি চুপচাপ থেকেছি। সমস্ত জীবনে অনেক ছেলে-মেয়েকেই পড়াশোনায় উৎসাহ দিয়েছি, সময়কালে নিজে ওই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি বলে মনের কোথাও দুঃখ ছিল। উৎসাহ, অনুপ্রেরণা পেলেই পড়াশোনায় মন বসে না—কত জানাশোনা ছেলেমেয়ে আমার কথা এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বার করে দিয়েছে। একমাত্র রূপাই হঠাৎ যখন বিপুল উৎসাহ নিয়ে অধ্যয়ন তপস্যায় ডুবে গেল তখন নিশ্চয় অন্য কোনো শক্তি তার মধ্যে কাজ করছিল। মাসীমা শুধু-শুধু আমার ওপর দোষটা চাপাতে চান। আমার বলবার কিছু নেই।

কিন্তু সবচেয়ে যা আশ্চর্য, বিদেশ সম্বন্ধে রূপার বিন্দুমাত্র জ্ঞান ছিল না। একবার বিদেশে গিয়ে আমি তখন বিদেশ বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছি। কত লোককে বোঝাবার চেষ্টা করছি আমেরিকা দেশটা কত বড়, খান কয়েক ভারতবর্ষ তার মধ্যে ঢুকে পড়বে। কী অবিশ্বাস্য বিস্তৃতি এই দেশের এবং কী তার বৈচিত্র্য ও বৈভব।

সদ্যপ্রাপ্তজ্ঞান থেকে আমি কতজনকে বোঝাচ্ছি ওয়াশিংটন বললে চলবে না, সঙ্গে ডি-সি কথাটাও লাগাতে হবে যদি আমেরিকার রাজধানী বোঝাতে চায়। কারণ আরও অনেকগুলো ওয়াশিংটন আছে ওদেশে—আমাদের নেতাজী নগর অথবা মহাত্মা গান্ধী রোডের মতন। মায় লন্ডন শহরও আছে মার্কিন দেশে—একটু অসাবধান হলেই বিপদ।

যাদের বিদেশ সম্বন্ধে হাতেখড়ি দিয়েছি তাদের কয়েকজন শেষ পর্যন্ত বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। আমেরিকায় তারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আমার

এবারের বিদেশ থাকাকালীন তারা কেউ-কেউ দেখা করেছে। আমি তাদের তুলনায় বিদেশ সম্বন্ধে কত কম জানি ; তাদের অনেকেই মার্কিন সভ্যতা সম্পর্কে আমার অজ্ঞতা দূর করেছে। আমার অবস্থা প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টারের মতন। যাদের হাতেখড়ি দিয়েছিলাম তারাই সময়ের স্রোতে বিদ্যার জাহাজ হয়েছে, আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই পড়ে আছি।

রূপার কথাটা স্পষ্ট মনে আছে। ঝট করে কোথা থেকে একটা স্কুল অ্যাটলাস নিয়ে এলো, তারপর নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, স্যানফ্রানসিসকো কিছুই খুঁজে না পেয়ে এমন ভাব করলো যেন ওসব শহরই নেই। বড় বড় শহরের সমস্যা শেষপর্যন্ত সমাধান হলো. কিন্তু যখন আমি চ্যাপেল হিল নামে ছোট্ট একটি বিশ্ববিদ্যালয় শহরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলাম তখন রূপা আমাকে চ্যালেঞ্জ করলো, ম্যাপে দেখিয়ে দিন। অনেক খোঁজখবরের পরও যখন মানচিত্রে চ্যাপেল হিলের সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে আমাকে বলতে হলো, ওটা চ্যাপেল হিলের দোষ নয়, ম্যাপের দোষ। কিংবা চ্যাপেল হিলের মানুষরা দূরদর্শী—ম্যাপে নাম ছাপিয়ে আজেবাজে লোককে আকর্ষণ করে তারা পুরবাসীদের শান্তি বিঘ্নিত হতে দেয়নি। আমি বলেছিলাম, "রূপা. তুমি ব্যাপারটা বোঝো। ম্যাপটা ছোট।" সুরসিকা রূপা তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিল, "বাঃ শংকরদা, ইন্ডিয়ান মেয়ে পেয়ে বোকা বানাবার চেষ্টা করছেন ! বড়-বড় ম্যাপে বড়-বড় শহরের কথা থাকবে, ছোট-ছোট ম্যাপে ছোট ছোট জায়গার নাম থাকবে।" রূপার সেই রসিকতা আমার এখনও মনে আছে। মেয়েটা তখনও কত সহজ. সরল ও অনভিজ্ঞ ছিল। সেই রূপাই এখন আমেরিকাপ্রবাসী, ভাবতে অবাক লাগে।

আধুনিকতার তীর্থভূমি আমেরিকায় এসে ভারতবর্ষের সহজ সরল মানুষদের দ্রুত পরিবর্তনের ব্যাপারটা আমাকে বিস্মিত করে জেনে সুপ্রতীক মৃদু হেসেছিলেন। বলেছিলেন, "বাইরের গেঁয়ো লোকেরাই এদেশে এসে মডার্ন আমেরিকান হয়ে যায়। এর অসংখ্য মজার ছবি পাবেন মার্কিনপ্রবাসী ইহুদি সাহিত্যিকদের লেখায়। আধুনিকতার পীঠস্থান নিউইয়র্কে কিছু-কিছু গাঁইয়া ইহুদির ছবি সিংগার ইত্যাদি ইহুদি সাহিত্যিক যেভাবে এঁকেছেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। খবরের কাগজে রিপোর্ট বেরুলে ভাবতাম গালগল্প, ইহুদিদের ছোট করবার জন্য লিখছে। কিন্তু আপনিই তো লিখেছেন, কাগজের রিপোর্টে চরিত্রগুলো সত্য হলেও ঘটনাগুলো কাল্পনিক, আর গল্প-উপন্যাসে চরিত্রগুলো কাল্পনিক হলেও ঘটনাগুলো প্রায়শই সত্য।"

সুপ্রতীক ইতিমধ্যেই আমাকে কয়েকটি ইহুদি গল্পসংকলন উপহার দিয়েছেন। মাত্র কয়েক বছর আগেও এরা কী দরিদ্র ও অসহায় ছিল তা জানা নাকি আমাদের প্রয়োজন। অন্তত ভারতবাসীদের নিরাশা কাটবে, সকলে মিলে চেষ্টা করলে যে দারিদ্র্যের এবং অনগ্রসরতার অপসারণ হতে পারে এই বিশ্বাস আমরা ফিরে পাবো।

সুপ্রতীক বলেছিলেন, "পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, লিথুয়ানিয়া, রাশিয়া থেকে যেসব ইহুদি রিফিউজি এদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন সৌভাগ্যক্রমে তাদের মধ্যে কয়েকজন সৃষ্টিশীল মানুষও ছিলেন। তাই প্রবাসে নবজীবনের অবিস্মরণীয় চিত্রমালা তাঁরা পৃথিবীর পাঠকদের উপহার দিতে পেরেছেন। ভারতীয়দের সেই সৌভাগ্য এখনও হয়নি। এম-এস-সি, পি এইচ ডি-ধারীরা এদেশে নিরন্তর চেষ্টায় প্রতিষ্ঠা লাভ করছেন, কিন্তু হাতের গোড়ায় প্রবাসী সাহিত্যিক না-থাকায় আমাদের ইতিহাস অলিখিত থেকে যাচ্ছে।"

•

টেলিফোন বাজতে শুরু করেছে। ওদিকে রূপার কণ্ঠস্বর। আমার উত্তর শুনেই রূপা বললো, "আপনি ভাবছেন, নাম না বললে আমি চিনতে পারবো না। কিন্তু তা হয় না, শংকরদা।"

"রূপা! এতদিন পরেও তুমি আমার গলার স্বর মনে রেখেছো?"

রূপা হাসলো। "আপনি আমার খোঁজ করেন কি না দেখছিলাম। না হলে ওই শুক্রবারের সাহিত্যসভায় আপনাকে পাকড়াও করতাম।"

এবার তা হলে রহস্যটা পরিষ্কার হচ্ছে। আমার আগমন-সংবাদ এখানে বাঙালি মহলে কিছুটা প্রচারিত হয়েছে, আর বাকিটা আন্দাজ করে নিয়েছে রূপা। আমি বললাম, "রূপা, তোমার গলার স্বরে সেই পুরনো ঝংকার রয়েছে। একটু ওজন এসেছে তোমার উচ্চারণে।"

"আপনিই তো বলেছিলেন, আকাশবাণীতে ঘোষিকার পদে আবেদন করতে। অ্যাপ্লিকেশনও করেছিলাম, কিন্তু কোনো উত্তর এলো না।"

"রূপা! তোমার সে-সব কথা মনে আছে?"

"সব মনে আছে, শংকরদা। সেই সেবারে বাসে আমার পার্স চুরি হয়ে গেল। চন্দ্রমাধব রোডে আপনার অফিস থেকে পাঁচ টাকা নিতে গেলাম, আপনি এগরোল, টোস্ট, চা খাইয়ে ছাড়লেন।"

"তোমার মাথায় বোধহয় একটা কমপিউটার বসানো আছে, রূপা। তাই তুমি এদেশেও সফল হয়েছো, পি-এইচ-ডি পেয়েছো।"

"শংকরদা, আপনিই বলেছিলেন প্রত্যেক মানুষের বুকের মধ্যে একজন সুপারম্যান অথবা সুপারউয়োম্যান ঘুমিয়ে আছে। কথাটা অবশ্য আপনার নয়, আপনার বারওয়েল সায়েবের।"

"রূপা, তুমি আমাকে অবাক করে দিচ্ছো।"

"শুনুন, শংকরদা, প্রত্যেক মানুষের মাথায় একটা সুপার কমপিউটার বসিয়ে ভগবান তাকে বিশ্বসংসারে পাঠিয়েছেন। আমার এক মাস্টারমশাই এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে হিসেব করে দেখিয়েছেন, মানুষের মাথার কমপিউটার মাত্র ১/

কিউবিক ফুট জায়গা নেয়, মাত্র দশ ওয়াট পাওয়ার কাজ করে। মাথার মধ্যে রাখতে পারে ২৮০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ ঘটনা।"

"আমার মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে রূপা। তোমার সঙ্গে কথা বলে চিরকাল আমি আনন্দ পেয়েছি।"

"খুব সোজা—২৮০-র পিঠে আঠারোটা শূন্য বসিয়ে দেবেন। আপনার পাঠকদের বলবেন, মানুষের অসাধ্য কিছু নেই।"

রূপা এবার নিজের কথায় ফিরে এলো। "আমি খুব লাকি, শংকরদা। ভাগ্যে আজ আমি কাজে যাবো না ঠিক করেছিলাম। সেই পুরনো রোগ মাঝে-মাঝে মাথা ধরা। একবার ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম, ফিরে এসেই রিপ্লাই রেকর্ডারে আপনার গলা শুনলাম। খুব মিসট্রি-ক্রিয়েট করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পারেননি। মনে আছে? আপনার রহস্য উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির পাঁচপাতা পড়ে আমি বলে দিয়েছিলাম দোষী কে।"

"সেই দুঃখেই আমি তো রহস্য উপন্যাস লাইনে গেলাম না, রূপা। প্রতিটি বুদ্ধিমতী মেয়ে শুরুতেই ধরে ফেলে আমার রহস্য উপন্যাসে কে দোষী।"

রূপা হাসলো. "আপনিই তো বলেছিলেন, পাজী লোকদের বুঝে নেবার সহজাত শক্তি আছে মেয়েদের।"

"কত লোককে কত কথা বলেছি, আজকাল মনে থাকে না, রূপা: তুমি যত্ন করে মনে রেখে আমাকে অবাক করে দিচ্ছো।"

টেলিফোন নামিয়ে দিয়েছি। রূপা আসছে।

টেলিফোন নামাবার আগে আমি বলেছি, "রূপা, তোমাকে খুঁজে বার করবার প্রয়োজন ছিল আমার। মাসীমা মৃত্যুশয্যায় আমাকে বার বার অনুরোধ করেছিলেন, আমি কথা দিয়েছিলাম তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবো।"

মাসীমা, অর্থাৎ রূপার শাশুড়ী নেই, একথা রূপার কানে পৌঁছয়নি। সে শুধু বললো, "মা নেই?"

পৃথিবীতে কেউ চিরকাল থাকে না। হাতের গোড়ায় যখন থাকে তখন কোনো খোঁজখবর না নিয়ে, চলে যাবার পরে দুঃখ করারও অর্থ হয় না। কিন্তু পৃথিবীর এই নিয়ম—জীবিতকালে অবহেলা, অবর্তমানে অনুশোচনা। আয়ত্তের বাইরে চলে না গেলে মানুষের দাম বাড়ে না, এই নির্মম সত্যটুকু আমরা বুঝেও বুঝতে চাই না।

রূপা চৌধুরী এখানে কীর্তিমতী মহিলা। গবেষিকা হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা রেকর্ড স্থাপন করে সে অধ্যাপনা শুরু করেছিল। এখন অধ্যাপনা থেকে সাময়িক ছুটি নিয়ে সরকারের পক্ষে কী এক সমীক্ষা চালাচ্ছে। ডজনখানেক সায়েব-মেমকে তার কথায় উঠতে বসতে হয়।

রূপা চৌধুরী যে এখানকার বাঙালী সমাজের সঙ্গে তেমন যোগাযোগ রাখে না সে খবর আমি অন্য সূত্র থেকে পেয়েছি। আজও যখন রূপা শুনলো আমি ডাইভোর্সি সুপ্রতীক সেনের বাড়িতে আছি তখন কিছুটা স্বস্তি পেলো। কোনো আদর্শ বাঙালী পরিবারে আমার আশ্রয় জুটলে তার অসুবিধা হতো। কারণ নাথবতী বাঙালী মহিলারা নিঃসঙ্গ বাঙালী মহিলাদের অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখেন। তাঁদের সম্বন্ধে নানা কৌতূহলে মন ভরে ওঠে। এই সব উৎসুকা নাথবতী স্বদলে থাকলে সি-আই-ডি অথবা সি-বি-আই-এর সম্পদ হতে পারতেন। এখানকার বাঙালীদের ব্যক্তিজীবনের কোনো সংবাদই তাঁদের অজানা থাকে না। এঁদের অনেকেই প্রাইভেসি-সুখেও অভ্যস্ত হয়ে উঠলেও অন্যের প্রাইভেসিকে এখনও সম্মান করতে শেখেননি। এই সব পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রূপা সহজবোধ্য কারণে এড়িয়ে চলে। তাছাড়া সৌজন্যের ব্যাকরণ নিয়েও টানাপোড়েন চলে। নাথবতী গৃহিণী সৌজন্যের খাতিরেই খাবার এগিয়ে দেন, অতিথি কিছু মুখে না তুললে গৃহস্থের অকল্যাণ এই ধারণা বিদেশের মাটিতেও প্রবল থেকে যায়। এরপর বলতে হয়, এখানে বসেই দাদার সঙ্গে গল্প করুন, দুপুরেও দাদার সঙ্গে লাঞ্চ করুন। কিন্তু অনাথবতীর একটাই ইচ্ছা, কোনোক্রমে দাদাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন, শ্যাম রাখি না কুল রাখি? দু'জনের প্রতিই অনুগত হতে গিয়ে অকারণে বাড়তি সমস্যার সৃষ্টি হয়ে যায়।

অনেক লাজুক অনাথবতী সাহস করে এতোটা এগোতে চান না, ফলে গল্প হাতছাড়া হয়ে যায়। আমার মতন মানুষদের জীবনে নিষ্ঠুর সত্যটি হলো দেশ দেখবার জন্যে নয়, মানুষ দেখার লোভেই স্বদেশের নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করে বিদেশে পাড়ি দিয়েছি। সুতরাং মানুষের সান্নিধ্যে আমার সুযোগ যেন নষ্ট না হয়।

বাইরে বেল বাজছে। দরজা খুলে দিতেই অনেকদিনের হারিয়ে-যাওয়া রূপাকে খুঁজে পেলাম। "রূপা, তোমার চশমার ফ্রেমটা ছাড়া আর কিছুই পাল্টায়নি! আমি ভাবতে পারিনি, এতো বছর পরে, এতো ঘটনার শেষে তুমি ঠিক সেই একই রকম থাকবে।"

অপ্রত্যাশিতভাবে রূপা টিপ করে আমাকে প্রণাম করলো। আমি ওর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম মাথায় সিঁদুর নেই। শেষবার যখন কলকাতায় ওর প্রণাম গ্রহণ করেছিলাম তখন সিঁথিতে সিঁদুর ছিল।

রূপা এবার তার পুরনো সুরসিক মেজাজ ফিরিয়ে আনলো। আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "আপনার মাথার চুল কমেছে, গুরুত্ব বেড়েছে এবং ট্রপিকাল কানট্রিজে থেকেও রং ফর্সা করেছেন। কিন্তু বয়স আপনার তেমন বাড়েনি, শংকরদা।"

"এসব ক'টার জন্যেই দায়ী তোমার বউদি। সকালবেলায় শিবকালী ভট্টাচার্য

নির্দেশিত কী এক পাঁচন খাওয়ায়—যার মধ্যে অনন্ত যৌবন ও অনন্ত জীবনের সম্ভাবনা রয়েছে।”

“শিবকালীবাবুর অনুমতি নিয়ে পাঁচনের পেটেন্ট নিন, এদেশে আপনি মিলিয়নিয়ার হয়ে যাবেন, শংকরদা। শরীর সুস্থ রাখতে ও যৌবনকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বেঁধে রাখবার জন্যে মার্কিনীরা সর্বস্ব দিতে পারে।”

“ওই হাওয়া আমাদের দেশেও হাজির হয়েছে, রূপা। আমার সমবয়সী বন্ধুরা সবাই বৌকে বলেছে কেউ বুড়ো হতে চাইছে না।”

“বউদিদের পক্ষে এটা তো সুসংবাদ।” রূপার তাৎক্ষণিক উত্তর।

“হ্যাঁ, আগে বলতো কুড়ি পেরোলেই বুড়ী। এখন বুড়ী হয়েই তোমার বউদির বান্ধবীরা দ্রুতগতিতে কুড়িতে ফিরে আসছেন। যোগাসন, সুখাসন, ফেসিয়াল, কেশকালিমা ইত্যাদির রমরমা ব্যবসা চলেছে কলকাতায়।”

শেষ বস্তুটির অর্থ বুঝতে পারছিল না রূপা। হেয়ার-ডাই-এর বাংলা শব্দ তৈরি হয়েছে শুনে খুব খুশি হলো। বললাম, “বাংলাদেশীদের ভয়ে আমাদেরও দু' চারটে বাংলা শব্দ ব্যবহার করতে হচ্ছে রূপা, ওরা বাংলাভাষাকে এমনভাবে সাজিয়ে নিচ্ছে যে ইংরিজীর ওপর নির্ভর করার প্রয়োজনই হবে না। এমনকি বাংলায় ডাক্তারী প্রেসক্রিপসন পর্যন্ত লিখছে ওরা।”

আমি রূপাকে সোফায় এনে বসালাম। জানালাম গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে আমিই এই সংসারের মালিক। ওর মুখের দিকে তাকালাম। “রূপা তোমার ওজন বাড়েনি, বয়স বাড়েনি, শুধু ইন্দিরা গান্ধী স্টাইলে কপালের কাছে কয়েক গাছি চুল সাদা করে নিজেকে বিশেষত্ব দিয়েছো।” একটু ঝকঝকেও হয়েছে রূপা। চিরকালই সে শ্যামা, কিন্তু স্বাস্থ্যকর বিদেশী পরিবেশে শ্যামবর্ণের ওপর যেন এক কোট পালিশ পড়েছে।”

“রূপা, তুমি আমাদের সেই রূপা, ভাবতে খুব আনন্দ হচ্ছে।”

“রূপো তো সোনা হয় না, রূপোই থেকে যায়, শংকরদা।” কী সুন্দরভাবে বললো আমাদের রূপা।

“রূপা, তুমি নাকি এদেশে এসে দিগ্বিজয় করেছো ?”

“হরগোবিন্দ খুরানা আর চন্দ্রশেখর ছাড়া কোনো ইন্ডিয়ানই এ দেশ জয় করেনি, শংকরদা। তবে পরীক্ষায় একটু ভাল করতে হয় সবাইকে— না-হলে এরা থাকতে দেবে কেন ? কিছু লোক ইদানীং ব্যবসায়ে ভাল করছে। এর ফলাফল হয় খুব ভাল হবে, না-হয় খুব খারাপ হবে।”

“রূপা, তুমি এরকম আশঙ্কা প্রকাশ করছো কেন ?”

রূপা বললো, “সুপ্রতীক সেনকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন। বিজনেসে হাত পড়া মানে জাতে হাত পড়া। তাছাড়া পৃথিবীর কোথাও অনাবাসী ইন্ডিয়ান বিজনেসম্যানের

তেমন কিছু সুনাম নেই। দুষ্টুরা বলে, একখানা খাতায় ওদের অনেকেরই মন ভরে না। আইনকানুনকে ঝাঁপিতে পুরে মনের সুখে বাণিজ্য করার লোভ হলে এদেশে অন্য ইন্ডিয়ানদের সম্মানহানি হবে। এসব অবশ্য নাও হতে পারে, শংকরদা। ডাক্তারি করে অথবা চাকরি করে পৃথিবীতে কোনো জাত কখনও বড়লোক হতে পারেনি। ব্যবসার প্রয়োজন রয়েছে।"

"তুমি এখন কী করছো, রূপা ?"

"অনেকগুলো সমীক্ষা একসঙ্গে চলেছে, শংকরদা। তার মধ্যে একটি হলো বিভিন্ন জাতের ছোট ব্যবসায়ীদের নীতিবোধ, বিজনেস এথিক্স। ব্যবসায়ের ওপর ধর্মীয় প্রভাব নিয়েও একটা বড় কাজ ইদানীং শেষ হলো। আমাদের টিমে দার্শনিক আছেন অ্যানথ্রপলজিস্ট আছেন, অর্থনীতিবিদ আছেন, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ আছেন।"

আমার মন চলে যাচ্ছে সুদূর সেই অতীতে। আমি তখন ফিলিপস-এ কাজ করি। সংবাদপত্রের এক পরিচিত জনের চিঠি নিয়ে রূপা এসেছিল আমার অফিসে। মধ্যবিত্ত মহিলাকর্মীদের মানসিকতা নিয়ে সে তখন উপাদান সংগ্রহ করছে। আমাদের কারখানায় অনেক মহিলা কর্মী—শিক্ষিত মহিলা শ্রমিকদের প্রথম প্রজন্ম সম্পর্কে অবহিত হতে হলে ফিলিপসের মতো জায়গা তখন সারা দেশে নেই।

রূপার মেধা ও তার ব্যক্তিত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছিল। ওর চিন্তার স্বচ্ছতা, ওর ভাবনার বিশিষ্টতা দেখে কে বলবে সে তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পর্ব শেষ করেনি। আমি ওকে গবেষণার উপাদান সংগ্রহে সাধ্যমতো সাহায্য করেছি। ওর মাধ্যমে আমার নিজের প্রতিষ্ঠানের কর্মীদেরও আমি নতুনভাবে আবিষ্কার করেছি। বুঝেছি, নিয়মিত অনুসন্ধানের অভাবে আমরা কর্মীদের মনোভাব সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারি না। জ্ঞানের এই অভাব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সুদূরপ্রসারী ক্ষতি করে। রূপা দিনের পর দিন মহিলাদের সঙ্গে ক্যানটিনে খাওয়াদাওয়া করেছে। প্রেসে গিয়েছে, তাদের বাড়িতে হাজির হয়েছে। এদের জীবনের কাজের প্রভাব এবং কাজের ওপর ব্যক্তিজীবনের প্রভাব অনেকটা উপন্যাসের মতন মনে হয়।

বলা বাহুল্য, রূপা বিশিষ্টতার সঙ্গে এম-এ পাস করেছে। তারপর সে আরও গবেষণায় আগ্রহী। আমাদের কারখানার ম্যানেজার খুশি হয়ে ওকে চাকরি দেবার প্রস্তাব করেন. কিন্তু রূপা উৎসাহ দেখায়নি।

এরপর আমি ফিলিপস ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছি ভাগ্যসন্ধানে। কিন্তু রূপার সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়নি। রূপা তখনও পুরনো গবেষণাকে আরও গুছিয়ে নিয়ে মহিলা শ্রমিকদের সামাজিক সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে চায়। এই সময় আমার প্রথম বিদেশে যাবার সুযোগ হলো। রূপার তখন উৎসাহের অন্ত নেই—সে কলকাতা

াইরে কখনও যায়নি। আমাকে অনেক খবর দিলো, বললো ওসব খুঁটিয়ে দেখে াসবেন।

ফিরে এসে রূপার শুভবিবাহের সংবাদ পেলাম। বিবাহ, কিন্তু কতটা শুভ তা বলা াক্ত।

রূপা নিজের ইচ্ছাতেই বিয়ে করেছে শুনলাম। কিন্তু যাকে বিয়ে করেছে তার িক্ষাগত যোগ্যতা নেই। পাত্রটি ব্যবসায়ী। বেহালায় বসবাস।

বিয়েতে নেমন্তন্ন খাওয়া হয়নি বলে একদিন সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ জুটলো বেহালায়। সখানেই মাসীমাকে আবিস্কার করা গেল। মাসীমার আদিনিবাস আমাদের চৌধুরী াগানে। ওখানে ঘোষপরিবারের মেয়েরা সৌন্দর্য ও সুরুচির জন্যে সুখ্যাত। াসীমাকে ওই বাড়িতে বহুবার দেখেছি—চৌধুরীবাগান লেনের প্রতিটি ইট আমার চনা—আমার জীবনের স্মরণীয়তম অধ্যায়টি ওখানেই কাটিয়েছি। ওখান থেকেই স্কুলে গিয়েছি, ওখানেই অকালে বাবার মৃত্যুতে অথৈ জলে পড়েছি, ওখানেই শুরু য়েছে আবার জীবনসংগ্রাম। ওখানেই আমি নিজের ওপর বিশ্বাস ফিরে পেয়েছি। ওখানেই আমি প্রথম লেখক হবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে বহু নিদ্রাবিহীন রাত্রি যাপন করেছি।

মাসীমা মানুষটি অতি শান্ত, কিন্তু নিষ্ঠাবতী হিন্দু। শুনেছিলাম বিবাহিত জীবনের প্রথম পর্বে নানা কষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদে সেইসব অগ্নিপরীক্ষা আগেই শষ হয়েছে। মাসীমার মেয়েটির ভালই বিয়ে হয়েছে—সে বরোদাতে থাকে। তার াত্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা না পেলেও সুরুচিসম্পন্ন ও প্রতিষ্ঠিত। সে ব্যবসায় মন দিয়েছে। যারা কোনো কারণে ম্যাট্রিক পাস করেনি অথচ উচ্চাশা রেখেছে তাদের পক্ষে ব্যবসাই তো শ্রেষ্ঠ পথ।

মাসীমার মনে ছেলের বিয়ে সম্বন্ধে নানা সন্দেহ ছিল। যদিও মাসীমা এমনই শান্ত প্রকৃতির যে কোনো প্রতিবাদই জোর গলায় করেন না।

মাসীমা বললেন, "যখন রূপার বাড়ি থেকে সম্বন্ধ এলো তখন দু' মাস আমি মুখে াবি লাগিয়ে বসেছিলাম। বাউনের মেয়েকে কায়েতের সংসারে আনার মধ্যে অনাচার আছে।" এতে ভাল হয় না বলেই তাঁর বিশ্বাস।

দু' একজন মাসীমাকে বলেছে, "এসব সেকেলে কথা। এখন বাউন, কায়েত, বদ্যি, সদ্‌গোপ, তিলি, এতো জাত নেই। এখন জাত দু' রকম—ভদ্রলোক ও ছোটলোক।" মাসীমা মুখ বুজে শুনেছেন, কিন্তু অকারণে সনাতন ধর্মকে অবজ্ঞা করার যুক্তি খুঁজে পাননি। মাসীমাকে বলা হয়েছে, "পতন হচ্ছে তো বামুনের মেয়ের—সে তো জেনেশুনেই কায়স্থতে বিয়ের মত দিয়েছে।" মাসীমার ভিন্ন ধারণা। "রূপাও তো আমার স্নেহের পাত্রী—আমার স্বার্থের জন্য অকারণে তাকে অধঃপতনে যেতে দেবো কেন?"

আর একটি বিষয়েও মাসীমা চিন্তিত। মেয়ে নাকি বিদ্যের জাহাজ। ইস্কুলে, কলেজে মেডেল পেয়েছে। তাঁর ছেলের তো লেখাপড়া হয়নি। বিদ্যায় ও গুণে স্বামী পাত্রী থেকে বড় হবে এই তো চায় বাপ-মা। তাঁর মেয়ে বি-এ, কিন্তু জামাই এম-এসসি। বীরু, অর্থাৎ মাসীমার একমাত্র ছেলে, মোটেই উদ্বিগ্ন হয়নি। বলেছে, "কী সব বস্তাপচা ধারণা তোমার ! বিয়েতে এখন ছোটবড় নেই—বিয়ে হয় সমানে-সমানে।" মাসীমা মনে-মনে ভেবেছেন, এ তো সমানে-সমানে নয়—

এখানে মেয়ের বিদ্যের কাছে ছেলে কিছুই নয়। কিন্তু বীরু বলেছে, "আমি তে লুকিয়ে কিছু করছি না। আমি যে স্কুল ফাইনাল পাস নই তা তো রূপার জানা। মাসীমাকে বোঝানো হয়েছে, পুরুষের পক্ষে বিদ্যের বহরটা তত বড় নয় যত বড় রোজগারের বহর। তাঁর ছেলে ব্যবসায়ে রোজগার করে ; দুদিন পরে আধডজন এম-এ পাস কর্মচারী তাকে স্যর স্যর করতে পারে।

মাসীমা তবুও মত দিতেন না, যদি-না তিনি বুঝতেন এ-বিয়ে হবেই। তাঁর অনুমতিটা এখানে লৌকিকতা মাত্র। তখন তিনি রূপার মা-বাবার সঙ্গে কথা বলেছেন

রূপার সঙ্গে বীরুর আলাপ হয়েছিল এক বন্ধুর বাড়িতে। আচমকা পরিচয়টা যে শেষপর্যন্ত এতোদূর গড়াবে তা কেউ ভাবেনি। বীরু ব্যাপারটা চ্যালেঞ্জের মতো নিয়েছিল। যাদের ধারণা, স্কুল ফাইনাল ফেল ছেলেদের প্রেমের ক্ষেত্রে বাজার দর নেই তাদের একটু নাড়া দেওয়া আর কি !

বিয়ে হয়েছে, ধুমধাম করেই। জামাই বিজনেস করে এটাই যথেষ্ট—কেউ তার পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেট নিয়ে টানাটানি করছে না। মাসীমা মেনে নিয়েছেন। পরে আমাকে বললেন, "আমার ভয় কেটে গিয়েছে, শংকর। প্রথমে ভেবেছিলাম বিদ্যের জাহাজের সঙ্গে বীরু কেমন করে মানিয়ে নেবে ? কিন্তু দেখলাম, বীরু আমার পাস না করলেও দুনিয়ার খোঁজখবর রাখে, ইংরিজী কাগজ পড়ে, ভাল গপ্পো করতে পারে।"

"আর বিদ্যের জাহাজটি ?"

মাসীমা বললেন, "সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী !"

"মা সরস্বতী বলুন, মাসীমা।"

"সরস্বতীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির বংশে কেউ তো ঘর করেনি। আমরা মা লক্ষ্মীকেই চিনি। কে বলবে, পেটে যার এতো বিদ্যে সে কেমন করে এতো সরল হয়। ঠিক যেন আমার মেয়ে বুড়ী।"

আপাতবৈষম্য থাকলেও বিয়েটা ক্লিক করেছে দেখে আমারও আনন্দ। আমার গৃহিণী বললেন, "পরীক্ষায় গোল্ডমেডেলই পাক আর যাই হোক, মেয়েরা মেয়েই সংসার করতে পেলে তারা আর কিছু চায় না।"

'ওসব সেকেলে চিন্তা, বন্দনা", আমি স্ত্রীকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। কিন্তু বন্দনা একমত হয়নি। তার ধারণা, মেয়েরা সমন্বয়ে তুলনাহীন। স্বয়ং মাসীমা যখন বউমার মায়ায় পড়েছেন তখন আর কোনো চিন্তা নেই।

বেশ কয়েক বছর রূপা মন দিয়ে সংসার করেছে। আমার সঙ্গে মাঝে-মাঝে যোগাযোগ হয়েছে। কিন্তু রূপা তখন রান্নার রেসিপি, ঘর-সাজানোর উপকরণ, দেওয়ালের প্লাস্টিক ইমালসন পেন্ট ইত্যাদি নিয়েই বেশি ব্যস্ত।

মাসীমা একগাল হেসে বলেছেন, "তোমাকে কী বলব। বীরু তবু বই-টই পড়ে, কিন্তু বউ আমার সংসার নিয়ে মেতে আছে। গোপালের সেপও ওর হাতে দিয়ে দিয়েছি—দায়িত্ব নিক। আমি তো পঁয়ত্রিশ বছর ধরে দেবতার মনোরঞ্জন করছি।"

রূপার সেই শাণিত বুদ্ধিদীপ্তি যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। সে এখন দামী-দামী শাড়ি পরে, রান্নার ক্লাসে বিরিয়ানি তৈরি শেখে। ও যে একদিন এম, এ'তে গোল্ডমেডেল পেয়েছিল তা-ও ভুলে যাবে। শাড়ি, গহনা ও রান্না রূপাকে ক্রমশঃই গিলে খাবে।

শেষে একদিন আমি রূপাকে বলেছিলাম, "ঈশ্বর যাকে যা দিয়েছেন তার পূর্ণ ব্যবহার না হলে সেটা ঈশ্বরের অবমাননা। রূপা তোমার গবেষণা, তোমার মেধা, তোমার গোল্ডমেডেল এসব গেল কোথায়?"

রূপা তখন মিষ্টি হেসেছিল। আমার সন্দেহ হয়েছিল গোল্ডমেডেল অপেক্ষা গোল্ড নেকলেসেই রূপার এখন বেশি আগ্রহ।

কিন্তু আমার ভুল ভাঙল। মাসীমা একদিন বললেন, "তুমি কী বলেছ রূপাকে? ও আবার মন দিয়ে পড়াশোনা করছে। প্রায়ই প্রফেসরের কাছে যাচ্ছে, ক'দিন ফিলিপস কারখানাতেও যাতায়াত করছে।"

ছোট্ট মেয়ের মতন রূপা বলেছে, "যে রাঁধে সে শুধু চুল বাঁধে না, পি. এইচ. ডি.-ও করতে পারে। আমাকে আপনারা সবাই বকেছেন, আমিও দেখিয়ে দেবো।"

আমি উৎসাহ দিয়েছি। "কয়েকটা বছর নষ্ট হয়েছে তো কী হয়েছে? আবার উঠেপড়ে লেগে পড়।"

এরপর কিছুদিন রূপার সঙ্গে আমার যোগাযোগ কমে গিয়েছে। হাওড়া থেকে পার্ক স্ট্রীট ছোটাছুটি করতেই আমার সমস্ত উদ্যম ফুরিয়ে যায়—বেহালা যাবার প্রাণশক্তি থাকে না। তারপর একদিন রূপা আমার কাছে হাজির হয়েছে। জানতে চেয়েছে, ওর বিষয়ে মার্কিন দেশের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাল পড়াশোনা হয়। আমি অকপটে স্বীকার করেছি, একবার বিদেশ গিয়ে আমি কিছু গল্প লিখেছি; কিন্তু

ও-দেশ সম্বন্ধে আমার বিস্তারিত জ্ঞান নেই। রূপাকে পাঠিয়ে দিয়েছি বিখ্যাত সেই সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে—মার্কিন দেশের চলমান এনসাইক্লোপিডিয়া বললেও যাকে কিছুই বলা হয় না।

তারও কিছুদিন পরে টেলিফোনে খবর পেয়েছি রূপা বিদেশে যাচ্ছে। আমি রসিকতা করলাম, "কর্তা রাজি হয়েছেন ? শাশুড়ীর আশীর্বাদ পেয়েছ ? পাসপোর্ট ও ভিসা ছাড়াও গৃহবধূর পক্ষে ওই দুটি অনুমতি বিশেষ প্রয়োজন।"

রূপা খুব হেসেছে। বলেছে, "আমি যে বিদ্রোহিণী নয় তা তো আপনি জানেন. শংকরদা।"

বিদেশে যাবার আগে রূপাকে একদিন পার্ক স্ট্রীটে লাঞ্চ খাইয়েছিলাম। সামান্য কিছু কথা হলো, বেশির ভাগ সময় আমেরিকার দু-একটা শহর সম্বন্ধে এবং সেখানকার বাঙালী সমাজ সম্বন্ধে রূপা খবরাখবর নিলো।

তারপর একটা কথা হয়েছিল, যার গুরুত্ব তখন বিন্দুমাত্র বুঝিনি। আমি বললাম, "সাবধানে থেকো, তাড়াতাড়ি পড়া শেষ কর, আর রেকর্ড টাইমে ফিরে এসো।" আমি যা বলতে চেয়েছিলাম, "স্বামীকে বেশিদিন বিরহযন্ত্রণায় ভুগিও না !" রূপা যা উত্তর দিয়েছিল তাও আমি রসিকতা মনে করেছিলাম, "কে চায় আমি ফিরে আসি ?"

এরপর তো অনেকদিন কেটে গিয়েছে। রূপা আর এদেশে ফিরে আসেনি। ও-দেশে যথেষ্ট নাম করেছে সে। রেকর্ড টাইমে পি. এইচ. ডি. যোগাড় হয়েছে ; অধ্যাপনার চাকরিও জুটেছে রূপা মিত্রর। কিন্তু এ-দিকে তার স্বামী বীরুর অধঃপতন শুরু হয়েছে—ব্যবসায়ে বড় রকম ক্ষতির আঘাত এসেছে। বীরু মিত্রকে অলিম্পিয়া বারেও দেখা গিয়েছে প্রায়ই। দুষ্টুজনে বলেছে, রূপা আর ফিরবে না, দেখো। কেন ফিরবে ? কোন দুঃখে ফিরবে ? ওখানে মুক্তির স্বাদ পায় মেয়েরা। নন-ম্যাট্রিকের ঘরসংসার পি. এইচ. ডি. মেয়ের ভাল লাগবে না। আমি এসব কথায় কান দিইনি।

তারপর আরও দুঃসংবাদ এসেছে। রূপা মিত্র আর নাকি দেশেই ফিরবে না। বীরুকে সে ডিভোর্স করেছে। মেয়েরা নাকি ভীষণ খেয়ালী হয়—কখন কাকে খেলনা হিসেবে ব্যবহার করে পরমুহূর্তে ছুঁড়ে ফেলে দেবে তার ঠিক নেই। আত্মীয়-বন্ধু মহলে রূপার বদনাম রটেছে যথেষ্ট। এরকম যে হবে, মোহভঙ্গ ঘটতে দেরি হবে না, তা নাকি প্রায় সবারই অগ্রিম জানা ছিল।

"স্বামীর সঙ্গে যখন ঘর করত তখন কী সতীসাধ্বী ভাব ! সিনেমায় সুচিত্রা সেনও অমন অভিনয় করতে পারবে না।" কেউ বলেছে, "অতি লোভে তাঁতী নষ্ট। ওই বীরু মিত্র এবং তার মায়ের বোঝা উচিত ছিল যা ম্যানেজ করতে পারবে না তা ঘরে

আনবে না।” অন্য একজন বলেছে, “মেয়েমানুষকে চোখের আড়াল হতে দিলে এই রকমই হয়।”

বিদেশে ব্যক্তিজীবনে রূপা নতুন কী পেয়েছে তা অনেকেরই গবেষণার বিষয়। আমিও ব্যাপারটা ঠিক বুঝিনি। এইরকম হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু রূপার মতন মেয়ের কাছ থেকে আমাদের প্রত্যাশা অন্য রকম ছিল। স্রেফ বিদ্যা নেই বলে কাউকে তুমি ত্যাগ করতে পার না—তা হলে বিবাহবন্ধনের পবিত্রতা থাকে না।

আমি মাসীমার কাছেও যাইনি। সঙ্কোচবোধ করেছি। প্রথমত তিনি বউমার এই কাণ্ডে সমাজে ছোট হয়ে গিয়েছেন। তারপর তাঁর নিশ্চয় মনে আছে, দ্বিতীয়পর্বে রূপাকে পড়াশোনায় নামাবার পিছনে আমার একটা ভূমিকা ছিল। এই অবস্থায় তিনি রাগ দেখালে আমার কিছু বলার থাকবে না।

এরপর শুনেছি মাসীমা হঠাৎ চৌধুরীবাগানে বসবাস শুরু করেছেন। এই বয়সে পিত্রালয়ে ফিরে আসবার যুক্তি থাকে না। কিন্তু পুত্র বীরু বেহালার সংসার তুলে দিয়েছে। তার ব্যবসা লাটে উঠেছে। লোকে বলেছে, মনের দুঃখে মানুষ নিজেরও ক্ষতি করতে পারে। অবশেষে খবর পেয়েছি মাসীমা অসুস্থ, একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি হাজির হলাম চৌধুরীবাগানে। মাসীমার শরীর তখন সত্যিই খারাপ। জানতে চাইলাম বীরু কোথায়? শুনলাম, আসানসোলে নতুন এক বিজনেস ফেঁদেছে। এখানে এখন প্রায় আসেই না। কারণটা আন্দাজ করতে পারি। এদেশে বউ পালানো স্বামীর সামাজিক অবস্থা স্বামী পালানো বউ থেকেও শোচনীয়।

আমার কথা শুনে মাসীমা হাসবার চেষ্টা করলেন। আমার খেয়াল হলো এই ধরনের কথা বলাটা উচিত হয়নি। মাসীমা হঠাৎ বলে উঠলেন, “তুমি লেখো তুমি বুঝবে। আমিও বুঝি—কারণ আমার স্বামী আমাকে এই চৌধুরীবাগানে ফেলে রেখে পালিয়েছিলেন। আমার কোলে তখন মেয়ে, বীরু পেটে। পনরো বছর আমি নরকযন্ত্রণা ভোগ করেছি। স্বামী তখন পাটনায় অন্য মেয়ের সঙ্গে ঘর করছেন। তারপর কী সুমতি হলো সেই মহিলা মারা যাবার পরে আবার ফিরে এলেন। আমার জীবন তো নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কিন্তু খুকুর কথা ভাবলাম। বাপ দাঁড়িয়ে থেকে না বিয়ে দিলে বদনাম হবে, ভাল ছেলেও পাবে না।

মাসীমা তারপর একটু থামলেন। এবার বললেন, “বীরু আমার সব। বীরু ছাড়া আমার কিছু নেই। সারাজীবনে ঈশ্বর তো হাত তুলে ওকে ছাড়া আমাকে কিছুই দেননি। তবু....”

“কিছু বলবেন মাসীমা?” আমি ওঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে জিজ্ঞেস করেছি।

মাসীমা বললেন, "আমি শুনলাম তুমি আবার আমেরিকা যাচ্ছ।"

"কথা হচ্ছে, কিন্তু ঠিক নেই, মাসীমা।"

মাসীমা আমার হাতটা চেপে ধরলেন। "রূপার সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ নেই। কিন্তু ওকে বোলো, ও ঠিক কাজই করেছে।" মাসীমা ছেলে সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না। তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। ঘরে তখন অন্য লোকও ঢুকে পড়েছে।

এরপর মাসীমার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। রোগের সঙ্গে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত পরাজয় মেনে নিয়েছেন। বীরুর আসানসোল ঠিকানা থেকে শ্রাদ্ধের চিঠি এসেছিল, আমার যাওয়া হয়নি।

যার কাছে একটা খবর পৌঁছে দেবার জন্যে মাসীমার এতো আকুতি, তাকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছি। সে এখন আমার সামনে বসে আছে।

মাসীমার মৃত্যুসংবাদও রূপা পায়নি। "দেশের সঙ্গে অনেক বছর আমার কোনো যোগাযোগ নেই, শংকরদা। বাবা-মা এদেশে আসবার আগেই মারা গিয়েছেন। ভাই থাকে দুবাইয়ে, সে সিংহলী মেয়ে বিয়ে করেছে।"

আমি বললাম, "জীবনে সব সাফল্য হয় না, রূপা। তুমি পড়াশোনা ও কর্মজীবনে বড় হয়েছো।"

"সংসারজীবনে মস্ত একটা গোল্লা পেয়েছি, শংকরদা। সব সাবজেক্টে পাস মার্ক না পেলে পরীক্ষায় পাস হয় না।"

আমি জানতে চাইলাম, "দেশের জন্যে মন টানে না তোমার?"

"টানে, কিন্তু সেখানে নাকি ভীষণ বদনাম আমার। দেশে ফেলে আসা স্বামীকে ডিভোর্স করেছি বলে।"

আমি এ-কথার কোনো উত্তর দিচ্ছি না। রূপা বললো, "এ-দেশের এই সভ্যতা আমাকে মুক্তির স্বাদ দিয়েছে, শংকরদা।"

"তুমি কী বলতে চাও রূপা?"

"আমার শাশুড়ীর কথা জানেন আপনি? পনর বছর ধরে স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে মুখ বুজে সব সহ্য করেছেন। স্বামী অন্য একটি মেয়েকে নিয়ে নিজের খেয়ালখুশি চরিতার্থ করতেন। ভারতবর্ষের সীতা-সাবিত্রী তো—আমার শাশুড়ী বিদ্রোহ করেননি, ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত স্বামীকে ফিরে পেয়েছেন। কপালের সিঁদুর অনেক বছর অক্ষত রেখেছেন বিরাট মূল্য দিয়ে।"

আমি বললাম, "নতুন একটা বাংলা কথা কাল রাত্রে সংগ্রহ করলাম। 'নামমাত্র বিবাহ'। সেই পর্যায়ে এটাও পড়ে কী?"

রূপা বললো, "বাংলার মাটিতে মেয়েদের ভীষণ ধৈর্য। আমার শাশুড়ীকে স্বামীর ছবিতে চন্দনের ছাপ দিতে দেখেছি। জীবন যাকে এতো বঞ্চনা করেছে তিনিও নিশ্চয়

ছেলের জন্যে কোমর বেঁধে ঝগড়া করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। এইটাই পৃথিবীর নিয়ম।"

রূপা উত্তেজিত হয়ে উঠছে। "আমি কাউকে বলিনি—মুখও ছিল না। কারণ আমি তো জোর করেই বীরুকে বিয়ে করেছিলাম। এতো বিপত্তির পরে মালাবদল করে, কয়েক বছর বিবাহিত জীবনের পরে আপনি যদি শোনেন আপনার স্বামী অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে গোপন সম্পর্ক রাখছে তখন আপনার কী মনে হতে পারে?"

রূপা বললো, "আমার শাশুড়ী ব্যাপারটা জানতেন। আমি কার কাছে কান্নাকাটি করব? উনি বললেন, ধৈর্য ধরতে—সময়ে সব নাকি ঠিক হয়ে যায়; যেমন ওঁর হয়েছিল। আমি সেই সময় সুযোগ পেলাম। বাইরে চলে এলাম। তারপর বীরু আরও অধঃপতনে গিয়েছে। মাতাল হয়েছে, ব্যবসা নষ্ট করেছে, অন্য মেয়ের সঙ্গে গোপন সম্পর্ক জোরদার করেছে। আমার শাশুড়ীর তখনও আশা ছিল আমি ফিরলে এবং ধৈর্য ধরলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এ-দেশের পরিবেশ ততক্ষণে আমাকে স্বাধীন হতে শিখিয়েছে। আমি সম্পর্ক ছেদ করেছি, শংকরদা। আমি শাশুড়ীকে তখন চিঠি লিখেছিলাম, তুমি অন্তত আমাকে বুঝবে—তুমি আমাকে ধৈর্য ধরতে বোলো না, আমি এক অধৈর্য দেশে বসবাস করছি। তিনি সে চিঠির উত্তর দেননি, শংকরদা।

"তারপর এতদিন পরে আপনি তাঁর কাছ থেকে কী খবর নিয়ে আসছেন তা আন্দাজ করতে পারি—আমি নিশ্চয় তাঁর ছেলের সংসার শ্মশান করে দিয়েছি।"

আমি এবার বললাম, "মাসীমা লিখতে পারেননি কিন্তু বিদায় মুহূর্তে জানিয়ে দিয়েছেন তুমি ঠিক করেছ।"

"মা বলেছেন? সত্যি বলছেন? আপনি বানিয়ে বলছেন না আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে?"

রূপা এবার হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো।

আমি ভাবলাম, মাসীমা যদি বেঁচে থাকতেন তা হলে বলতাম, এ-দেশের মেয়েদের ধৈর্য কমানো প্রয়োজন। ধৈর্য না কমলে বোধহয় 'নামমাত্র বিবাহে'র সংখ্যা কমবে না।

খুঁত

"মানুষের সৃষ্টি শিল্পকর্ম কখনও-কখনও নিখুঁত হলেও হতে পারে কিন্তু ঈশ্বরের সৃ
মানুষ কখনও খুঁতবিহীন হয় না।" যে-সম্পাদকের প্রসন্ন প্রশ্রয়ে গত কয়েক বছ
ধরে লেখালেখি করে চলেছি, সম্প্রতি বিদেশে যাবার আগে তিনিই আমাকে একথ
বলে সচেতন করে দিয়েছিলেন।

প্রচারে ও গুরুত্বে এই সম্পাদক তুলনাহীন হলেও বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ। কিন্
কারণে-অকারণে বয়োজ্যেষ্ঠদের ভুল ধরাই যাঁরা তারুণ্যের একমাত্র প্রকাশ বলে মে
করেন তিনি তাঁদের মধ্যে নন ; নবীনতার সঙ্গে অভিজ্ঞতার কিছুটা মিলন ঘটানো
জন্যেই বোধহয় তিনি তাঁর বহুল প্রচারিত পত্রে আমার মতন পঞ্চাশোর্ধ পুরুষকে
নতুন-নতুন ভূমিকা গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

এমনই এক আমন্ত্রণ থেকেই কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে কিছু সাক্ষাৎকার রচনা
দুঃসাহস অর্জন করেছি। যেসব রক্তমাংসের মানুষ সংবাদের শিরোনাম হচ্ছেন অতি
নিকট থেকে গল্পলেখকের চোখে তাঁদের কাউকে-কাউকে দেখতে পাওয়ার সুযোগটা
মন্দ নয়। কল্পনার পাম্পটা অনেকদিন একটানা কাজ করার পর একটু ছুটি পা
এবং বলা যায় না, ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে কথা সাহিত্যের জন্য নতুন কিছু সঞ্চয়
অভিজ্ঞতার ঝুলিতে জমা হতে পারে।

নতুন ভূমিকায় আমার এই লেখাগুলি সম্পর্কেই সেবার আলোচনা হচ্ছিল
সম্পাদকীয় কক্ষে। আমি যাতে নতুন ভূমিকায় নিরুৎসাহিত না হই সে-বিষয়ে যথে
সাবধানতা অবলম্বন করেই তরুণ সম্পাদকের মন্তব্য : "আপনার লেখাগুলো পাঠকে
ভাল লাগছে। প্রতিবারেই কিছু মানবিকতার স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে। সাহিত্যিক ও
রিপোর্টার যে ঠিক এক জিনিস নয় তা আপনি আর-একবার প্রমাণিত করে দিয়েছেন
নিছক সংবাদের পাঠকও মাঝে-মাঝে একটু 'রিলিফ' চায়।"

এই পর্যন্ত শুনতে অবশ্যই ভাল লাগছিল। দূরদর্শী লেখক অবশ্যই প্রত্যাশ
করেন পাঠকের প্রীতি, কিন্তু সম্পাদকের শ্রীমুখ থেকে তিনি জানতে চান কী
করে লেখাকে আরও আকর্ষণীয়, আরও গ্রহণীয় করা যায়। বিদেশে একে
বলা হয় মার্কেট রিসার্চ, বিপণন সংক্রান্ত গবেষণা। আপনার পণ্যটির দোষ
ত্রুটি আগাম যতটুকু জেনে নেওয়া যায় ততই লাভ। প্রতিযোগিতার পৃথিবীতে
কোনো মানুষেরই আত্মতুষ্টির অবকাশ নেই। তুষ্টির আবির্ভাবই প্রতিযোগিতা

আসন্ন পরাজয়ের প্রথম ইঙ্গিত। আমি জানতে চাইলাম, নবপর্যায়ে আমার লেখার দোষ কি বলুন?

আমার খোলাখুলি প্রশ্নে সম্পাদক একটু অস্বস্তিতে পড়লেন। তাঁর ধারণা, যাঁরা সাহিত্য রচনা করেন তাঁরা অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর হন। সামান্য সমালোচনার অ্যাসিডেও তাঁরা জ্বলেপুড়ে নষ্ট হয়ে যান, ফলে কারও কোনো মঙ্গল হয় না।

মৃদু হেসে তিনি বললেন, "আপনার শক্তি ও দুর্বলতার উৎস কিন্তু একটাই। আপনি মানুষকে বড্ড বেশী বিশ্বাস করে বসেন। গল্প-উপন্যাসে মাঝে-মাঝে এক-আধটা নির্ভেজাল ভাল চরিত্র হয়তো চলে যায়, কিন্তু সংবাদপত্রে কখনও নয়।"

সম্পাদকের বক্তব্যে ইঙ্গিত ছিল আমার সদ্যপ্রকাশিত 'নগরকোটালের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।' বললেন, "লেখা অবশ্যই ভাল হয়েছে, পড়তেও ভাল লাগছে, কিন্তু প্রশ্নগুলোর মধ্যে কোনো 'স্পিন' নেই—নায়ককে কখনও অস্বস্তিতে ফেলার প্রচেষ্টা নেই।"

সম্পাদক আমার মুখটা খুব সাবধানে লক্ষ্য করছেন, দেখছেন তাঁর সমালোচনা আমি কতখানি বিনা কষ্টে গ্রহণ করতে পারি। অনেকে নাকি সমালোচনা চেয়ে পরে বেশ বিপদে পড়ে যান।

"আমার মা বলতেন, মানুষের এতো ভাল গুণ আছে যে সারাজীবন ধরে লিখেও তা শেষ করা যায় না। ভালগুলো যদি খুঁজে বার করে লিখে দাও তা হলে সবাই বুঝতে পারবে মানুষটার কী কী দোষ—মানুষ তো আর বোকা নয়!"

হাসলেন তরুণ সম্পাদক। "আপনার মা জানতেন যে তাঁকে কোনো দিন বহুলপ্রচারিত দৈনিক পত্রিকা চালাতে হবে না। কাগজে লেখার বিষয় অনন্ত কিন্তু সময় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তাই কোথায় কী গড়বড় হচ্ছে তা জানিয়ে দিলেই মানুষ বুঝে নেবে কোথায় কী ঠিক রয়েছে।"

একই সত্যের দুটি দৃষ্টিকোণ। যাঁরা ঠেকেছেন, ঠকেছেন তাঁরা খারাপটাই চটপট জেনে নিতে চান, আর যাঁরা অবিশ্বাসের ধোঁয়ায় হাঁপিয়ে উঠেছেন, তাঁরা বহু ঠকবার পরেও আবার বিশ্বাস করতে চান। আমার মা বলতেন, "মানুষ ছাড়া মানুষের চলেও না, অথচ মানুষকে বিশ্বাস করতে পারে না মানুষ।"

সম্পাদক ব্যস্ত মানুষ—তাঁর অনেক কাজ। তবু যে কিছুক্ষণের নিভৃত আলোচনা হলো তার কারণ আমার আসন্ন বিদেশ-ভ্রমণ।

উৎসাহ দিয়ে তিনি বললেন, "আপনার কলমে আরও কতকগুলো প্রিয় চরিত্রের সৃষ্টি হবে আশা করতে পারি। আমার কাগজ তো খোলা রইলো আপনার জন্যে। তবে আপনার নিন্দুকরা বলে, এতোদিন কলকাতা শহরে থেকেও আপনি সে-ই

মফস্বলের মানুষটি রয়ে গেলেন। আপনি যে মার্কিন দেশে যাচ্ছেন সে-দেশের একজন লেখক সম্প্রতি বলেছেন, মানুষের সৃষ্টি কখনও কখনও সর্বাঙ্গসুন্দর হলেও হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি মানুষ কখনও ত্রুটিহীন হয় না।"

"জাপানে, জার্মানীতে, আমেরিকার কারখানায় আপনি 'জিরো ডিফেক্ট' আন্দোলনের কথা নিশ্চয় শুনেছেন, কিন্তু ও-ব্যাপারে ঈশ্বরের মাথাব্যথা নেই বিন্দুমাত্র। তাই কুসুমে কীট, চাঁদে কলঙ্ক এবং অসংখ্য ভুলে-ভরা মানুষ। ঈশ্বরের অবশ্য একটা মস্ত সুবিধে আছে, তাঁর কোনো প্রতিযোগী নেই—একমেবাদ্বিতীয়ম্ হয়ে সৃষ্টির বাজারে একচ্ছত্র সুযোগ-সুবিধে উপভোগ করছেন।"

এসব সম্পাদকের নিজস্ব কথা নয়, পৃথিবীর দিকপাল সাংবাদিকদের বক্তব্য। "আমার অত ভাববার সময় কোথায়? কিন্তু ভাবুকদের ভাবনা-চিন্তা আমি সংগ্রহ করে রাখি," এই বলে একটি মূল্যবান ইংরিজী রচনার জেরক্স কপি তিনি আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে মার্কিন দেশ ভ্রমণে এসে, বিশেষ করে নবগোপাল ব্যানার্জির সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময়ে আমি বেশ দোটানায় পড়ে গিয়েছিলাম।

একদিকে সম্পাদকের সাবধানবাণী, অন্যদিকে আমার মায়ের উপদেশ। সম্পাদক বহুবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছেন এবং আমার শুভানুধ্যায়ী। মা কখনও বাংলা ছেড়ে বিদেশ তো দূরের কথা বেনারস পর্যন্ত যেতে পারেননি। একবার বিলেত ঘুরতে পারলে আমার মা-ও হয়তো মত পরিবর্তন করতেন, আমাকেও পরামর্শ দিতেন মানুষের ফুটো খুঁজে বার করো। কিন্তু সে সুযোগ যখন তাঁর হয়নি তখন আমি দিশেহারা। মানুষের পূর্ণতা মাপবো? না, তার শূন্যতা যাচাই করবো? আমার স্ত্রী আমার এই অস্থির অবস্থা আন্দাজ করে লং ডিসট্যান্স টেলিফোনে বলেছিলেন, "দুটোই করো।"

"দুটো করার মতন দুর্লভ ক্ষমতা আমার নেই। চা ও কফি একসঙ্গে খাওয়া যায় না," এই কথাটা বলবার আগেই টেলিফোন যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছিল। সাগরপারের দূরভাষণ যে ভীষণ খরচাসাপেক্ষ তা আমার গৃহিণীর অজানা নয়।

মার্কিন মুলুকে আমার সাময়িক আশ্রয়দাতা সত্যব্রত দত্ত খুব হাসাহাসি করলেন। সত্যব্রত বললেন, "মানুষকে বেশী খবর দিতে গেলে বেশী সময় লাগে, আর বেশী সময় মানেই বেশী খরচ। আর সব জিনিসের সরবরাহ এই সোসাইটিতে বাড়ানো যায়, একমাত্র এই সময় ছাড়া। সেই কলম্বাসের যুগেও প্রতি দিনে ছিল চব্বিশ ঘণ্টা, এখনও এই মহাকাশযাত্রার যুগেও চব্বিশ ঘণ্টা। যার অর্থ হলো, ...জাস্ট এ মিনিট...." এই বলে হাতের গোড়ার একটা খেলনা ক্যালকুলেটার টিপতে লাগলেন সত্যব্রত দত্ত... "অর্থাৎ ১৪৪০ মিনিট অথবা ৮৬৪০০ সেকেন্ড। এই সেকেন্ডকেও ভাঙতে পারা যায়....নাইনটিন সিক্সটিফোর-এ ওয়েট্স্ অ্যান্ড মেজারস-এর জেনারেল

কনফারেন্সে যে 'সিজিয়াম রেজোনেন্স'-এর মাপ দেওয়া হলো—৯, ১৯২, ৬৩১, ৭৭০ সাইক্ল অফ র‍্যাডিয়েশন, সিজিয়া অ্যাটম-১৩৩...." কী সব গড়-গড় করে বলে চললেন সত্যব্রত।

সত্যব্রত পণ্ডিত মানুষ, নামের অন্তে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডি আছে, ওঁরা সময়কে চুলচেরা ভাগ করবেন না তো কারা করবেন ? আমাদের শাস্ত্রেও সময়ের চুলচেরা বিশ্লেষণ আছে, নানা নামও আছে—তবে আমাদের সব কিছু 'আন্দাজিফাই' নিখুঁত মাপজোকের ব্যাপারটা অনেক কম, সবই বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল।

সত্যব্রত দত্ত আমাদের বয়সী। প্রায় একই সময় আমরা ইস্কুল পেরিয়ে কলেজে ঢুকেছি। স্বদেশের কলেজ থেকে একসময় বিদেশের কলেজে হাজির হয়েছেন সত্যব্রত। জ্ঞানান্বেষণ সমাপ্ত করে সত্যব্রত গবেষণাকার্যে লিপ্ত হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে।

সত্যব্রত বলেছেন, "শংকরবাবু, জ্ঞানান্বেষণটা এদেশে বিলাসিতা নয়। এদেশ সর্ববিষয়ে ভীষণ হিসেবী, কিন্তু জ্ঞানসন্ধানের কোনো খরচকেই এরা বাজে-খরচ বলে মনে করে না। এদেশের গবেষণা সংক্রান্ত ব্যয় শুনলে অনেক দেশের মানুষ ভিরমি খাবে।"

"আপনি বলছেন, গবেষণাটাই এদেশের বৃহত্তম বিলাসিতা।"

হাসলেন সত্যব্রত। "মোটেই বিলাসিতা নয়, শংকরবাবু। ভবিষ্যৎকে মুঠোর মধ্যে রাখার এইটাই যে একমাত্র অস্ত্র তা এই বেনের জাত খুব ভাল করে বুঝে গিয়েছে।"

"আজকাল আমাদের দেশেও বিশ্বাবিদ্যালয়ে, ল্যাবরেটরিতে কিছু গবেষণা হয়। কিন্তু কোথাও যেন ফাঁকি থেকে যায়। অনেকটা কলকাতা শহরে বনমহোৎসবের সময় গাছ পোঁতার মতন—খুব কায়দাকানুন করে ঢাক বাজিয়ে গাছ পোঁতা হয়, কিন্তু গাছও বড় হয় না, ফলও দেয় না। অথচ প্রতিবছর ঘটা করে, খবরের কাগজে ছবি তুলিয়ে একই রাস্তার ফুটপাতে প্রতিবার গাছ পোঁতা হচ্ছে !"

সত্যব্রত হাসলেন। তিনি মাঝে-মাঝে কর্মসূত্রে নিজের দেশে এসেছেন, দু'একটা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কেন্দ্রের খোঁজ-খবরও রেখেছেন।

সত্যব্রত বললেন, "গবেষণার নাম করে বহু পণ্ডিত দেশের দরিদ্র মানুষদের ঠকাচ্ছে এবং নিজেদেরও ঠকাচ্ছে। সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনলজির নামে বিরাট ধাপ্পাবাজি চলেছে, অথচ কেউ এর অনাচার উন্মোচন করতে পারছে না।"

আমি বিদেশে বসে দেশের নিন্দা হজম করতে পারি না, শরীরের কোথায় যেন জ্বালা ধরে যায়। তাই সত্যব্রতকে শুনিয়ে দিলাম, "মানুষগুলোকে ধাপ্পাবাজ বলতে কষ্ট হয় সত্যব্রতবাবু, কারণ এদেরই কেউ-কেউ যখন ছিটকে বিদেশে আসে তখন তো বেশ ভাল কাজ হয়। বোঝা যাচ্ছে, দোষ মানুষগুলোর নয়, দোষ সিস্টেমের—পরিবেশের, ব্যবস্থাপনার।"

"তা হলে অনেক কথা বলতে হয়, শংকরবাবু। প্রথম গায়ে-গতরে গবেষণার

নিম্নস্তরের কাজগুলো করিয়ে নেবার জন্যে মার্কিনীরা এশিয়া থেকে বৈজ্ঞানিক আমদানি করে—যে-দাম পেলে পাকিস্তান এবং ইণ্ডিয়ার সেরা ব্রেনগুলো বর্তে যায় এবং মন্দিরে গিয়ে পূজো দিয়ে আসে, সে-দামে মেমসায়েব ঝি-ও পাওয়া যায় না। আর এখানকার বড়-বড় গবেষণাগারে এমন চেইন সিস্টেমে কাজ হয় যে ওপরের দু'একজন ছাড়া নিচুর দিকে কেউ পুরো ব্যাপারটা বুঝতেই পারে না। এখানে ভাল কাজ করছো ভাল কথা, কিন্তু এখান থেকে বিদায় নিয়ে নিজের দেশে গেলে কোনো কিছুই করতে পারবে না।"

"মার্কিনীরা বেশ ধুরন্ধর জাত মনে হচ্ছে।"

"নিজের স্বার্থের ব্যাপারে কোন জাত ধুরন্ধর নয়? এরা তবু তো চাকর-বাকর হিসেবে বিদেশ থেকে মানুষ আসতে দিচ্ছে, কিন্তু আপনি জাপান অথবা জার্মানীর—এমনকি ফ্রান্সের কথা ভাবুন। আপনি কি চেনেন কোনো ইণ্ডিয়ানকে যে জাপানের কোনো গবেষণাগারে কাজ করছে? অথচ শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ওদের এখন পয়সার অভাব নেই—খোদ নিউইয়র্কের বড় বড় সম্পত্তির মালিকানা ওদের হাতে চলে যাচ্ছে। পৃথিবীর প্রথম দশটা ব্যাঙ্কের প্রায় সব ক'টাই এখন জাপানীদের—সুতরাং হাতে কাঁচা পয়সা নেই বলতে পারবেন না।"

আমার বক্তব্য ঃ "গবেষণা নিয়ে আমাদের মতন দরিদ্র দেশ কী করবে? আমাদের চাই উৎপাদন—কল-কারখানায় ক্ষেতখামারে মানুষ সারাক্ষণ কাজেকর্মে মশগুল হয়ে থাকলেই আমাদের মুক্তি। আর নামে ফ্যাক্টরি রয়েছে, লোকদেখানো ফার্ম রয়েছে অথচ কাজে লবডঙ্কা হলে চলবে কী করে? জাপানীরা, কোরিয়ানরা এই পথেই তো নিজেদের ভাগ্য ফিরিয়ে নিচ্ছে।"

সত্যব্রত দত্ত নিজের হাতে কফি তৈরি করে আনলেন। তারপর মন্তব্য করলেন, "এক-এক সময় পৃথিবী এক-একটা ধারণার বশবর্তী হয়ে চলে। কোনো এক সময় ধারণা ছিল, যে-দেশে যত প্রাকৃতিক সম্পদ সেই দেশ তত সমৃদ্ধ হবে। এই অঙ্ক অনুযায়ী ইন্দোনেশিয়ার সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার অবস্থা কী তা দুনিয়ার সবাই জানে। পরে এক সময় ধারণা হলো, যে-দেশের শ্রমিক যত দক্ষ সে-দেশ তত সমৃদ্ধ হবে। আবার কখনও ধারণা হলো, পুঁজিটাই সব। যার যত ক্যাপিটাল সে তত ধনী হবে, সোনা দিয়ে, ডলার দিয়ে, মার্ক দিয়ে অন্যদেশের মানুষকে তোমার জন্য খাটিয়ে নেওয়া চলবে। এখন ব্যাপারটা পুরো পাল্টে গিয়েছে। যার যত বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান আছে সে তত বড় হবে। 'নো-হোয়াই' এবং 'নো-হাউ' থাকলে অর্থ, শ্রম, কাঁচামাল কোনোটারই অভাব হবে না।"

আমি সত্যব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি বললেন, "জ্ঞানের সীমান্ত অঞ্চলে বসে আছে আমাদের এই ইউ-এস-এ। পৃথিবীতে যা কিছু নতুন জ্ঞান এ-বছরে বা সামনের বছরে পাওয়া যাবে তার সিংহভাগই যে এখানে সৃষ্টি হবে তা

আপনি ধরে নিতে পারেন। এই জ্ঞানকে রক্ষে করা এবং তাকে ঠিকমতন কাজে লাগানোও এক মস্ত ব্যাপার। সায়েবদের সব সময় ভয়, কিছু বুঝি হাতছাড়া হয়ে গেল, চুরি হয়ে গেল, বা ফাঁস হয়ে গেল। দু'দশ লাখ টাকা বা সোনা চুরি হয়ে গেলে আমেরিকান অত বিচলিত হবে না, যত হবে গবেষণাগার থেকে কোনো নতুন উপাদান বা তথ্য হাতছাড়া হয়ে গেলে। তাই গবেষণাগারে ভীষণ সিকিউরিটি, ভীষণ সতর্কতা। গোটা কয়েক যন্ত্র, গোটা কয়েক কমপিউটার এবং গোটা কয়েক শিশিবোতল নিয়ে বসে আছে, কিন্তু সতর্কতা দেখে মনে হবে রানী এলিজাবেথের কোষাগারে ঢুকছেন আপনি।"

"ঠিকই বলেছেন আপনি। এক একটা মার্কিন গবেষণাগারে সিকিউরিটির লোক এমনভাবে আগন্তুকের দিকে তাকায় যে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। জানতে ইচ্ছে হয়, এতোই যদি সন্দেহ তা হলে কেন দেখতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছো?"

সত্যব্রত বললেন, "আসল ব্যাপারটা কী জানেন? এই বজ্র আঁটুনির মধ্যেও জ্ঞান চুরি হচ্ছে। ইনডাস্ট্রিয়াল এসপায়োনেজ বা শিল্প গুপ্তচরবৃত্তি এখন কোটি-কোটি ডলারের উদ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই চুরির প্রচেষ্টায় দেশের প্রতিযোগীরাও আছেন, আবার বিদেশের চোররাও আছেন। জাপানীদের, ইতালীয়দের এইসব ব্যাপারে খুব সুনাম নেই। ঠিকমতন একটা জ্ঞান হাতসাফাই করতে পারলেই কারও পৌষমাস কারও সর্বনাশ!"

আবিস্কার এবং সেই জ্ঞানকে ঠিকমতন কাজে লাগানোর ব্যাপারে ইউরোপ-আমেরিকার যে তুলনা নেই সে-কথাও বোঝালেন সত্যব্রত দত্ত। "আপনি একটা কিছু জ্ঞান আহরণ করলেন কিন্তু সেই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে নেপোয় মারলো দই এমন খবরও ইতিহাসে অনেক পাবেন।"

আমি টেকনলজির ইতিহাসে অতো রপ্ত নই। কিন্তু শুনতে খারাপ লাগছিল না। সত্যব্রত বললেন, "বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও টেকনলজিই যে একটা জাতের সবচেয়ে বড় সম্পদ সে-সম্বন্ধে কোনো দ্বিধা রাখবেন না, শংকরবাবু। এটা হয়তো গল্প-উপন্যাসের বিষয় নয়, কিন্তু এই অপ্রিয় সত্যটা সাধারণ মানুষের কাছেও পৌঁছে দিতে হবে আপনাদের।"

"সাধারণ মানুষ কেন এইসব নীরস ব্যাপারে আগ্রহী হবে, সত্যব্রতবাবু?"

সত্যব্রত হাসলেন। "আগ্রহ হবে যদি ইতিহাসকে আপনি সেইভাবে মানুষের সামনে উপস্থিত করতে পারেন। যেমন ধরুন, আমাদের দেশের ছেলেরা জানে যে ইতিহাসের সেই আদিকাল থেকে আমরা গ্রীক, শক, হুন, পাঠান, মোগলের হাতে মার খেয়েছি, আমাদের উত্তর-পশ্চিম প্রবেশদ্বার আমরা সুরক্ষিত করতে পারিনি। এখন, ইস্কুলে আমার ধারণা ছিল, বহিরাগতদের তুলনায় আমাদের বীরত্ব কম ছিল। কিন্তু পরে যুদ্ধের ইতিহাস পড়তে-পড়তে দেখলাম বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটা বীরত্বের পরাজয়

নয় —টেকনলজির পরাজয়। আপনি হাতি চড়ে চলমান আরব অশ্বারোহীকে তাড়া করতে পারেন না, যত বড় বীরই হোন না আপনি তীর-ধনুক দিয়ে গাদা বন্দুকের সঙ্গে লড়াই করতে পারেন না। আবার গাদা বন্দুক কখনও পারে না রাইফেলের সঙ্গে পাল্লা দিতে। অর্থাৎ শত্রুদের তুলনায় টেকনলজিতে আমরা সবসময় একদাগ পিছিয়ে পড়েছিলাম।"

ব্যাপারটা মন্দ লাগলো না। আমি দ্রুত নোট বইতে দু'একটা পয়েন্ট লিপিবদ্ধ করে নিলাম।

সত্যব্রতর ধারণা, "জ্ঞানকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও কাজে না-লাগানোর বড় দৃষ্টান্ত হলো এশিয়ার। ব্যাপারটা আপনি নিশ্চয়ই আগে শুনেছেন, কিন্তু আপনাকে আবার মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছি।"

"আপনি বলুন। বার বার মনে করিয়ে না দিলে আমরা কোনো জিনিস কাজে লাগাতে পারি না। বাঙালী মধ্যবিত্তর মজ্জায়-মজ্জায় দীর্ঘসূত্রতা, কোনো কাজ আগামীকালের জন্যে ফেলে রাখতে পারলে আজ তা ধরতে ইচ্ছে করে না আমাদের যদিও এদেশে এসে শুনেছি, দোষটা কাটিয়ে ওঠা খুব শক্ত ব্যাপার নয়। তবে রোগটা ভীষণ ছোঁয়াচে—একজন হাই তুলছে দেখলেই অন্য লোকের হাই উঠতে আরম্ভ করে!"

সত্যব্রতর মন্তব্য, "সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপ যে কয়েকশো বছর ধরে সমস্ত পৃথিবীকে পদানত করে রাখলো, এবং মহাসাগরের ওপারে নতুন বিশ্ব আমেরিকা আবিষ্কার করে তা ভাগদখল করলো এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে অবিশ্বাস্য ধনী হয়ে উঠলো এর পিছনে তার জাহাজ, তার বন্দুক-কামান আর তার 'বিল অফ এক্সচেঞ্জ' এই তিনটেই অসম্ভব হতো যদি-না তার হাতে থাকতো দিগদর্শন যন্ত্র—কম্পাস, বারুদ তৈরির জ্ঞান এবং হুন্ডি ব্যবহারের দূরদর্শিতা। এই তিনটির একটাও কিন্তু তার আবিষ্কারের মুরোদ হয়নি। কম্পাস ও বারুদ আবিষ্কার হয়েছিল চীনে এবং হুন্ডি ব্যাপারটা প্রথম মাথায় এসেছিল ভারতবর্ষের এক দূরদর্শী বণিকের।"

"তা হলে আমাদের শিল আমাদের নোড়া দিয়ে ইউরোপীয়রা আমাদেরই দাঁতের গোড়া ভাঙলো, কয়েকশো বছর ধরে পায়ের তলায় চেপে রাখলো আমাদের!"

সত্যব্রত বললেন, "ঠিক ধরেছেন। কিন্তু দোষটা আমাদেরও বটে, জ্ঞান অর্জন করেও আমরা তার ব্যবহার করতে পারলাম না। মার্কিন দেশের মানুষরা ইতিহাসের এই শিক্ষা সম্বন্ধে খুবই সজাগ। তাই নিষ্কাম জ্ঞানার্জনের পিছনে না ছুটে, জ্ঞানকে মানুষের কাজে লাগানোর ব্যাপারে এরা সারাক্ষণ ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। এবং ফলও পাচ্ছে, এ-কথা আপনাকে স্বীকার করতে হবে। উত্তর আমেরিকার ভোগের ইন্ধন যোগাবার জন্যে সারা পৃথিবীর মানুষ যে দিনরাত খেটে মরছে, তার একটি কারণ এ-দেশের এই জ্ঞানভাণ্ডার। পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক, কপিরাইট ইত্যাদির প্রহরায় এরা অর্জিত জ্ঞানের সুরক্ষা নিশ্চিত করছে। যত রকমের চোর-ডাকাত আছে তার মধ্যে

জ্ঞান-চোরকে এরা সবচেয়ে কঠোর শাস্তি দিতে চায়, কারণ এক-একটা পেটেণ্টে এক-একটা দেশের ভাগ্য পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।"

আমি চুপ করে রইলাম। কারণ আমাদের দেশের শিল্প-বাণিজ্য পুরোটাই ধার-করা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল, আমরা এখনও ছেঁড়া কাপড়ের ব্যবসাদার, জাতে উঠতে আমাদের অনেক সময় লাগবে।

সত্যব্রত বললেন, "অপ্রিয় সত্যটা হলো, অনেক দিন পরেও যে জাতে ওঠা যাবে এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। কারণ সেই সময়ে, এইসব দেশ জ্ঞানের ভাণ্ডারে আরও কি সঞ্চয় করে বসবে তা কেউ জানে না। জাপানীদের মতন, কোরিয়ানদের মতন আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং কিছু-কিছু সুযোগের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, তবে যদি ভাগ্যলক্ষ্মী দু'একটা ক্ষেত্রে আমাদের ওপর দয়া বর্ষণ করেন।"

আমি এই কথাগুলোও নিজের নোটবইতে লিখে নিলাম। "সুযোগ পেলে দেশে গিয়ে লিখবো—কিন্তু কোনো ফল হবে কিনা জানি না।"

সত্যব্রত বিশ্বাস করেন, মানুষের মাথায় কোনো নতুন খবর পৌঁছুলে তার ফল হতে বাধ্য।

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে তিনি বললেন, "যদি লেখেনই তা হলে আর-একটা প্রসঙ্গ তুলবেন। কোনো কাজেই শেষ-কথা বলে কিছু নেই। আমাদের দেশে ঘটি বাটি থালা ছুরি এসব শত-শত বছর আগে যেরকম ছিল এখনও সেই একই রকম রয়েছে। অথচ পশ্চিমে এবং সুদূর প্রাচ্যে গত বছরের সমস্ত ডিজাইনিং-এর মধ্যে অস্থিরতা রয়েছে ; এ-বছরের জিনিসপত্তরের সঙ্গে গত বছরের জিনিসপত্তরের কিছু তফাৎ থাকবেই। পুনরাবৃত্তির জালে জড়িয়ে পড়তে রাজি নয়—আর নতুন যা কিছু হচ্ছে তার পরিকল্পনা করছে সেইসব মানুষ যারা এইসব উৎপাদনের ব্যাপারে জড়িয়ে রয়েছে। আমাদের দেশে যারা কল-কারখানার কাজকর্মে জড়িয়ে রয়েছে তারা কলুর বলদের মতন ব্যবহার করে, তাদের চোখে ঠুলি বাঁধা, তারা চোখেও দেখে না, কানেও শোনে না, মাথাও ঘামায় না। ফলে পরিবর্তন স্তব্ধ হয়ে যায়, আমরা সেরা কর্মী হয়েও নতুনকে অসম্মান করার জন্য ক্রমশ পিছিয়ে পড়ি।"

"সত্যব্রতবাবু, অনেক জায়গায় কিন্তু স্রেফ নতুন কিছু করতে হবে বলেই নতুন কিছু করা হচ্ছে। এই অস্থিরতা সব সময়ে ভাল কিনা তাও তো আমরা বুঝি না।"

সত্যব্রত মন দিয়ে আমার কথা শুনলেন। "আপনি প্রশ্ন করছেন, নতুন ভাল, কিন্তু তাই বলে নতুন সম্পর্কে এই অহেতুক হ্যাংলামোটা ভাল কিনা ? আপনার কথার গুরুত্ব আছে, কিন্তু সে এদেশ সম্পর্কে, জাপান সম্পর্কে। এখন অনেকসময় পুরনো ডিজাইন ফিরে আসছে। সম্প্রতি যে পার্কার ফাউনটেন পেন বেরিয়েছে তা বহুবছর

আগের [illegible]ম পার্কার মডেলের মতন। কোকাকোলার যে বোতল-ডিজাইন বিশ্ববিজয় করে[illegible] তো কয়েক দশক আগের একটা ডিজাইনের পুনর্জীবিত সংস্করণ। কিন্তু এটাও [illegible] এক ধরনের নূতনত্বের সন্ধান—নতুন করে পাবো বলেই পুরনোকে ফিরিয়ে আনা। আমাদের কিন্তু কোনো পরিবর্তনই আসে না। ফলে আমাদের সমাজজীবনের, জনজীবনের এবং কর্মজীবনের ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। আমরা নতুনকে সবসময় পরের কাছ থেকে আহরণ করছি—এই পরনির্ভরতা আমাদের আর্থিক ক্ষতি করছে, আমাদের অগ্রগতিকে শ্লথ করছে অকারণে।"

"এসব বলবেন না, সত্যব্রতবাবু। যা চেনা, যা পরীক্ষিত, যা নির্ণীত তাকে ধ্রুবের মতন আঁকড়ে থাকার মানসিকতা আছে বলেই আমাদের পারিবারিক মূল্যবোধ এখনও ধ্বংস হয়নি। এই দিকটা আমাদের বোধহয় লাভনজক হয়েছে।"

হাসলেন সত্যব্রত। "লোকে তাই ভাবছে, মধ্যবিত্ত বাঙালীরা মনে-মনে হয়তো কিছুটা গর্ববোধও করছে। কিন্তু আমার মনে হয়, নতুন মূল্যবোধের চাপ নেই বলেই পুরনো মূল্যবোধকে আমরা 'শাশ্বত' এই তকমা পরিয়ে শান্তি বোধ করছি। কিন্তু এই তথাকথিত শাশ্বত মূল্যবোধ যখন মার্কিন দেশের মাটিতে ল্যাণ্ড করছে এবং নতুনের মুখোমুখি হচ্ছে তখন নানা অঘটন ঘটছে এই ভারতীয় সমাজে। এইসব মানুষকে আপনি নিশ্চয় এবার স্টাডি করছেন, অনেক মূল্যবান খবরাখবর পাবেন, যা দেশের মানুষদের কাজে লাগবে, কারণ একদশক অথবা দু'দশক পরে ভারতবর্ষে কী ঘটবে তার একটা মোটামুটি ইঙ্গিত পেয়ে যাবেন এখানকার ভারতীয় জীবন থেকে।"

আমি বললাম, "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কথা এখন থাক। এ-বিষয়ে দুঃখ পাওয়া ছাড়া এই মুহূর্তে আমাদের তেমন কিছু করবার নেই। বরং স্থানীয় বাঙালীদের জীবন সম্পর্কে কিছু বলুন। এদের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না সাফল্য-ব্যর্থতা সম্পর্কে খোঁজখবর নেবার জন্যই এতোদূর ছুটে এসেছি।"

সত্যব্রত দত্ত নিজে ব্যাচেলার মানুষ। কিন্তু এদেশের অনাবাসী ভারতীয়দের সম্পর্কে অনেক খোঁজখবর রাখেন। বললেন, "বাঙালী লেখকদের ভাবনার কিছু নেই। এককালে একটু বিশেষ ধরনের বাঙালীর ছবি আঁকার জন্যে, পাবার জন্যে লেখকরা ছুটতেন বার্মায়। তারপরে কিছুদিন নজর পড়লো বিলেতের দিকে। এখন আপনাদের সবচেয়ে বড় সুযোগ এই মার্কিন মহাদেশে।"

আমি মৃদু হাসলাম। "শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এবং মা ষষ্ঠীর দয়ায় বাংলা গল্পলেখকদের সংখ্যা তো কম নয়। এবং তাঁদের সকলকে তো করে খেতে হবে।"

"কোনো চিন্তা নেই বাঙালী লেখকদের। কোনো রকমে কষ্ট করে একখানা এক্সকারসন ফেয়ারের এরোপ্লেনের টিকিট কেটে হাজির হোক এই মার্কিন মুলুকে।

বাঙালী দেখলেই জাল ছুঁড়ে দিক, প্রতি ক্ষেপে যদি মাছ না-ওঠে তো কী বলেছি। দেশে আপনাদের কোটি-কোটি লোক, কিন্তু কেউ নূতনত্বকে সাদর আহ্বান জানাতে চাইছে না বলে জীবনের সব পর্যায়ে একঘেয়েমি, আর কে না জানে একঘেয়েমি হলো গল্পের শত্রু। বিলিতি 'নভেল' কথাটার মধ্যেই নূতনত্ব কথাটার ইঙ্গিত রয়েছে!"

সত্যব্রত কফির কাপ নিঃশেষ করে জানালেন, "এতো বড় দেশে ঘোষ বোস মিত্তির হাজরার সংখ্যা হাজার তিরিশেকের বেশী নয়—কিন্তু অভিজ্ঞ চোখে দেখলে হয়তো হাজার তিরিশেক গল্পই আপনারা পেয়ে যাবেন।"

"ধীরে, সত্যব্রতবাবু, ধীরে। বিরাট একটা মন্তব্য আপনি করে ফেলেছেন। যেন এখানকার বোস ঘোষ মিত্তির এবং আমাদের বোস ঘোষ মিত্তিরের মধ্যে বিরাট একটা তফাৎ রয়েছে।"

"অবশ্যই আছে, এটা আপনি ধরে নিতে পারেন, শংকরবাবু। কেন, তা আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এদেশে সুখ আছে প্রচণ্ড, সুযোগও ততোধিক। কিন্তু মনে রাখবেন, বাইরের লোক, বিশেষ করে এশিয়া এবং আফ্রিকার লোকের পক্ষে এখানে ঢোকাটা বেশ শক্ত কাজ। এখানে যে সব বাঙালী দেখবেন তাদের নানা শ্রেণী। এক, যারা অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এদেশে ঢুকেছে এবং এখানে থেকে যাবার অনুমতি পেয়েছে। গ্রীনকার্ড বস্তুটি খুব সোজা নয় এটা মনে রাখবেন। এখানে ডলারের রঙও গ্রীন এবং চাকরির অনুমতির কার্ডও গ্রীন। এখন প্রশ্ন হলো কারা এদেশে এসেছে? দেশে যাদের সুখে থাকতে ভূতে কিলোলো, অনাবাসী হবার জন্যে তারা যে সাধারণ মানুষ থেকে একটু আলাদা তা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে। এদের কেউ এসেছে ছাত্র হিসেবে তারপর ফিরে যেতে চায়নি। অনেকে ছাত্রজীবন শেষ করে নিজের বিদ্যাবুদ্ধি এবং উদ্যমের জোরে ঢুকেছে এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।" সত্যব্রত আরও বললো, "প্রবাসী বউদের মধ্যেই আপনি কিছু টিপিক্যাল বাংলার বধূ দেখতে পাবেন। বিশেষ করে যাঁদের স্বামীরা বিয়ের পরেই প্রবাসী হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর আছে যারা 'মেল অর্ডারে' বিয়ে করেছে গ্রীনকার্ড হোল্ডার বাঙালীকে। এদের বাবা-মায়েরা সবুজ ডলারকে কখনও পাঁচ, কখনও সাত, কখনও বারো, কখনও চোদ্দো টাকা দিয়ে গুণ করে পুলকিত হয়েছে এবং ঝুঁকি নিয়ে বিয়ে দিয়েছে। এইসব স্ত্রীদের অনেকেই বছরের পর বছর ধরে বিরহ-বেদনা ভোগ করেছে এবং মার্কিনী ভিসা অফিসারের সুমতির জন্যে কালীঘাটে পূজো দিয়েছে এবং শেষপর্যন্ত অনুমতি-পত্র লাভ করে এদেশে হাজির হয়েছে।"

"অর্থাৎ অ্যাভারেজ বাঙালিনী থেকে এরা যে সাহসিনী তা প্রম[illegible] এই সমৃদ্ধির দেশে সুখের সন্ধানে হাজির হয়েছে।"

"ঠিক শুনেছেন। আর একটি শ্রেণী হলো যারা মেড-ইন-[illegible] হলেও

আমেরিকান সিটিজান বাঙালী দাদা, দিদি অথবা জামাইবাবুর স্পনসরশিপের দয়ায় বিনা প্রতিযোগিতায় এখানে হাজির হতে পেরেছে। এরাই শেষপর্যন্ত সবচেয়ে বেশী ভোগে এবং কখনও কখনও হেরে গিয়ে অভিমানে দেশে ফিরে যায় এবং আমেরিকার চিরশত্রু হয়ে দাঁড়ায়।"

সত্যব্রতর সংযোজন আরও একটি শ্রেণী আছে, শংকরবাবু। একদিন এরাই সংখ্যায় গরিষ্ঠ হবে। এরা 'বামারিকান'—বাঙালী, কিন্তু বর্ন-অ্যান্ড ব্রট-আপ ইন আমেরিকা। এরা নতুন প্রজন্ম—এরা আপনাকে তোয়াক্কা করবে না। এদের বুঝতে গেলে আপনাকে এদেশে দীর্ঘদিন থেকে অনেক অনুসন্ধান চালাতে হবে। এরা এই মুহূর্তে ভারতবর্ষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, অথচ শেষ পর্যন্ত এরাই ভারতবর্ষের ভরসা, কারণ নতুন করে এদেশে আর ভারতীয় ইমিগ্রেশন হবে বলে মনে হয় না। ষাট ও সত্তরের দশকের সময় আপনারা হয়তো বুঝতে পারেননি, কিন্তু নিঃশব্দে আমেরিকায় প্রবেশ করে আমরা এক ধরনের ইতিহাস তৈরি করেছি। কখনও যদি এই পর্বটা নিয়ে আপনারা বাংলায় বই লেখেন তা হলে মন্দ হয় না, কারণ প্রথম প্রজন্মের অনাবাসীদের মধ্যে ছেড়ে আসা সম্পর্কে একটা প্রচণ্ড ভালবাসা-ঘৃণা মেশানো নাড়ির টান থেকে যায়।"

"এটা কি বাঙালীদেরই বিশেষত্ব?"

"সেটা বলা বোধহয় ঠিক হবে না। হাতের গোড়ায় আমাদের আইজাক সিঙ্গারের গল্প-উপন্যাসগুলো রয়েছে—ইউরোপীয় ইহুদিরা দলে-দলে এদেশে এসেও কীভাবে সেই পুরনো জগতেই মানসিকভাবে পড়ে রয়েছে তার শত-শত নিদর্শন রয়েছে ইডিস ভাষায় রচিত সাহিত্যে। আমাদেরও কয়েকজন পুরোসময়ের সাহিত্যিক এদেশে স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়ে এই কাজ করলে আমাদের সাহিত্যভাণ্ডার আরও ধনরত্নে পূর্ণ হতো।"

নানা শহর পেরিয়ে মার্কিন দেশের যে-অঞ্চলটিতে এসে পৌঁছেছি তা আকারে সুবৃহৎ নয়। যেসব মহানগরীর নাম ট্যুরিস্টদের মুখে-মুখে ঘোরে এটি তার মধ্যে অবশ্যই নয়। এখানেই সত্যব্রত দত্ত দীর্ঘদিন বসবাস করেন।

মার্কিন দেশের একটি বৈশিষ্ট্য, অনেক ছোটখাট অজানা জায়গাতেও বড়-বড় কোম্পানির প্রধান কর্মকেন্দ্র থাকে। আমাদের মতন আধডজন মেট্রোপলিটান অঞ্চলে সব কিছু বড় ব্যবসা অথবা কর্মোদ্যোগ সীমাবদ্ধ নয়।

সত্যব্রতর মুখেই শোনা, "তার একটি কারণ, ছোট-ছোট অঞ্চলেও মানুষ বিরাট কর্মোদ্যোগের সূচনা করতে সক্ষম হয়েছে। এবং এখানেও স্থানীয় আকর্ষণ বলে একটা জিনিস আছে—যার ফলে একটু নাম হলেই হেডঅফিস দিল্লী, বোম্বাই অথবা বাঙালোরে স্থানান্তর করার রেওয়াজ এখানে নেই। বরং ইদানীং একটা উল্টো মনোবৃত্তি

দেখা দিচ্ছে—বড়-বড় কোম্পানি তাদের সদর দপ্তর যেখানে সরিয়ে নিতে চাইছে তা একটি গ্রাম ছাড়া কিছুই নয়। কোম্পানিরা পরিবেশটা গ্রামের মতন রেখেই বিশ্বজোড়া ব্যবসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছে।"

আমি বললাম, "আমাদের ওখানে বর্তমান রেওয়াজ—চলো দিল্লী। সরকারী কর্মকর্তাদের সান্নিধ্য ব্যবসায়ের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে অনেক কোম্পানির বড় সায়েবই এখন দিল্লিতে আপিস সরাচ্ছেন।"

সত্যব্রত দত্ত বললেন, "ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নেই, কারিগরী দক্ষতা নেই, একমাত্র ভরসা সরকারী পারমিট অথবা অনুদান। তাই ওখানে শ্রেষ্ঠীকে হুজুর-হুজুর করার জন্যে সারাক্ষণ সম্রাটের দরবারের কাছাকাছি থাকতে হয়। আমি বলছি না, এদেশে সরকারী সংযোগ ব্যবসায়ীর পক্ষে দরকারী নয়। কিন্তু তার জন্যে মাইনে-করা লোক আছে যে ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। সরকারী প্রসাদ পাবার জন্যে গোটা আমেরিকার শ্রেষ্ঠীরা অবশ্যই সারাক্ষণ রাজধানীতে সদরদপ্তর খুলে বসে থাকবে না।"

সত্যব্রতর প্রতিষ্ঠান রাজধানী থেকে এতো দূরে থেকেও ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে এবং রাজধানী থেকে দূরে বলে কেউ এখানে হীনমন্যতায় ভোগে না।

সত্যব্রত এখানে সুখেশান্তিতে আছেন। "আমেরিকানদের মতন আমি আজ এই কোম্পানিতে কাজ নিইনি। কথায় বলে চাকরি এবং বউ বদলাতে আমেরিকানদের প্রাণে একটুও বাজে না। আমরা ইন্ডিয়ানরাও ব্যাপারটায় ক্রমশ রপ্ত হয়ে উঠছি। এখানকার ম্যানেজমেন্ট শাস্ত্রে 'লয়ালটি' বা আনুগত্য শব্দটার কোনো মূল্য নেই—সবকিছুরই পরিমাপ এফিসিয়েন্সি বা উৎকর্ষে। ফেলো কড়ি, মাখো তেল, আমি কী তোমার পর ? এই পলিসির ওপর ভর করেই এদেশের শিল্প-বিজ্ঞান গড়-গড় করে এগিয়ে গিয়ে আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে !"

একই জায়গায় দীর্ঘদিন কাজ করায় সত্যব্রতর আর্থিক কী ক্ষতি হয়েছে জানি না, কিন্তু মানসিক লাভ হয়েছে। একই অঞ্চলে দীর্ঘদিন বসবাসের সুযোগ পেয়েছেন এবং স্থানীয় সবার সঙ্গেই তাঁর জানাশোনা।

"ব্যাচেলারের ডেরায় থাকবার সুবিধা অনেক, রসিকতা করেছিলেন সত্যব্রত। "এখানে দেশের রান্নাবান্না হয়তো একটু 'মিস' করবেন, কিন্তু গৃহস্বামীর স্ত্রীর অজস্র বাজে-বকুনি আপনাকে হজম করতে হবে না। আপনি এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন। দুপুরে আমিও থাকছি না, সুতরাং ইচ্ছে করলেই আপনার ক্যারাক্টারদের ইনভাইটও করতে পারেন।"

মুখে যাই বলুন, সত্যব্রতর সংসার করার দক্ষতা অপরিসীম। এই ঝকঝকে তক-তকে বাড়ি দেখে কে বলবে গৃহলক্ষ্মী এখানে অধিষ্ঠিতা নন ? সত্যব্রত অবশ্য বলেন, "বাড়িতে লোকজন থাকলে তবে তো বাড়িঘরদোর অগোছালো হবে ! গোছানোর

কোনো প্রয়োজনই হয় না !”

সত্যব্রত এইসব কথা বলছেন সকালে দ্রুত ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করতে করতে তারপর অফিসে বেরুবার আগে অবিশ্বাস্য আমেরিকান দক্ষতায় আমার জন্যে দিশী ভাত ডাল কারি তৈরি করে ফেলেন যাতে দুপুরে মধ্যাহ্নভোজনের সময় আমি হোমসিক অনুভব না করি। এই রান্নার পরিমাণ থাকে তিনজনের জন্যে, যাতে প্রয়োজন হলে আমি আমার পছন্দমতন কাউকে খাওয়াতে পারি ! “এইটা আপনার নিজস্ব ডেরা, আপনার কাজের লোকটি শুধু আজ দুপুরে কয়েকঘন্টা ছুটি নিয়ে বেরিয়েছে এই মনে করে আপনি এখন এখানে থাকবেন !”

রাত্রিবেলায় সত্যব্রত নানা গল্প বলেন এবং সেই সঙ্গে রান্নার কাজকর্ম এগোয় আমি তাঁর নিপুণতা দেখে দুঃখ করি, “এমন ছেলের বিয়ে না হওয়ার কোনো মানে হয় ? একটি বাঙালী মেয়ে অন্তত বিবাহিতা হয়েও ঘরসংসারের হাঙ্গামা থেকে কিছুটা মুক্তি পেতো।”

রান্না চালাতে-চালাতে সত্যব্রত রসিকতা করলেন, “আপনি বোধহয় ঠিক বললেন না। বাঙালী মেয়েরা হেঁসেলের সম্রাজ্ঞী, সেখানে তাঁরা স্বামীকেও বরদাস্ত করতে রাজি নন !”

আমি বললাম, “এই অঞ্চলে আমার আসার কথা নয়। কেন এসেছি তাও আপনার অজানা নয়।”

মিষ্টি হাসলেন সত্যব্রত। “আপনার ক্যারাক্টারের ঠিকানা আপনার কাছে আছে আমি টেলিফোন নম্বরটাও যোগাড় করে এই কার্ডে লিখে দিলাম। আমি বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই যোগাযোগ করতে পারেন। তবে যে সেন্টিমেন্টের ওপর আপনার এখনও বাংলায় গল্প লিখছেন তা কোনোদিন রপ্তানি করা যাবে না। এ-দেশে এটা কোনো গল্পই নয়।”

আমি এখন কমলার কথা আলোচনা করতে চাইছি না। চেনাশোনা মানুষকে নিয়ে শুধু লেখাটাই আমার কাজ নয়, আমার মধ্যেও একটা সামাজিক মানুষ আছে, আমাকে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব নিয়ে সমাজে বসবাস করতে হয়, আমি তো একজনকে কথা দিয়েছি কমলার সঙ্গে দেখা করে আসবো।

সত্যব্রত বললেন, “আপনি তো কিছু সফল বাঙালীর খবরাখবর চাইছেন। আপনি নবগোপাল ব্যানার্জির সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন। তবে লোকটাকে আমার তেমন পছন্দ নয়। তা ছাড়া....”

“আর কিছু বলতে চান ?”

সত্যব্রত হাসলেন, “মার্কিন দেশে বাঙালীরা সাকসেসফুল এই কথাটা দেশে রটে ঠিক কিনা তা বুঝতে পারি না। আমাদের এখানে নানা ধরনের ব্যর্থতাও আছে শুধু স্বপ্নসম্ভব নয় স্বপ্নভঙ্গেরও নানা ঘটনা এখানে ছড়িয়ে আছে—সেগুলো আপনি

দেখলে বোধহয় খুব খারাপ হতো না।”

আমি বললাম, “আপনি যা বলতে চাইছেন তা নিশ্চয়ই সত্যি। কিন্তু আমিও স্বার্থপরের মতন মার্কিন মুলুকে হাজির হয়েছি। বাঙালীরা যে জীবন সংগ্রামে ব্যর্থ, প্রতিযোগিতায় পরাভূত, অন্নসমস্যায় অপারগ তা আজ পৃথিবীর কারও অজ্ঞাত নয়। দরিদ্র অসফল বাঙালীদের কথা পড়ে বাঙালীদের এখন কী লাভ হবে? যে-জাত হীনমন্যতায় ভুগছে, আত্মহননের আশঙ্কা যার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তার জন্য প্রয়োজন সাফল্যের সঞ্জীবনী সুধা। মৃতসঞ্জীবনী সালসার প্রথম উপাদান হলো, কে বলে বাঙালী ব্যর্থ? কে বলে বাঙালী কর্মবিমুখ? কে বলে বাঙালী সাধনায় পরাঙমুখ, দেখো, সুদূর বিদেশেও বাঙালী কী করতে পারে! হে অমৃতের সন্তান, ওঠো, জাগো, বিজয়ী হও, সাফল্যের স্বর্ণসিংহাসন তোমার জন্যেই শূন্য রয়েছে।”

সত্যব্রত বললেন, “তা হলে তো আপনাকে নবগোপাল ব্যানার্জির গপ্পোটা শুনতেই হবে। ওঁর সঙ্গে আপনার যোগাযোগটা 'মাস্ট'।” কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে এবার গাড়ির দিকে ছুটলেন সত্যব্রত। দেরিতে কর্মক্ষেত্রে হাজির হওয়াটা এদেশের কালচারে নেই। তাছাড়া ট্রাফিক জ্যামের বা রাস্তা রোকোর ধুয়ো তোলাটাও এ অঞ্চলে প্রায় অসম্ভব।

আমি এবার কমলার কথা চিন্তা করতে লাগলাম। সেই সঙ্গে নবগোপাল ব্যানার্জির কথাও। নবগোপাল যখন সর্বজনস্বীকৃত একজন সাকসেসফুল বাঙালী তখন তাঁকেও খুঁজে বার করতে হবে।

“শংকরদা, আপনি!” টেলিফোনে আমার গলা শুনে অবাক হয়ে গেল কমলা। “কোথা থেকে কথা বলছেন? ওয়াশিংটন না ন্যু ইয়র্ক?”

এই এক ঝামেলা এই দেশে! প্রযুক্তির কল্যাণে দশ হাজার মাইল দূর থেকে কথা বললেও দূরত্ব বোঝা যায় না। আমি কমলার ছোট্ট শহর থেকেই কথা বলছি শুনে কমলা আরও অবাক হয়ে গেল।

“খুব ভালদিনে ফোন করেছেন, শংকরদা। আজ আমার অফ্-ডে। অন্যদিন আমাকে এই সময় ফোন করে পেতেনও না।”

আমি জানতে চাইলাম, কিছুক্ষণের জন্যে হলেও একবার দেখা হয় কিনা? আমি অবশ্য মনে-মনে প্রস্তুত, কমলা ওর দেশের জানাশোনা কোনো লোকের সঙ্গে দেখা করতে চাইবে না। আমি একবার ভাবলাম বলি, তুমি দেখা না-করলেও আমি মোটেই ভুল বুঝবো না—এদেশে দু'বার এসে, এদেশের গল্প-উপন্যাস পড়ে আমি প্রাইভেসিকে সম্মান করতে শিখেছি। মানুষ যদি কাউকে এড়াতে চায় সেটা তার ব্যক্তিগত অধিকার—মানুষ তো আর কলকাতার পাঁচনম্বর রুটের বাস নয়, যে যার খুশি

সে-ই হাত দেখিয়ে বাস থামিয়ে ভিতরে ঢুকে যাবে।

আমি কোথায় আছি শুনে তবু একটু স্বস্তি বোধ করলো কমলা। সে বোধহয় ভেবেছিল আমি মুখার্জি অথবা হাজরা দম্পতির বাড়িতে উঠেছি। কপালে সিঁদুর লাগানো মেয়েদের যে কমলা পছন্দ করতে পারে না তা আমি আন্দাজ করি।

কমলা বললো, "আপনি নিউ জার্সির ডট্‌বাস্টারদের কথা শুনেছেন? মাথায় সিঁদুরের টিপ পরা ইন্ডিয়ান মেয়েদের স্বামীদের যারা মারধোর করে।"

আমি শুনেছি, এই সব বিশ্ব-বখাটে গুন্ডাদের কথা। কয়েকটা খুন-খারাপিও করেছে তারা। শুধু অশিক্ষিতগুলো জানে না, সিঁদুরের টিপ ফাটিয়ে ফেলা যায় না, সিঁদুর কেবল মোছা যায়। ডট্‌বাস্টার নয়, ডট্‌ওয়াইপার!

কমলা নিশ্চয় আরও খুশি হতো আমি যদি কোনো হোটেলে উঠতাম। এটা আমি বিদেশে বেরিয়ে বারবার লক্ষ্য করেছি। সবাই আলাদা-আলাদা ভাবে কথা বলতে চায়, কেউ চায় না স্থানীয় সমাজের সন্দিগ্ধ চোখের সামনে কারুর মুখোমুখি হতে। কিন্তু বিদেশে বাঙালী পরিবারের স্নেহ-প্রশ্রয়ে থাকবার সুবিধেও অশেষ—অনেক জিনিস খুব সহজে জানা হয়ে যায়। গৃহস্বামী শুধু আতিথেয়তা দেন না, সামাজিক গাইডের কাজও করেন। তাছাড়া আমি ভীষণ 'ঘরকুনো'—হোটেল আমার মোটেই ভাল লাগে না। দীর্ঘদিন যৌথ পরিবারে বসবাস করলে বোধহয় এই রোগ হয়। কাজের শেষে বাড়ি ফিরে চোখের সামনে নিজের লোকজন না-দেখলে মনটা কাতর হয়ে ওঠে। বিদেশে অচেনা স্বদেশের লোককেও মুহূর্তে আপন করে নিতে বাঙালীরা আজও তুলনাহীন। এঁদের স্নেহপ্রশ্রয়েই বিদেশকে আবিস্কার করার দুঃসাহস আমার হয়েছে।

কমলা বললো, "আপনি রেডি থাকুন, আমি আসছি।"

রেডি আমি সবসময়েই হয়ে আছি। টেলিফোন নামিয়ে আমি কমলার কথা ভাবতে শুরু করলাম।

কমলার সঙ্গে আমার যোগাযোগ না হলেই বোধহয় ভাল হতো। কারণ কমলার মা আমাকে বলেছেন, "ওকে বোলো, আমি ওর মুখ দেখতে চাই না।"

যার মুখ দেখতে চাই না তার সঙ্গে দেখা করার হাঙ্গামা না-হওয়াই তো ভাল। কিন্তু আমাদের অর্চনা-মাসীমার দুঃখ আমি বুঝি। অনেকদিন কোনো খবর নেই। মুখ দেখতে না-চাইলেও কেমন আছে তা মা-বাবা অবশ্যই জানতে চাইবেন সারা জীবন ধরে।

আমি অর্চনা মাসীমার কাছে ঠিকানা চেয়েছিলাম। কমলা কোথায় আছে তা তাঁর জানা নেই। কিন্তু তাঁর স্থির বিশ্বাস আমি সহজেই আমেরিকা প্রবাসী মেয়েকে খুঁজে বার করতে পারবো। ওখানে ক'টা আর বাঙালী আছে? তার মধ্যে ক'জনেরই বা কমলা নাম? "তোর কোনো অসুবিধে হবে না।"

"অর্চনা মাসীমা, আমেরিকা দেশটা কত বড় তা আপনার ধারণা নেই। প্রথমে

ইণ্ডিয়া কত বড় তা একটু আন্দাজ করে নিন, দ্বারকা থেকে ডিব্রুগড় কতখানি চওড়া তার আন্দাজ আপনার আছে। এইবার মনে করুন এইরকম কয়েকখানা ইণ্ডিয়া ঢুকে যাবে এই ইউ-এস-এর মধ্যে। সেই দেশে আমাদের ওয়ান-থার্ড-এর কম লোক বসবাস করে। তাদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা ছুঁচের ডগার থেকেও কম।"

"কে বারণ করেছিল ওদের বাঙালীদের নিয়ে যেতে ?"

মাসীমার উত্তরে আমি হেসে ফেলেছিলাম। "মাসীমা, আপনি জানেন আমাদের কেউ নিতে চায় না। আমরা বুদ্ধি করে ওখানে বেশী সংখ্যায় ঢুকতে পারিনি। ঢুকলে আমেরিকানদেরও ভাল হতো আর আমাদেরও ভাল হতো। কিন্তু যা বলছিলাম আপনাকে, ওখানে আমি কী করে কমলাকে খুঁজে বার করবো ? আপনি ওর শহরের নামটাও বলতে পারছেন না।"

কমলার মা অর্থাৎ আমাদের অর্চনা মাসীমা এরপরে চুপ করে ছিলেন। আমি আন্দাজ করে নিলাম, উনি নীরবে বলছেন, ব্যাপারটা ঘটবার পরে কখনো একবারও চিঠি দেয়নি। কিন্তু রাধানাথ তো মাসীমার সঙ্গে দু'একবার যোগাযোগ রেখেছেন। মাসীমা আমার হাতেই রাধানাথের জন্যে একটা প্যাকেট দিলেন। বললেন, 'একটা চিঠিও দিলাম।"

এই প্যাকেটে জামাইকে পাঠানো একটা ধুতি ছিল। আমি ওয়াশিংটনে পৌঁছে মাসীমার জামাই রাধানাথের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম।

কমলার ঠিকানাটা রাধানাথ আমাকে দিতে পারেনি। কিন্তু যে জায়গাটায় কমলা চলে গিয়েছিল তার ইঙ্গিত দিয়েছিল। এবং সেই জন্যই আমার এই ছোট্ট শহরে আসা। মনে পড়ে গেল গতবারে ক্লিভল্যাণ্ডের এক সাংস্কৃতিক সভায় সত্যব্রত দত্তর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল এবং তিনি বাড়িতে যাবার জন্যে সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

রাধানাথ আমার সঙ্গে ওয়াশিংটনে যোগাযোগ করেছিল। কিন্তু আমি তাকে কোনো প্রশ্ন করিনি। আসলে কথাটাই তুলিনি। শুধু রাধানাথ বলেছিল, "এবারে আপনাকে হোটেল থেকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারলাম না। প্রথমত আমার বাড়িটা মূল শহর থেকে দূরে, দ্বিতীয়ত আমার অ্যাপার্টমেন্টে কোনো রান্নার ব্যবস্থা নেই। খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে হবে আপনার। তাছাড়া, আমি কখন অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে যাই এবং কখন ঢুকি তার কিছুই ঠিক নেই।"

অর্চনা মাসীমার চিঠিটা রাধানাথ পড়েছিল। মাসীমা লিখেছেন, "তুমি আজও আমার জামাই আছো। তোমাকে একটা স্নেহ উপহার পাঠালাম। আমি ধরে নিয়েছি আমার মেয়ে নেই।"

চিঠি পড়ে রাধানাথ কোনো কথাই বললো না।

আমি জানি এরপরেও কয়েকটা লাইন আছে। মাসীমা লিখেছেন, "দোষটা তাঁরই। মেয়েকে নিশ্চয় ঠিকমতন শিক্ষা দেওয়া হয়নি।"

রাধানাথ আমার সঙ্গে বেশীক্ষণ সময় কাটায়নি। আমিও অস্বস্তি বোধ করেছি।

তারপর আজ এই প্রতীক্ষা। সত্যব্রত দত্তর বাড়িতে আমি কমলার জন্যে অপেক্ষা করেছি।

আমার মনে পড়ছে কমলার বিয়ের দিনের কথা। বর এলো হৈ-হৈ করে। সানাই বাজলো। আমিও বিয়েবাড়িতে অনেক কাজকর্ম করেছিলাম। কমলা মেয়েটি ভারি শান্ত, ভারি নরম, ভারি মিষ্টি।

গ্রীনকার্ড হোল্ডার জামাই রাধানাথ ক'দিন পরেই আমেরিকা ফিরে গিয়েছে। এবং অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে দেড়বছরের মাথায় কমলাকে নিয়ে গিয়েছে ওয়াশিংটনে।

রাধানাথ ও কমলা তখন একসঙ্গে আমার কাছে চিঠি লিখতো। "এবার এদেশে এলে অন্তত সাতদিন আমাদের বাড়িতে থাকতে হবে। বেশী অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেবেন না—অনেক গল্পগুজব হবে।"

এরপরেও চিঠি এসেছে। "দেশের লোক দেখবার জন্যে আমরা পাগল। কেউ এদিকে আসবার কথা হলেই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। হোটেলে থাকবার কোনো দরকার নেই, আমাদের একটা গেস্টরুম আছে।"

সেইসব চিঠি আমি মাসীমাকে দেখাতাম, আর মাসীমা খুশী হতেন। ইতিমধ্যে আমি উটকো বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে হঠাৎ আমেরিকান গ্রীনকার্ড হোল্ডার বিয়ে করে ঠকবার সম্ভাবনা সম্পর্কে কাগজে এক পরিচিতজনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা লিখেছি।

মাসীমা সে লেখাও পড়েছেন। এবং বলেছেন, "তুই মেয়ের বাপ-মায়েদের শুধু-শুধু ভয় পাইয়ে দিচ্ছিস। কত হীরের টুকরো ছেলে রয়েছে ওদেশে, তারা তোর গল্পের ওই দুষ্টু লোকটার মতন নিজের বউ ছেড়ে অন্য মেমের সঙ্গে ঘর করছে না।"

আমি কোনো উত্তর দিচ্ছিলাম না। মাসীমা বলেছিলেন, "তোর উচিত একবার ওখানে গিয়ে ক'দিন থেকে আমার রাধানাথ-কমলার কথাটাও লেখা—কেমন সুখে তারা ঘরসংসার করছে। কোথাও কোনো হাঙ্গামা নেই।"

মাসীমা খোঁজখবর করতেন, কে বিদেশে বেড়াতে যাচ্ছে। তাকে বলতেন, "ওয়াশিংটনে আমার মেয়ে-জামাই রয়েছে। পারলে খোঁজ কোরো।"

তারপর সেবার বিবেকের কথা নিজেই মেয়েকে লিখলেন। কমপিউটার লাইনের কী কাজ নিয়ে গ্রীনকার্ড পকেটে করে বিবেক দাশগুপ্ত যাচ্ছে প্রথমে ওয়াশিংটনে। মাসীমা বলেই দিয়েছেন, "তোমার কোনো অসুবিধে হবে না, সোজা গিয়ে উঠবে আমার

মেয়ে-জামাইয়ের কাছে। যদ্দিন খুশি থাকবে। আমার জামাই ও মেয়ে দু'জনেই মানুষ ভালবাসে। অতিথি পেলে খুব আনন্দ করে।"

এই পর্যন্ত ঠিকই ছিল। এ-নিয়ে লিখতে বসার কোনো প্রয়োজনও হতো না। কিন্তু যেদিন প্রথম টেলিফোনটা এলো আমার বাড়িতে তখন খুবই চিন্তিত হয়ে উঠেছিলাম। মাসীমার বাড়িতে টেলিফোন নেই।

লং ডিসট্যান্সে রাধানাথ বললো, "শংকরদা, কমলার মাকে একটু আনিয়ে দিন, আমি আধঘন্টা পরে আবার কল করবো। খুবই আর্জেন্ট।"

"কোনো বিপদ-আপদ নয় তো? সব খবর ভাল তো?" আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। ওদিক থেকে উত্তর এসেছিল, "শরীর কারও খারাপ নয়।"

মাসীমা আমার প্রতিবেশী বললেই চলে, পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ। মাসীমা এলেন এবং আধঘন্টা পরে আবার টেলিফোন। একটু কথা বলেই মাসীমা তো ফোন ধরেই কাঁদতে লাগলেন। "না, এ হতেই পারে না।"

মাসীমা এরপর অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। রাধানাথ বলেছে, কমলা গতকাল বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে। ওই যে ছেলেটিকে মাসীমা এখান থেকে গেস্ট হিসেবে পাঠিয়েছিলেন বোধহয় তার সঙ্গেই। গ্রীনকার্ড হোল্ডার বিবেক দাশগুপ্ত।

"এ হতেই পারে না।" মাসীমা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না।

রাধানাথ জিজ্ঞেস করেছে, মাসীমা এ-সম্বন্ধে কিছু জানেন না কি?

"হা ঈশ্বর, আমি এ-সম্বন্ধে কী করে জানবো? কমলা তো কখনও কিছু বলেনি।"

কিন্তু ব্যাপারটা আর কাল্পনিক নয়। কমলা নিজেই স্বামীকে অফিসে টেলিফোনে জানিয়ে দিয়েছে, "আমি চললাম। আমি নিজের পথ দেখে নিচ্ছি। তোমার জিনিসপত্তর টাকাকড়ি ঘরসংসার যেমন ছিল তেমন রইলো। আমি কিছুতেই হাত দিচ্ছি না।"

আমি যেদিন কলকাতা ছেড়ে বিদেশে বেড়াতে আসছি সেদিনও মাসীমা কাঁদতে লাগলেন। "আমি এসব এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার মেয়ে উপবাস করতো, পূজো করতো—সে কেমন করে এমন হবে?"

এইসব পুরনো কথা ভাবতে-ভাবতে দরজার বেল বেজে উঠলো। "কমলা, এসো, এসো।"

কমলা ঠিক সেই আগেকার মতনই আছে, বরং শরীরটা আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। কমলা শ্যামাঙ্গিনী। মেরুন রঙের সিল্কের শাড়ি পরেছে। চোখে হাল ফ্যাশনের পাতলা ফ্রেমের চশমা। নিষ্পাপ দৃষ্টি দেখে কে বলবে স্বামীত্যাগিনী।

কমলাকে বললাম, "কিছু খাও। এখানে সব আছে।"

"দেশে সবাই খেতে চায়, কিন্তু খাবার নেই। আর এখানে সব আছে, কিন্তু কেউ খেতে চায় না। শরীর বেঢপ হয়ে যাওয়ার ভয়ে।"

"অর্থাৎ থাকলেও অশান্তি, না-থাকলেও অশান্তি। তবে তুমি আজ একটু খাও। এই খাওয়াতে আর একটু মোটা হলে কিছু এসে যাবে না।"

কমলা এবার আমাকে অবাক করে দিলো। "আজ আমার উপোস, শংকরদা।"

স্বামীর ঘর ছেড়ে যে পরপুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে তারও আবার দেবদ্বিজে ভক্তি! তারও আবার উপোস!

"তুমি পুজোআচ্চায় এখনও বিশ্বাস করো কমলা?"

"ওমা! কী বলছেন? ঠাকুর-দেবতা, ভগবান এসব তো আমার নিজস্ব জিনিস। এসব কেন আমি ছাড়বো, শংকরদা?"

আমি কীভাবে শুরু করবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। কমলাই আমার সুবিধে করে দিলো। "আমি এখনও বেঁচে আছি কি না, বেঁচে থাকলে আমি কত নিচেয় নেমে গিয়েছি তা দেখতেই নিশ্চয় আপনি এতোদূর ছুটে এসেছেন, শংকরদা।"

আমি কী বলবো? আমি অস্বস্তি কাটাবার জন্যে অন্য প্রশ্ন করলাম। "এ-দেশটা কেমন লাগছে কমলা?"

কমলা হাসলো। "আপনি লিখেছেন এ-দেশে বিয়ে করতে এসে অনেক বাঙালী মেয়ে বিপদে পড়ে যায়। আপনি নিশ্চয় ঠিকই লিখেছেন। তবে আপনাকে বলতে পারি, এ-দেশে এসে অনেক মেয়ে আবার বেঁচে যায়।"

আমি তাকাচ্ছি কমলার দিকে। "এ-দেশকে দোষ দেওয়া খুব সহজ, শংকরদা। এ-দেশের খুঁত খুঁজে বেড়ানোটাও কিছু লোকের পেশা। একটা কথা বলতে পারি, এ-দেশের মানুষের এমন জিনিস আছে যা অন্য কারুর নেই। স্বাধীনতা জিনিসটা কী তা এ-দেশে এসেই বুঝতে পারলাম। আমার কোনো দুঃখ নেই।"

আমি এখনও চুপ করে আছি। কমলা বললো, "এখানে মস্ত গুণ কেউ কারও ব্যাপারে নাক গলায় না। এই যে আমি কার সঙ্গে ঘর করতাম, কেন তাকে ছেড়ে এলাম এ নিয়ে সিঁদুর-পরা বাঙালী মেয়ে ছাড়া কারও কোনো কৌতূহল নেই। এখানে মানুষের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়ে মানুষ বলে, জীবনটা তোমার, তুমি নিজেই ঠিক করো তুমি কেমনভাবে জীবন কাটাতে চাও। কোথাও কোনো শেকল নেই। শুধু বাঙালী বউদের ভয়েই আমি ওয়াশিংটন শহর থেকে এই ছোট্ট জায়গায় চলে এসেছি। এখানে আমার কোনো বাধা নেই। আমি চাকরি করি এবং নিজের মতন থাকি।"

আমি এখনও চুপচাপ বসে আছি। কমলা বললো, "আপনি তো জানতে চাইলেন না কেন আমি স্বামীর সংসার ছেড়ে চলে এলাম?"

আমি হাসলাম। "তুমি কেমন আছ সেটা জানাই আমার একমাত্র কাজ কমলা। আমার আর কোনো প্রশ্ন থাকবার কথা নয়।"

কমলা বললো, "আমাদের দেশে মা যখন ঠাকুরের সামনে মাথা খুঁড়ে বলতেন, ঠাকুর আমাকে মুক্তি দাও, তখন তার অর্থ বুঝতাম না। এ-দেশে এসে এখন আমি

বুঝতে পারি কত বাঙালী মেয়ে জেলখানায় জন্মে, জেলখানাতেই ঘরসংসার করে, জেলখানাতেই জীবন শেষ করছে।"

আমি আবার কমলার মুখের দিকে তাকালাম। কমলার অনুরোধ, "মাকে বলবেন, ভীষণ কিছু হয়নি। ওকে আমার ভাল লাগলো না, তাই আমি চলে এসেছি। আমার মায়েরও ভাল লাগতো না আমার বাবার সংসার—কিন্তু তিনি মেনে নিয়েছিলেন। এ-দেশে এই মস্ত এক সুবিধে—যা ভাল লাগে না তা সহ্য করে নিজেকে সারাজীবন কষ্ট দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনি মাকে বলবেন, কমলা নিজেকে ঠকাতে চায়নি বলেই বেরিয়ে এসেছে।"

"আর বিবেক? সে কোথায়?"

কমলা বললো, "না, বিবেকের সঙ্গে আমি থাকি না। ও তো একটা নিমিত্তমাত্র। ও ওয়াশিংটনে আসার পরেই আমি বুঝতে পারলাম আমি নিজেকে ঠকাচ্ছিলাম। কিন্তু বিবেক ইজ ম্যারেড। ওর বউ দেশে গ্রীনকার্ডের জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমি ওসব সম্পর্ক নষ্ট হতে দিইনি। আমি একলাই চলে এসেছি।"

কী ভীষণ নরম মেয়ে ছিল এই কমলা। একলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাসে হাওড়া স্টেশন আসতে পারতো না। সে এখন সুখে আছে কি না জানি না, কিন্তু অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছে।

আমি বললাম, "মা মুখে যাই বলুন, তোমার জন্যে সবসময়ই চিন্তা করেন।"

কমলা এবার উঠে পড়লো। বিদায় নেবার আগে বললো, "এ-দেশে না-এলে স্বাধীনতা কাকে বলে তা আমি বুঝতেই পারতাম না। মাকে বলবেন, যে একলা থাকতে ভয় পায় সে কখনও পুরো স্বাধীন হতে পারে না। এখানে একলা থাকার কোনো অসুবিধে নেই: আমি বেশ ভাল আছি।"

একই জীবনে মানুষ কত বদলে যেতে পারে ভেবে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে রইলাম। তারপর অনেক সময় ধরে ভাবতে লাগলাম, কমলাকে আমি সফল না ব্যর্থ কোন তালিকায় ফেলবো?

সত্যব্রত বিকেলে ফিরে আসবার পরে তাকেও প্রশ্ন করেছিলাম। সত্যব্রত বলেছিলেন, "স্বাধীনতার সঙ্গে সুখের কোনো সম্পর্ক নেই। দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, এ-কথা আপনার অর্চনা মাসীমাকে বুঝিয়ে বলবেন।"

এইসব কথাব মধ্যেই ডিনার তৈরি হলো। এবং ডিনারের মধ্যেই টেলিফোনটা বেজে উঠলো। সত্যব্রত বললেন, "আজ আপিস থেকে নবগোপাল ব্যানার্জির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। উনি আপনার এপার বাংলা ওপার বাংলা পড়েছেন। আমি বলেছি, সামান্য কিছুক্ষণ কথা বলতে চান। উনি আজকেই খবর দেবেন বলেছেন।"

নবগোপাল ব্যানার্জিই ফোনে কথা বলছেন। ফোন নামিয়ে দিয়ে সত্যব্রত বললেন, "উনি আগামীকালই বাইরে চলে যাবেন। তাই আজকেই ওঁর বাড়িতে পৌঁছে দিতে

বলছেন। ওঁর ইচ্ছে আজ রাত্রিটা আপনি ওখানেই কাটান, কাল সকালে উনি আপনাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে যাবেন।"

এ-দেশে মানুষের সময়ের দাম ভীষণ। অনেক আগে থেকে লোকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে থাকে। আমি হুট করে কারও সঙ্গে কোনো কথাবার্তা ঠিক না-করেই চলে এসেছি। সুতরাং আমার পক্ষে এইভাবেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে।

সত্যব্রত এবার গাড়ি বার করলেন। বললেন, "আপনি শুধু একটা পাজামা-পাঞ্জাবি নিন। টুথপেস্ট টুথব্রাশ নেবারও দরকার নেই। অতিথিবৎসল ইন্ডিয়ানরা আচমকা অতিথির জন্যে বাড়তি টুথব্রাশও বাড়িতে রেখে দেন। আপনার কোনো কষ্ট হবে না।"

মাইল কুড়ি দূরত্বকে এখানে কেউ দূরত্বই মনে করে না—যেন পাশের পাড়ায় গল্প করতে যাচ্ছে।

সত্যব্রত বললেন, "আপনি খুব লাকি লোক। নবগোপাল ব্যানার্জি যে আপনাকে বাড়িতে ডাকবেন তা ভাবতে পারিনি। উনি এখানকার ইন্ডিয়ান সমাজে মেশেন না। এতো বড় যে দুর্গাপুজো—দু'দিন এখানে যে মহোৎসব হয় তাতেও কখনও আসেন না। কিন্তু চাঁদা দেন। ফোন করা মাত্র সেক্রেটারির কাছে চেক পাঠিয়ে দেন। এবারে পাঁচশো ডলার দিয়েছেন, হায়েস্ট কনট্রিবিউশন. কিন্তু আসেননি।"

সত্যব্রতর মতে. "এই দুর্গাপুজোটাই আমাদের আইডেনটিটি বাঁচিয়ে রেখেছে। দুশো আড়াইশো মাইল দূর থেকে মানুষ চলে আসে, খিচুড়ি ভোগ খায়। আমরা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো করি। আপনি হয়তো শুনে থাকবেন, নর্থ আমেরিকার কোনো-কোনো জায়গায় ছোটদের জন্যে 'বীফ' ভোগেরও প্রচলন হয়েছে। এখানকার বামারিকানরা মাংস ছাড়া অন্য কিছু খেতে পারে না। তর্কে এদের সঙ্গে পেরে উঠবেন না। প্রথম বক্তব্য—মা দুর্গা তো 'বাফেলো ডেমন' মহিষাসুরকে 'কীল' করেইছেন. সে-ক্ষেত্রে মাংস খেতে বাধা কোথায়? ইন্ডিয়ানরা এতো গরীব হয়েও বেহিসেবী আর আমেরিকানরা ধনী হয়েও হিসেবী, অপচয় অথবা নষ্ট তাদের স্বভাবের বাইরে।"

ঘরের মেঝের মতন মসৃণ রাস্তা ধরে সত্যব্রতর জাপানী গাড়ি ডাটসুন ছুটে চলেছে। সত্যব্রতর মন্তব্য, "পুজোটাকে একটু আমেরিকানাইজ করে নিতে হয়েছে। আপনাদের এখানে মা আসেন পঞ্জিকার টাইম টেবিল ধরে, আমরা টাইম টেবিলের খবর রাখি, কিন্তু মা যদি সোমবারে বোধন চান তা হলে আমরা অপরাগ। মায়ের অধম সন্তানদের তো উইক এণ্ডটাই ভরসা। তাই শনি-রবির প্রয়োজনে কখনও আমেরিকান পুজো এগিয়ে যায় কখনও পিছিয়ে আসে। প্রয়োজনের তাগিদে রামচন্দ্রও তো অকালবোধন করেছিলেন, সুতরাং শুধু বামারিকানদের দোষ দেওয়া চলবে না।"

সত্যব্রত জানালেন, "আমরা আরও একটু স্বাধীনতা নিই। বোধন, অধিবাস থেকে সপ্তমী, মহাঅষ্টমী, মহানবমী, বিজয়া দশমী কিছুই বাদ দেওয়া হয় না, কিন্তু চার

দিনের ব্যাপারটা স্যাণ্ডউইচ করে শনি-রবিতেই শেষ করে ফেলা হয়। তা ছাড়া উপায়ও নেই। কারণ আমরা যেসব কমিউনিটি হল ভাড়া করি তা অন্য দিনে পাওয়াও যায় না।"

"আপনি একবার পুজোর সময় আসতে পারেন। আমেরিকান নিপুণতার সঙ্গে ভারতীয় ভক্তির মিলন দেখে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। সবাই আসেন, হৈ-হৈ করেন। উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতি ওই আপনার কমলা চৌধুরীর এবং মিস্টার নবগোপাল ব্যানার্জির। পূজো আপনার বাউন দিয়েই করাবার চেষ্টা করা হয়, দু-একটা মুখুজ্যে বাঁড়ুজ্যে অনারারি পুরোহিত জুটেও যায়। গতবারে হঠাৎ বাউন পুরুতের অভাব হলো—আমরা বাধ্য হয়ে নবগোপাল ব্যানার্জিকে লাস্ট মোমেন্টে ফোন করলাম। ভদ্রলোক স্রেফ বলেছিলেন, আজকেই তিনি আলাস্কায় চলে যাচ্ছেন, ফিরবেন পরে।"

"তখন কী হলো?"

"তখন অগত্যা অগতির গতি নিউইয়র্কের প্রবীর রায়কে ফোন করা হলো। উনি শেষ মুহূর্তে ফ্লাই করিয়ে অনারারি এক গাঙ্গুলীকে পাঠিয়ে দিলেন। ওঁদের অসুবিধে হলো না এই জন্যে ওঁদের পূজোটা পরের উইকএণ্ডে। অর্থাৎ আমেরিকাই হচ্ছে একমাত্র জায়গা যেখানে পরপর দুটো শনি রবিবারে মায়ের পূজো দেখতে পাবেন।"

দুর্গাপূজো সম্বন্ধে হাজার-হাজার পাতা লেখা হয়ে গিয়েছে, ও বিষয়ে এই মুহূর্তে আমার তেমন আগ্রহ নেই। হাতের মুঠোয় যে সামান্য সময় রয়েছে তা আমি কৃতী বাঙালীদের অনুসন্ধানে ব্যয় করতে চাই। আমাদের কলকাতায় যারা মাথা নীচু করে যদু-মধু হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যাদের সম্বন্ধে সবার ধারণা তারা অপদার্থ, তারা সুযোগ পেলে কী খেলা দেখাতে পারে আপাতত তাই আমার অনুসন্ধানের বিষয়।

এই রকম বাঙালী আমি কয়েক ডজন পেয়েছি ন্যু ইয়র্কে, যারা কপর্দহীন অবস্থায় এসে নিজের চেষ্টায় ভাগ্যকে জয় করেছে। আমি অ্যাকাউনটেন্ট প্রবীর রায়ের কথা আগেই লিখে ফেলেছি—যিনি চাটার্ড আকাউনটেন্ট হয়েও জামাকাপড়ের দোকানে মোট বয়ে গ্রাসাচ্ছাদন করতেন। ন্যু ইয়র্কে তিনিই এখন কেষ্টবিষ্টু লোক।

সেবার পেশাগত সাফল্যের কথা বলা হলেও প্রবীরবাবুর বঙ্গভবনের কথা উল্লেখ করা হয়নি। খোদ ন্যু ইয়র্ক শহরের বুকের ওপর ষাট-সত্তরটি পরিবারের বসবাসের উপযাগী বিশাল অট্টালিকা 'বঙ্গভবন,' যার মালিকানা বাঙালীদের হাতে, যেখানে বসবাসকারী প্রায় সবাই বাঙালী। খোদ কলকাতা শহরে যে দৃশ্য এখন বিরল তা দেখবার ইচ্ছে হলে আপনাকে পাসপোর্ট করিয়ে টিকিট কেটে এই ন্যু ইয়র্কে আসতে হবে। বাঙালীর যা শ্রেষ্ঠ তা শেষ পর্যন্ত এই ইউ-এস-এ এবং কানাডা ছাড়া আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সত্যব্রতর মন্তব্য : 'মিস্টার নবগোপাল ব্যানার্জিকে আপনি কৃতী বাঙালী বলতে পারেন। অন্য বাঙালীরা চাকরিতে আছে এবং ডাক্তারি ও অ্যাকাউনটেন্টের পেশায় আছে। ব্যবসায়ে নেই বললেই চলে। অথচ ঝটপট পয়সা তো ওই বিজনেসে। মিস্টার ব্যানার্জি একটা নামকরা ওষুধের দোকানের চেইন স্থাপন করেছেন। নামের মধ্যেও বাংলা গন্ধ রয়েছে—'বেমকো' দোকানের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।"

"ভদ্রলোক কি ডাক্তার ?"

"না মশাই, এখানে ডাক্তাররা ওষুধের দোকানের মালিক হয় না। উনি কী তা আমি জানি না। শুধু এইটুকু জানি ওষুধের দোকান ছাড়াও রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায় হাত দিয়েছেন।"

"এই বস্তুটি কী ?"

"জমি এবং সম্পত্তি কেনা-বেচার ব্যবসা বলতে পারেন। আমাদের কলকাতায় এই ব্যবসাটা তেমন সম্মানিত নয়, কিন্তু এখানে কোটি-কোটি ডলার খাটছে। যার কিছু বাড়তি পয়সা আছে সে রিয়েল এস্টেটে কিছু লগ্নী করবেই। এ এক অদ্ভুত দেশ মশাই ! আমি নিজেই জমি কিনেছি ফ্লোরিডায় এবং স্পেনে।"

"এইসব সম্পত্তি বেড়া-ট্যাড়া দিয়েছেন তো ?"

হাসলেন সত্যব্রত। "আমি ফ্লোরিডাতেও যাইনি, স্পেনেও যাইনি। জমির ডকুমেন্ট শুধু দেখেছি, বাকি সব শুনেছি এজেন্টের কাছে। ওই কোম্পানি সব জানে। মিস্টার নবগোপাল ব্যানার্জির শুনেছি এইটা ছিল অবসর বিনোদনের পেশা। কিন্তু যারা দূরদর্শী হয় তারা খেলার মাঠে খেলতে গিয়েও টাকা রোজগার করে ফেলে। টাকা যদি একবার ঠিক করে যে আপনার পিছনে ছুটবে তা হলে মুশকিলের ব্যাপার—কোথা থেকে আপনার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বেড়ে যাচ্ছে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন না। টাকা যে ডিম পাড়ে !"

"ধীরে, মিস্টার দত্ত, ধীরে। আমাদের দেশের লোকদের এসব কথা সহজে হজম হবে না। ভাববে, আমি বানিয়ে লিখছি। স্বদেশে বাঙালীরা শুধু জানে, দেনায় দেনা বাড়ে। বেশি টাকা আমাদের ধাতে সয় না। আমাদের ধারণা, অর্থই অনর্থের মূল।"

"একদম বাজে কথা, শংকরবাবু। আপনি এদেশে ভাল করে ঘুরে দেখুন। আপনারা যাকে কোটিপতি বলেন তা এখানে হাজারে-হাজারে নয় লাখে-লাখে পাবেন। অর্থ এদের স্বাস্থ্য, সুখ, সমৃদ্ধি এবং সুরক্ষা দিচ্ছে। কোনোরকম অনর্থ সৃষ্টি হচ্ছে না—আসলে দারিদ্র্য থেকে যত অনর্থ সৃষ্টি হয়, অর্থ থেকে তার শতকরা এক ভাগও হয় না।"

"অর্থের গুণগান আমাদের দেশে ফ্যাশনেবল নয়, সত্যব্রতবাবু। যারা অর্থবান সাধারণত তারা খারাপ লোক হয়, এমন একটা ধারণা সমাজের বহু স্তরে রয়েছে।"

"এখানে উল্টো। দরিদ্রকেই অনেক সময় লোকে সন্দেহের চোখে দেখে। কারণ সীমাহীন সুযোগের এই দেশে কর্মহীন, অর্থহীন হয়ে থাকবার বিশেষ কোনো যুক্তি নেই, যদি-না আপনার ব্যক্তিগত কোনো ত্রুটি থাকে। ধনবানরা কুড়ে একথাও বলতে পারবেন না এই দেশে। যত বড়লোকই হোন না কেন, নিজের রান্না নিজে করতে হবে, নিজের এঁটো বাসন নিজে মাজতে হবে, নিজের ময়লা কাপড় নিজে কাচতে হবে, নিজের গাড়ি নিজেকে চালাতে হবে। বাই-দি-বাই, গাড়িটা এখানে সমৃদ্ধির প্রতীক নয়—আমাদের দেশে যেমন প্রত্যেকের জন্যে রবারের চটি, এদেশে তেমনি একখানা গাড়ি। যেকথা বলছিলাম আপনাকে, এদেশে যত ধনসম্পত্তি বাড়ে মানুষ তত পরিশ্রমী হয়ে ওঠে। অর্থ এখনও মানুষকে এদেশে অকেজো করতে পারেনি, বরং মানুষকে উদ্যম ও প্রাণশক্তি বাড়িয়েই চলেছে।"

সত্যব্রত বললেন, "এই নবগোপাল ব্যানার্জি মানুষটিও নিশ্চয় সেই রকম। শুনেছি তেরো-চোদ্দো ঘন্টা পরিশ্রম করেন। ওঁর দোকানগুলোতে গণ্ডায়-গণ্ডায় সাদা চামড়ার সায়েব মেম কাজ করছে আর আমাদের নবগোপাল ব্যানার্জি দোর্দণ্ডপ্রতাপে কোম্পানি চালাচ্ছেন একথা আপনি নিশ্চয় লিখতে পারেন।"

চলমান গাড়িতেই আমি কয়েকটা পয়েন্ট নোট বইতে লিখে নিচ্ছি। কোনো অসুবিধে নেই—কারণ যেমন রাস্তা তেমন গাড়ি। বিন্দুমাত্র ঝাঁকুনি নেই। সত্যব্রত বললেন, "নিজের চেষ্টায় বড় হওয়ার অনেক গল্প আপনি এদেশে পাবেন। পাঁচ বছর আগেকার ফকির এখন রাজা হয়েছে এটা কোনো ব্যাপারই নয়।"

আমি বললাম, "আমাদের ঠিক উল্টো। দু'চারটে সেকেলে বাঙালী রাজা কী করে ফকির হয়ে ভদ্রাসন পর্যন্ত লাটে তুলে দিচ্ছে তার খবরাখবর কলকাতায় পাবেন, কিন্তু কোনো মানুষের ভাগ্যই ফেরে না। যে গরীব সে ক্রমশ আরও গরীব হচ্ছে। কাউকে এরই মধ্যে একটু উঠে দাঁড়াতে দেখলেই মানুষ সন্দেহ করে, তারপর তাকে টেনে হিঁচড়ে নামাতে চায়। অকারণে মানুষ যে কতখানি মানুষের শত্রু হতে পারে তা যদি কেউ দেখতে চায় তা হলে তাকে ভারতীয় উপমহাদেশে আসতেই হবে। দারিদ্র্য বড় সর্বনাশা জিনিস, সত্যব্রতবাবু। অভাবের অ্যাসিডে মনুষ্যত্ব অতি সহজে নষ্ট হয়ে যায়।"

"আপনি বলছেন, মানুষের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়?"

"আত্মবিশ্বাসের অভাব—আপনি ঠিকই ধরেছেন। অনেকটা শ্লথগতি প্যারালিসিসের মতন—ক্রমশ মানুষকে পঙ্গু করে দেয়। সেই জন্যেই তো আমি বিদেশে এসেও কৃতী দেশের মানুষের খোঁজ করছি। আমি বাঙালীর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিতে চাই। বলতে চাই, আমাদের বিশেষ কিছু দোষ নেই। সময়ও কিছু শেষ হয়ে যায়নি। দেখো, এই বেড়ালই বনে গিয়ে কেমন বাঘ হয়েছে! মগজ খাটালে এবং চেষ্টা করলে আমরা পারবো না এমন কিছু কাজ এই পৃথিবীতে নেই। এই ধরনের কথাই বিবেকানন্দ

বলেছিলেন। কিন্তু এখন তাঁকে নিয়ে ভক্তি কেত্তন শুরু হয়েছে বুড়োদের—ছোকরাদের কানে তাঁর কথাগুলো একদমই পৌঁছয় না।"

"আপনি ঠিক লোকের কাছেই যাচ্ছেন, শংকরবাবু। নবগোপালবাবু আপনার একটা আদর্শ চরিত্র হতে পারেন। কারণ যতদূর জানি, এই ভদ্রলোক কিছু পড়াশোনায় কৃতী ছিলেন না, নামের শেষে বড়-বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের টাইটেলও নেই, তবুও নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন।"

আমরা ইতিমধ্যে নবগোপাল ব্যানার্জির বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। বাড়ির নাম শ্রীদুর্গা! "তা হলে বোঝা যাচ্ছে দুর্গাভক্ত। এই বিদেশেও যখন মহিষাসুরমর্দিনীর পাবলিসিটি করছেন!"

"হতেও পারে. নাও হতে পারে। আপনাকে বললাম, উনি আমাদের পূজোয় কখনও আসেন না। চাঁদাটাই তো সব নয়। ভগবানের দয়ায় চাঁদা এখানে অনেকেই দিতে পারে, কিন্তু নিজের উপস্থিতিটাও একান্ত প্রয়োজন।"

বাড়িটা যে বিশাল সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। ক্লোজড সার্কিট টি-ভিতে আমাদের আসতে দেখেই নবগোপাল ব্যানার্জি বেরিয়ে এলেন।

নবগোপালের বয়স আমার থেকে অনেক কম, তবে চল্লিশ পেরিয়েছে। দেশে যাদের সায়েবদের মতন ফর্সা বলা হয় নবগোপাল তাঁদেরই একজন। লম্বায় অন্তত ছ'ফুট। গোলগাল মুখটি, কিন্তু শরীর সুশাসিত। চেষ্টা করে যে ওজন আয়ত্তে রাখা হয়েছে তার ইঙ্গিত ছড়িয়ে রয়েছে দেহে।

"আসুন, আসুন। আপনি অনেক মোটা হয়ে গিয়েছেন।" নবগোপাল প্রথমেই আমাকে সারপ্রাইজ দিলেন।

"আপনি আমাকে দেখেছেন?"

"অবশ্যই দেখেছি! আপনি তখন বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সে ধুতি শার্ট পরে আপিসে আসতেন, তখনও আপনি জগদ্বিখ্যাত হননি!"

"আমাকে আর লজ্জা দেবেন না। নিজের দেশেই ক'টা লোক চেনে তার ঠিক নেই, আপনি আবার জগতের কথা তুললেন।"

হা-হা করে হাসলেন নবগোপাল! "বাঙালী পাঠকরা সংখ্যায় যতই নগণ্য হোক সারা জগতে তারা ছড়িয়ে আছে—সুতরাং আপনাদের জগদ্বিখ্যাত বললে টেকনিক্যাল ভুল করা হয় না।"

সত্যব্রত অনুরোধ সত্ত্বেও ভিতরে ঢুকলেন না। বললেন, "আপনারা তা হলে তো পরস্পরকে চেনেন।"

"উনি চেনেন না, কিন্তু আমি ওঁকে চিনি। উনি আমাদের টিকিয়াপাড়ার বাড়িতেও এসেছেন।"

আমি সত্যিই আশ্চর্য হচ্ছি। "আসুন, আসুন—সমস্ত রাত পড়ে আছে, অনেক কথা হবে।"

নবগোপালের বাড়িটা যেন একটা শিল্প সংগ্রহশালা। আমরা প্রথমে যে ঘরটিতে গেলাম সেখানে গ্রীস ও ইতালির প্রভাব। কত মূর্তি ও শিল্পকর্ম যে যেখানে শোভা পাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। দেওয়ালে রেনেশাঁসি ঢঙের তৈলচিত্রও রয়েছে। আমি চিত্র বিশেষজ্ঞ নই, কোন ছবি অরিজিন্যাল এবং কোন ছবি নকল না আমি বুঝে উঠতে পারি না।

আমি আরও অবাক হলাম, নবগোপাল-গৃহে একটি মেমসায়েব পরিচারিকা রয়েছেন। নবগোপাল বললেন, "আপনার জন্যেই জেনকে আজ সন্ধ্যেবেলায় থাকতে রিকোয়েস্ট করেছি। না-হলে জেন সকালেই সব কাজকর্ম সেরে চলে যায়। আমি অবশ্যই রাঁধতে পারি। কিন্তু জেন আপনার জন্যে কিছু ইতালিয়ান খাবার করে ফেলেছে।"

জেনকে টেবিল তৈরি করতে অনুরোধ করে, নবগোপাল এবার আমাকে দোতলায় নিয়ে গেলেন। আগাগোড়া কার্পেটে মোড়া বাড়ি। সিঁড়িতেও কার্পেট। বলা বাহুল্য সমস্ত বাড়িটা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত।

পাশ্চাত্য থেকে যেন এবার প্রাচ্য দেশে চলে এলাম। দোতলাটা পুরোপুরি ভারতবর্ষ! এখানে কত রকমের শিল্পকর্ম যে জড়ো করা হয়েছে তা ভাবা যায় না।

একটা পোড়ামাটির পুতুল তুলে নিলেন নবগোপাল। "এদেশে ভারতীয় অ্যানটিকের সংগ্রহ নেই একথা ভাববেন না। অনেক ব্যক্তিগত কালেকশানে অনেক চমৎকার জিনিস আছে, তবে সবসময় কদর নেই। আপনি বিশ্বাস করবেন না, আমি দু'খানা যামিনী রায়ের ছবি কিনেছি জাংক সেল থেকে। বাড়ির কেউ হয়তো যুদ্ধের সময় কলকাতায় গিয়েছিল বিটউইন উনিশশো' চল্লিশ এবং পঁয়তাল্লিশ। আর এই মহেঞ্জোদারোর পুতুল, এটাও আমি মাত্র দশ হাজার ডলারে তুলে নিয়েছিলাম। আসলে ইন্ডিয়া সম্বন্ধে এদের তেমন আগ্রহ নেই। ইজিপ্ট, ইটালি সম্বন্ধে এদের যতটা কৌতূহল তার একচুল নেই হরপ্পা মহেঞ্জোদারো সম্বন্ধে। ম্যাক্সিমাম ওই তাজ। এম্পারার শাজাহানের ব্যবহৃত জিনিস থাকলে আপনি হয়তো দাম পাবেন!"

"দোষ দেওয়া যায় না। ভারতীয়দের তো এরা বেশী দেখেনি। যেসব ভারতীয়রা এখন এদেশে থেকে গেছেন, তাদের ছেলেমেয়েরা যদি কৃতী হয় তারা হয়তো পুরনো ভারতীয় জিনিসের কদর করবে।"

"নাও হতে পারে।" হাসলেন নবগোপাল। "পূজোপার্বণের নাম করে এখানকার ইন্ডিয়ান বাবামায়েরা যেভাবে ইন্ডিয়ান কালচারের সালসা খাওয়াবার চেষ্টা করেন তাতে উল্টো ফলও হতে পারে!"

নবগোপালের 'ভারতবর্ষ' দ্রুত পরিভ্রমণ করে আমরা নিচে ডাইনিং টেবলে ফিরে

এলাম এবং 'সেকেণ্ড' ডিনারে বসে পড়লাম। "আমারই ভুল। আমারই বলা উচিত ছিল আপনি এখানে এসে খাবেন" নবগোপাল শান্তভাবে বললেন।

ডিনার টেবিলের সামনের দেওয়ালে একখানা রঙীন ছবি। ওয়াটার কালার। দৃশ্যটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে, কিন্তু বুঝতে পারছি না।

হাসলেন নবগোপাল। "হাওড়া টিকিয়াপাড়ার দৃশ্য। ভিউ ফ্রম বাঙালবাবুর ব্রিজ। একটা ফটো তুলে এনেছিলাম। তারপর এখানে এক শিল্পীকে দিয়ে আঁকিয়ে নিয়েছি। ফটোটা দেখলে মাঝে-মাঝে ভয় ধরতো, ওয়াটার কালারে তা হয় না। মনে হয় কোন দূর দেশের ছবি। আমার একটা পিক্যুলিয়র অবস্থা—না রাখতে পারি না ফেলতে পারি এই টিকিয়াপাড়ার জীবনটা।"

নবগোপাল এবার বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের রহস্যটা উদ্‌ঘাটন করলেন। "বাণীর বরপুত্র আপনি। কত সংগ্রাম করে, চেম্বারে কলম পিষতে-পিষতে আপনি লেখকজীবনে ঢুকলেন, রাত কলেজে বি-এ পাস করলেন এসব আমার জানা। আমার বাবা প্রায়ই আপনার কথা বলতেন।"

বাবার নাম ননীমাধব ব্যানার্জি।

"ননীবাবুর ছেলে আপনি। ও গড! ননীমাধববাবু তো চেম্বারে আমাদের ডিপার্টমেন্টেই হেড টাইপিস্ট হয়েছিলেন। খুব ভাল টাইপ করতেন। আরবিট্রেশন ডিপার্টমেন্টের আমাদের ভিনসেন্ট সায়েব, ফিলিপস সায়েব তো ননী বলতে অজ্ঞান ছিলেন।"

"আমরা থাকতাম টিকিয়াপাড়া ব্রিজের তলায় একটা ভাঙা বাড়িতে। যুদ্ধের আগে থেকে ভাড়া করা—আটাশ টাকা মাসে ভাড়া ছিল। সেসময় তাও দিতে বাবার কষ্ট হতো।"

আমার মনে পড়লো ননীমাধববাবুর অনেকগুলো ছেলেমেয়ে ছিল। বাধ্য হয়েই ওভারটাইমের জন্যে খুব চেষ্টা করতেন। ননীবাবু খুব ধার্মিক ছিলেন।

"বাবা শুধু ওভারটাইমই করতেন না, বাড়তি রোজগারের জন্যে পুরুতের কাজও করতেন, আপনার কাছে লুকবো না। লক্ষ্মীপুজো, সরস্বতী পূজো, দুর্গাপূজো কিছুই বাদ যেতো না।"

"লুকোবেন কেন? মুখুজ্যে, বাঁড়ুজ্যে, চাটুজ্যেদের ওইটাই তো আদি পেশা। আপনার আমার লজ্জা করবার তো কিছু নেই।"

মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল নবগোপালের। "এদেশের অধ্যাপকের ছেলে অটোমেটিক অধ্যাপক হয় না, কিন্তু ইণ্ডিয়াতে পুরুতের ছেলে হলেই পুরুত! কোনো ট্রেনিং, কোনো ডিপ্লোমা, কোনো সার্টিফিকেটের দরকার হয় না। বাবার বাড়িতে নারায়ণ শিলা ছিল আর ছিল পুরোহিত দর্পণ। ওভারটাইম সেরে বাড়ি ফিরে এসে বাবাকে নারায়ণের

নিত্যসেবা করতে দেখেছি। তখন হাসতাম, ভাবতাম প্রয়োজন কি? এখন বুঝি ব্যাটারি সার্ভিসের মতন, সময়মতো নিত্য সার্ভিস না করলে ব্যাটারি ডাউন হয়ে যায়।"

এই ননীমাধবের ছেলে নবগোপাল ব্যানার্জি। আমি ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না। ওঁদের টিকিয়াপাড়ার বাড়িতে আমি গিয়েছি।

ননীমাধববাবু সেবার অসুস্থ। বলেছিলেন, যে করে হোক ওভারটাইমের টাকাটা বাড়িতে পৌঁছে দিতে।

আমার মনে আছে ওভার টাইমের পঁচিশ টাকা নিয়ে ওখানে পৌঁছতে ননীবাবুর সে কি আনন্দ। বললেন, "ভাগ্যে তুমি আজকেই এলে। তোমার কাছে গোপন রাখবো না, আর দেরি হলে আজ বাজার হতো না।"

ননীমাধববাবু সবসময় সন্ধ্যেবেলায় বাজার করতেন, আমাকেও তাই পরামর্শ দিতেন। বলতেন, "জিনিস হয়তো একটু শুকনো হয়, কিন্তু দাম সকালের চেয়ে কম। হাওড়া ব্রিজের ওপর থেকে যদি কিনতে পারো তা হলে তো কথাই নেই। গাঁয়ের লোকগুলো তখন বাড়ি ফেরবার জন্যে অস্থির, একটু ধরাধরি করলেই দাম কমিয়ে দেয়।"

নবগোপাল বললেন, "আমাদের বাড়িতেই আপনাকে বেশ কয়েকবার দেখেছি। কিন্তু সামনাসামনি আসিনি। কারণ মানুষের সামনে যেতে আমার লজ্জা হতো। বাবার এতো কষ্ট, বিরাট এক সংসারের দায়িত্ব, আর আমি পড়াশোনায় ভাল নই। কোনোরকমে এক ক্লাশ থেকে আর এক ক্লাশে উঠেছি। বাবা অবশ্য বলতেন, নবটার কিসসু হবে না। অথচ ওর চোখের সামনে, আমাদের আপিসের শংকর-এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। চাকরি করে, ওভারটাইম করে, টিউশনি করে, তার ওপর গপ্পো লেখে। এরই মধ্যে টুক করে নাইট কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষা দেওয়ার তোড়জোড় করছে।"

খুব লজ্জা পেলাম আমি। "সেসব দিন গিয়েছে বটে। কিন্তু সুদূর আমেরিকায় কেউ তা মনে রেখেছে ভাবতে আশ্চর্য লাগে।"

নবগোপাল বললেন, "তারপর আপনি তো বি-এ পাস করলেন, চেম্বারে টাইপিস্টের চাকরি ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন। বইটই লিখলেন। আমাদের বাড়িতে একটা গ্রুপ ছবি ছিল। কোন এক সায়েবের বিদায়সভায় নেওয়া। সেখানে আপনি বাবার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। বাবা ওই ছবি দেখে আমাকে লেকচার দিতেন, বলতেন আপনার মতন আমি হচ্ছি না কেন?"

"আমার জন্যে আপনি কষ্ট পেয়েছেন ভেবে আমি সত্যিই লজ্জা অনুভব করছি, মিস্টার ব্যানার্জি।"

আবার হা-হা করে হাসলেন নবগোপাল। "বাবা যত চাইছেন আমি ভাল হই, আমি তত খারাপ হয়ে যাচ্ছি। কোনো রকমে স্কুল ফাইনাল। তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে

আই-এস-সি। তাও ন্যারো এসকেপ ! আর দুটো তিনটে নম্বর কম পেলেই ফেল হয়ে যেতাম। তারপর বি-এস-সির কথা আর বলবেন না। ফেল হয়ে গেলাম। বাবা গেলেন ভীষণ রেগে। বাবাকে অবশ্য দোষ দিই না। দুটো মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে অনেক টাকা দেনা বাধিয়ে বসেছেন। টিকিয়াপাড়ার বাড়িতে সমস্ত বর্ষাকালটা ছাদ দিয়ে জল পড়ে। বৃষ্টি শুরু হলেই আমরা থালা, বাটি, গামলা, হাঁড়ি সাজিয়ে বসে থাকতাম।"

আমি নবগোপালের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। নবগোপাল বললেন, "টু কাট এ লং স্টোরি শর্ট ইউ অয়ার মিজারেবল। এবং মাই লেট ল্যামেনটেড ফাদারের আমার ওপর কোনো বিশ্বাসই ছিল না।"

মূল্যবান চিনামাটির প্লেট থেকে আমার দিকে রোস্টেড চিকেন এগিয়ে দিলেন নবগোপাল। "পুরনো সব কথা ভুলে যান, শংকরবাবু। ভাল করে চিকেন খান। আপনি শহরটা ভাল করে দেখেছেন ? কাল আপনাকে আমি একটা গাড়ি দিয়ে দেবো।"

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। নবগোপাল হাসলেন। "শোফার সমেত গাড়ি দিয়ে দেবো আপনাকে। যারা বলে বেড়ায় আমেরিকায় ঝি-চাকর-রাঁধুনি নেই, শোফার নেই, তারা পুরোপুরি সত্যি বলে না। সবই আছে, একটু কম পরিমাণে. এই যা। ভগবানের আশীর্বাদে আপনাকে শোফার ড্রিভন গাড়িতেই পাঠাতে পারবো। একটা রাখতে হয়েছে। সায়েব আমেরিকান—আমাদের ডেলিভারি ভ্যান ড্রাইভ করে, আবার দরকার হলে কারও চালায়। আমি আবার মার্সিডিজ বেনজ-এর ভক্ত—যদিও একটা রোলস রয়েস রাখতে হয়েছে— যাকে বলে কিনা টু কীপ আপ উইথ দ্য জোনস।"

"এসব এদেশে দরকার হয় নাকি ?"

"খুব দরকার হয়, শংকরবাবু। এখানেও ব্যবসাবাণিজ্য করে জাতে ওঠবার একটা ব্যাপার আছে। ছোট অবস্থা থেকে বড় হয়ে অনেকে বাড়ি পাল্টায়, গাড়ি পাল্টায়, এমনকি বউও পাল্টায়। এই তিনটেই স্ট্যাটাস সিম্বল। বউ পাল্টানোর খরচ গাড়ি পাল্টানোর খরচের চেয়ে একটু বেশী, কিন্তু কিছু এসে যায় না। আফটার অল ডলার কী জন্যে ? খরচ করবার জন্যে। না হয় বেঁটে মোটা বউকে হটিয়ে তন্বী সুদর্শনা দীর্ঘাঙ্গিনী ঘরে তুলবার জন্যে পুরনো বউকে কিছু মাসোহারা দিলে। আমি কিন্তু খুব বেঁচে গিয়েছি শংকরবাবু। আমি বাড়ি পাল্টাই, গাড়ি পাল্টাই, কিন্তু বউ পাল্টাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ আমার বউ নেই। টিকিয়াপাড়ায় একটি মেয়ের সঙ্গে আমার প্রেম হয়েছিল। কিন্তু বি-এস-সি ফেল বেকার বখাটের সঙ্গে কে মেয়ের বিয়ে দেবে ? মেয়েটা আই মাস্ট অ্যাডমিট, বলেছিল, আমাকে নিয়ে পালাও। কিন্তু আমার

চাল নেই, চুলো নেই, আমি নিজে আছি হোটেল ডি পাপায়! আমার সাহস হলো না, আমি রিকোয়েস্ট করলাম, সময় দাও। তা কত আর সময় দেবে? আর বাবা মাও বা কত শুনবেন? একদিন জোর করে বিয়ে দিয়ে দিলেন। ছোঁড়াটা হাওড়া কোর্টের মুহুরি।"

"আজকাল মুহুরি কথাটা ব্যবহার হয় না। ল' ক্লার্ক।"

"ওই হলো, যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন। আমি ভেবেছিলাম, বিয়ের পরেও একটা চিঠি দেবো। কিন্তু আমার বন্ধু পরামর্শ দিয়েছিল, ওই পথে যেও না। উকিলের বাবু—পুলিশের সঙ্গে গা শোঁকাশুঁকি। একেবারে হাজতে চালান করিয়ে দেবে, আর এইসব কেসে রাত্রে কচুয়া ধোলাই। পেঁদিয়ে বিন্দাবন দেখিয়ে দেবে!"

নবগোপাল ব্যানার্জি বললেন, "ফাঁসিতলার মোড়ে চণ্ডীডাক্তারের কাছে ক'দিন কম্পাউণ্ডারের কাজও করেছিলাম। কিন্তু আমার কপাল খারাপ, পনরো দিনের মাথায় চণ্ডীডাক্তার নিজেই পটল তুললো। অতবড় ডাক্তারখানা রাতারাতি উঠে গেল। উকিল ডাক্তারের এই এক মুশকিল—যতক্ষণ বেঁচে আছে ততক্ষণ ঠিক—কিন্তু চোখের পাতা বুজেছো কি সব শেষ!"

"আমি একবার ল'ক্লার্ক হবো ভেবেছিলাম। সুব্রত ব্যানার্জিকে গিয়ে ধরবো সব ঠিকঠাক। কিন্তু লাস্ট মোমেন্টে খেয়াল হলো ওইখানেই আমার প্রাক্তন প্রেয়সীর স্বামীর সঙ্গে রোজ দেখা হয়ে যাবে—মনটা সারাক্ষণ খচখচ করবে, কাজে মন দিতে পারবো না। আমার পক্ষে কোনোদিন ভাল ল'ক্লার্ক হওয়া সম্ভব নয়। আমি আবার হাত গুটিয়ে বেকার বসে আছি। বাবা বহু কষ্টে, সায়েবের পায়ে ধরে আরও দু'বছর এক্সটেনশন ম্যানেজ করেছেন।"

আমার দিকে সুইট ডিশ এগিয়ে দিতে-দিতে নবগোপাল অনুরোধ করলেন, "এই ডিশটা মিস করবেন না। মিষ্টি তৈরি করে এর ওপর ইটালিয়ান রেড ওয়াইন ছড়িয়ে দেওয়া হয়। জানেন, আপনাকে একটা মজার কথা বলি, খোদ ইটালিয়ান রিভিয়েরাতে বসে বাবা এই রেড ওয়াইন টেস্ট করলেন। মুখ বেঁকিয়ে স্বাদ নিলেন, বললেন এতো নাম শুনেছি, কিন্তু সেরকম খেতে তো ভাল নয়। এর থেকে আমাদের দুলাল ঘোষের দই অনেক ভাল—শেষপাতে দুলালের দইয়ের কোনো তুলনা নেই।"

"বাবা সেবার ছিলেন খুব নামকরা হোটেলে। বাই দ্য বাই, মাই সেম ফাদার, যিনি একদিন।..." একটু থামলেন নবগোপাল। "ওহো, আপনাকে তো আসল কথাটাই বলা হয়নি। মা সেদিন মামার বাড়িতে গিয়েছেন, কী একটা কাজে। আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে বন্ধুর কাছ থেকে চেয়ে একটা সিগারেট টানছিলাম...বাই দ্য বাই ধরা পড়ে গেলাম বাবার কাছে। বললেন, ফেলে দে সিগারেট। অতোখানি সিগারেট....আমার

মায়া হচ্ছিল, প্রাণ ধরে ফেলতে পারছিলাম না। দেখুন, কী আশ্চর্য ব্যাপার। সেদিন পিতৃ আজ্ঞা পালন করতে পারলাম না, আর এখন আমি সিগারেটই খাই না। দেশছাড়া হয়েই আমি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি ফর এভার।”

নবগোপাল ব্যানার্জি জানালেন, “শংকরবাবু, আমার যে কোম্পানি এখানে কিছুটা নাম করেছে তার নাম ‘বেমকো’—বুঝতেই পারছেন স্বদেশকে আমি ভুলিনি। ওর মধ্যে রয়েছে বেঙ্গল মেডিক্যাল কোম্পানির ইঙ্গিত। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে চণ্ডীডাক্তারের ডিসপেনসারির ওই নাম ছিল। এখানকার বড়-বড় ফার্মাসির তুলনায় আমরা নগণ্য—তবে ইতিমধ্যেই বিক্রি কয়েক মিলিয়ন ডলার।”

এই মিলিয়ান ব্যাপারটা যেন এখানে ডাল-ভাত। যে আইসক্রিম বিক্রি করছে সে-ও মিলিয়নের মুখ দেখছে।

নবগোপাল বললেন, “আমার প্রতিষ্ঠানের এখন যথেষ্ট সুনাম। আমার পরিকল্পনা সারা দেশজুড়ে আমি শত-শত বেমকো সেন্টার খুলবো। ওষুধ ছাড়াও মানুষ আসবে বেমকো ডায়াগনস্টিক সেন্টারে। টাকাটা এখানে কিছু নয়, যদি আপনি জানেন মানুষকে কীভাবে সন্তুষ্ট করতে হবে। আমি প্রথমে টাকা রোজগারের চেষ্টা না করে মানুষকে খুশী করার চেষ্টা চালিয়েছি, ফলও পেয়েছি হাতে-হাতে। আমার কোনো বেমকো সেন্টারেই খরিদ্দারের অভাব নেই।”

নবগোপাল নিজে এবার কফির কাপ এগিয়ে দিলেন। এই কাপগুলোর জন্ম যে ব্রাজিলে তাও জানতে পারলাম। “ব্রাজিলের কফির সঙ্গে ব্রাজিলের কাপ না-হলে মানায়? আপনি বলুন। যেমন আমাদের হাওড়া ময়দানের চা। ঘড়া থেকে ঢেলে খুরি থেকে না খেলে তার স্বাদই পাওয়া যায় না। আমার বেমকো সেন্টারের অ্যানিভারসারিতে ঐ একটা ঘড়া উনুন সমেত দেশ থেকে বাই এয়ার আনিয়েছিলাম। সেই চা খেয়ে হৈ-হৈ পড়ে গেল, টি ভি এবং কাগজের লোকরা ছুটে এলো—নিউ ডাইমেনশন ইন ইট বিভারেজ বলে প্রোগ্রাম দেখালো। ভিডিও করা আছে, আপনাকে দেখাবো।”

কফির পাত্র নিয়ে আবার পুরনো দিনে ফিরে গেলেন নবগোপাল ব্যানার্জি। “টিকিয়াপাড়ার দিনগুলোই আমাকে তৈরি করেছে শংকরবাবু। এই যা দেখছেন তার জন্যে দায়ী আমার বাবা। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।”

কৌতূহল নিয়ে আমি ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। নবগোপাল আস্তে-আস্তে বললেন, “ওই যে রাস্তায় সিগারেট খাচ্ছিলাম, বাবা ওভারটাইম করে ফেরার পথে ধরে ফেললেন। হুকুম করলেন সিগারেট ফেলে দিতে, আমি মায়ায় পড়ে সিগারেটটা ফেলতে দেরি করলাম। বাবা বললেন, বাড়ি এসো। আমি বাধ্য হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। মা বাড়িতে থাকলে হয়তো ওই ধরনের কথা হতো না, আর আমারও ভাগ্য

পাল্টাতো না। যা বলছিলাম আপনাকে, বাবা বুঝিয়ে দিলেন বাপের পয়সায় সিগারেট খাওয়াটা লজ্জার ব্যাপার। আমি বললাম, ওটা আমার বন্ধু অরূপের বাবার পয়সায় কেনা। বাবা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তারপর অর্ডার দিলেন, খোদার খাসী আমি চিরদিন পুষতে পারবো না। হয় রোজগার করো, না-হলে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।"

বাঙালী ঘরে এই ধরনের কথার কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে ভেবে আমি শংকিত হয়ে উঠলাম।

"টু কাট এ লং স্টোরি শর্ট, আমি সেদিনই সিদ্ধান্ত নিলাম। এবং আড়াই মাসের মাথায় দেশছাড়া হয়ে জার্মানিতে চলে এলাম। আমাদের পাড়ায় অনেকে তখন জার্মানি যাবার জন্যে অ্যাপ্লিকেশন পাঠাচ্ছে। আমার একটা অ্যাপ্লিকেশন লেগে গেল। প্লেনের টিকিট ছাড়া আমার কাছে মাত্র আট ডলার ছিল। টিকিটটাও মায়ের গহনা বেচা টাকায়। বাবাকে লুকিয়েই দাদুর দেওয়া একটা গহনা মা আমাকে দিয়েছিলেন, তুই মেয়ে হলে তোকে তো দিতেই হতো।"

"তারপর?"

"তার পরেরটা অনেকটা রূপকথার মতন। ওদেশে প্রচণ্ড স্ট্রাগল করেছি, শংকরবাবু। বাসে চড়বার পয়সা থাকতো না, সাইকেল চালিয়ে দোকানে আসতাম। আপনাকে বলা হয়নি, ওই চণ্ডীডাক্তারের ওখানে কম্পাউণ্ডারির ওটাই মনে লেগে গেল। আমি ফার্মাসি পড়তে শুরু করলাম। পয়সার জন্য তখন ষোলো ঘন্টা পর্যন্ত দোকানে ডিউটি দিয়েছি। তারও কয়েক বছর পরে জার্মানি ছেড়ে দিলাম। বুঝলাম, এখানে সারাজীবন থাকা যাবে না। তখন আমেরিকায় ফার্মাসিস্ট ঢুকতে দিচ্ছে—ওদেশের লোকরা ওইসব আজেবাজে কাজ করতে চায় না। আমি একটা হাসপাতালে চাকরি পেয়ে গেলাম। হাজির হলাম এই দেশে।"

আমার মুখের দিকে তাকালেন নবগোপাল। "আমি কিন্তু চাকরি করার জন্যে এই দেশে আসিনি। সুযোগ খুঁজতে লাগলাম। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আমি মুন লাইটিং করতাম!"

"সেটা কী জিনিস?"

"যারা পয়সার অভাবে অথবা লোভে দুটো চাকরি করে। ষোলো ঘন্টা ডিউটি তাদের কাছে ডাল-ভাত। আমি একটা ফার্মাসির দোকানে কাজ করতাম। মালিক ছিল এক পোল্যাণ্ডের ইহুদি। ইংরিজীটা খুব ভাল জানতো না। আর আমাকে ভালবাসতো এই জন্যে যে আমার প্রিয় লেখক আইজাক সিঙ্গার। আমি পয়সা পেলেই ওঁর বই কিনতাম। তারপর একদিন ওই ইহুদির কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে ওঁরই দোকান কিনলাম। বহুবছরের অমানুষিক পরিশ্রম এর মধ্যে হয়ে গিয়েছে। আমি নাম

দিলাম বেমকো। তারপর প্রতিবছরে আমি একটু-একটু করে এগিয়েছি। বেমকো এখন এ-অঞ্চলের সবচেয়ে লম্বা চেইন—অনেকগুলো ব্রাঞ্চ হয়েছে, আরও হবে। কয়েক মিলিয়ন ডলার খাটছে এই বিজনেসে। তা ছাড়া আছে আমার জমিজমা কেনার শখ। প্রথমে সত্যিই শখ করে একটু-আধটু কেনা-বেচা করতাম। এখন এটাও ভাল চলছে। প্রতিবছর গোটা তিনেক সম্পত্তি কিনি আর গোটা তিনেক বেচি। আমি ঠিক সময়ে এ-লাইনে এসেছিলাম। এই স্টেটে এখন 'বুম' চলছে, নতুন বাড়ি-ঘরদোরে টাকা ঢালবার জন্যে মানুষ পাগল। আমি এখন ইনভেস্ট করছি ফ্লোরিডা এবং আলাস্কার সম্পত্তিতে। ওখানেও বুম আসছে। আমি ফ্লোরিডাতেও বেমকো চেইন খুলবো ভাবছি।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার এই সাফল্যের রহস্যটা কী?"

স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ে চুপ করে রইলেন নবগোপাল। আমি চাপ দিতে লাগলাম। "উত্তরটা আমাদের দেশের মানুষের প্রয়োজন, নবগোপালবাবু। তাদের তো বোঝাতে হবে, তারাও চেষ্টা করলে জীবনে সাফল্য অর্জন করতে পারে।"

নবগোপাল বললেন, "ঠিক সেইভাবে ভেবে দেখিনি কখনও। এতোদিন মনে হয়েছিল, বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন বলেই ব্যাপারটা হলো। আপনি ঠিকই বলেছেন, যে লোক টিকিয়াপাড়া থেকে বেরিয়ে এসে দমদমে জাহাজে চড়েছিল সে আর আজকের লোকটা এক নয়। বিদেশে আমি অনেক কিছু শিখেছি। আমি সুযোগ পেলেই মানুষকে অবজার্ভ করতাম। তারপর..."

"তারপর কী?"

"আমি বুঝেছি, এগোতে গেলে মানুষকে একটু মাথা ঘামাতে হয়। একটা লক্ষ্য ঠিক করে নিতে হয়। তারপর ভাবতে হয়, আমি দুনিয়ার কারও থেকে কম নই! আমি কেমন করে লক্ষ্যে পৌঁছবো তা ঠিক করে নিই। তারপর লেগে পড়ি। শরীরটা অদ্ভুত এক যন্ত্র। কত বাড়তি বোঝা যে দেহটা নিতে পারে তা মানুষ নিজেই জানে না। সেই সঙ্গে সেই পুরনো কথা। নিষ্ঠা চাই—চালাকির দ্বারা কোনো ভাল কাজ হয় না। চালাকি মানে লোকঠকানো অথবা নিজেকে ঠকানো। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, বোকামির দ্বারাও ভাল কাজ হয় না। বুদ্ধি চাই। আর..."

আমি আবার নবগোপালের মুখের দিকে তাকালাম। "আর কী?"

"অবশ্যই সুযোগ, অথবা ভাগ্য। তবে আমি দেখেছি ভিতর থেকে ছটফটানি থাকলে মাঝে-মাঝে সুযোগও এক-আধটা এসে যায়।"

আমি ভীষণ খুশি হলাম। আমার নোটবইতে লিখলাম আমার এখানে আসা সার্থক হলো। আমি একটা মানুষের মতন মানুষ খুঁজে পেয়েছি। নবগোপাল চুরি করেননি।

ওষুধে ভেজাল মেশাননি, লুকিয়ে নিষিদ্ধ ড্রাগের চোরাচালান করেননি। তবু টিকিয়াপাড়ার সামান্য অবস্থা থেকে এদেশে বড় হয়েছেন।

"নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে আপনাকে তো কখনও কিছু করতে হয়নি," আমি দ্রুত নোট লিখতে-লিখতে নবগোপালকে বললাম।

"আমরা সামান্য লোক, এদেশে হাজার-হাজার নয়, লাখ-লাখ মানুষ পাবেন আমার মতন। আমাদের নিয়ে গল্প হয় না, শংকরবাবু।"

"গল্প আমি চাই না, আমি চাই আমার দেশের মানুষদের জন্য উদাহরণ। নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কিছু না-করেই যে পৃথিবীতে বড় হয়েছে।"

আমি কোনো উত্তর প্রত্যাশা করিনি। রাত অনেক হয়ে গিয়েছে। নবগোপাল আমাকে ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন।

আলো জ্বালিয়ে রেখে আমি তখনও আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলাম। নিজের চোখে এইসব মানুষগুলো না-দেখলে আমার মানবতীর্থ পরিক্রমা অসম্পূর্ণ থেকে যেতো। কিন্তু হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল আমার সম্পাদকের কথা। সম্পাদক বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষেরই এক-আধটা খুঁত থাকে। সেই খুঁতটা আমি বিশ্বাসের আতিশয্যে খুঁজে বার করতে ভুলে যাই।

নবগোপালকে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করা হলো কি?

কী বিষয়ে আমি জিজ্ঞাসা করতে পারতাম? বিবাহ? নবগোপালের গৃহ যে গৃহিণীশূন্য সে তো আমি দেখতেই পাচ্ছি। প্রেয়সী যে অন্য কারও গলায় মালা দিয়েছে সে তো নবগোপাল নিজেই বললেন। তারপর নবগোপাল বিয়ে করেছেন কিনা, কিংবা করার পরে বিয়ে ভেঙেছে কিনা, এটা আমার পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। আমার লক্ষ্য তো সীমিত—আমি দেশের ছেলেদের বোঝাতে চাই, তেমনভাবে লেগে পড়লে তোমাদের অসাধ্য কিছু নেই। এখনও সময় আছে।

তবু সম্পাদকের মন্তব্যটা খচখচ করছে। লিখি না লিখি, আরও কিছু খুঁত থাকলে তা জেনে নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু নবগোপাল তো বলেছেন, তিনি অসৎপথে ব্যবসা করেননি।

নবগোপাল দ্য ম্যান? নবগোপাল কি সত্যিই বাবাকে শেষপর্যন্ত ক্ষমা করতে পেরেছিলেন? ঐ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা। মনের মধ্যে একটা স্থায়ী ক্ষত থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়।

কিন্তু ওই তো নবগোপাল বললেন, বাবাকে ওয়ার্ল্ড ট্যুর করিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়লো ননীমাধব ব্যানার্জি যখন মারা যান তখন তাঁর বড় ছেলে শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত ছিল না। কেন?

বিদেশে থেকে হয়তো যাওয়া সম্ভব হয়নি। আবার কেন ?

ভোরবেলায় মার্সেডিজ-এ চড়িয়ে নবগোপাল আমাকে ফেরত নিয়ে চললেন সত্যব্রতর বাড়িতে। "ভাল ঘুম হয়নি মনে হচ্ছে। লেখক মানুষ, অনেকক্ষণ ধরে অনেক কিছু নোট করেছেন।"

"নোট করিনি, কিন্তু একটা ভাবনা এসে গিয়েছিল। এই যে আপনার অবিশ্বাস্য সাফল্য এর জন্যে কখনও আপনাকে বিবেকের বিরুদ্ধে কিছু করতে হয়নি ? আমার সম্পাদক বয়সে আপনারই মতন। তাঁর ধারণা খুঁত ছাড়া কোনো কাজ হয় না।"

নবগোপাল কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। ড্রাইভিং-এ তাঁর মন নিবিষ্ট হয়ে রয়েছে।

আমি বললাম, "এই যেমন আপনার বাবার শ্রাদ্ধে আপনি অনুপস্থিত ছিলেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন--পারলৌকিক কার্যে জ্যেষ্ঠ সন্তানের অনুপস্থিতি।"

কোনো উত্তর দিলেন না নবগোপাল। একটু পরে বললেন, "বাবা ও মায়ের নামে আমি একটা ছোট্ট প্রতিষ্ঠান করবো--ননীমাধব-শ্রীদুর্গা ফাউন্ডেশন। ওই টাকায় টিকিয়াপাড়ায় কিছু বাড়ির ফুটো ছাদ সারানো হবে প্রতিবছর। মায়ের নামে আমি বাড়ির নামও রেখেছি শ্রীদুর্গা।"

তা হলে তো কিছু বলবারই থাকে না। সম্পাদক প্রশ্ন করলে, আমি বলবো, খোঁজ করেছিলাম, খুঁত পাইনি। প্রত্যেক মানুষের খুঁত থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই।

সত্যব্রতর হাতে আমাকে সমর্পণ করে নবগোপাল রসিকতা করলেন, "আপনার জিনিস আপনাকে ইনট্যাক্ট ফেরত দিয়ে গেলাম।"

দ্রুত ব্রেকফাস্ট শেষ করে সত্যব্রতও বেরিয়ে পড়লেন। আমি এবার নবগোপালের কাহিনীটি ঝটপট লিখে নেবো। কয়েকঘন্টা পরে সত্যব্রত ফিরে আসবেন এবং আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবেন। আমার পরবর্তী গন্তব্য ইলিনয়ের এক ছোট্ট শহর।

নবগোপালের কথাগুলো আমি লিখতে বসেছি। এমন সময় আবার টেলিফোন। "হ্যালো, শংকরবাবু", ওদিকে নবগোপালের গলা, মিনিট পঁচিশেক আগে যিনি আমাকে এখানে পৌঁছে দিলেন।

"বাড়ি ফিরেই আপনাকে ফোন করছি।"

"সব ঠিক তো ! দেশে আপনার মায়ের সঙ্গে দেখা করে সব বলবো। তিনি নিশ্চয় খুশি হবেন।"

নবগোপালের মতন কৃতী বিজনেসম্যানও একটু থতমত খেলেন। তারপর

"আপনার সম্পাদক আপনাকে খুঁত সম্পর্কে যা বলেছিলেন সেই প্রসঙ্গে আপনাকে একটা কথা বলি। আমি যাকে ভালবাসি, কিন্তু ওঁর শ্রাদ্ধতেও আমি উপস্থিত থাকবো না।"

নবগোপালের মতন প্র্যাকটিক্যাল মানুষ এসব কী বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।

"শুনুন শংকরবাবু, আমার মাকে আমার জীবনের সব কথাই বলেছি, কিছুই তাঁর অজানা নয়। কিন্তু একটা কথা বলা হয়নি। ...আপনি ওই যে বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ বললেন...আপনি আমার হোল লাইফের ঘটনাগুলো অডিট করলে দেখবেন, জার্মানিতে একটা ফাঁক থেকে গিয়েছে। জার্মানিতে পৌঁছে আমার চাকরি চলে গিয়েছিল। তখন আমার দারুণ অর্থাভাব। তাছাড়া জব-পারমিটের গোলমাল। ওরা আমাকে তাড়িয়ে দিতো। সেই সময় বেঁচে থাকবার জন্যে অন্য কোনো পথ খুঁজে না-পেয়ে আমি হিন্দুধর্ম ছেড়ে খ্রীষ্টান হয়েছিলাম। ফাদারদেরও দোষ নেই, কতকগুলো সুযোগ-সুবিধে ওঁদের খ্রীষ্টানদের ছাড়া দেবার উপায় নেই। ব্যাপারটা আমি বাধ্য হয়েই করেছিলাম, তবে কাউকে না জানিয়ে।...তারপর আমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, আর্য সমাজ-টমাজ কোথাও গিয়ে আবার ব্যাক টু হিন্দু হতে পারতাম। কিন্তু সেটাও আমার বিবেকে লাগলো—মনে হলো ওটা লোক-ঠকানো হবে। কিন্তু শংকরবাবু, ব্যাপারটা আমার মা আজও জানেন না যে আমি বিধর্মী। আমি ওই জন্যে এখানকার দুর্গাপূজোয় যাই না, বাবার শ্রাদ্ধেও যাইনি, মায়ের শ্রাদ্ধেও যাবো না। প্লিজ শংকরবাবু, আমার মা যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন ব্যাপারটা লিখবেন না। আমার মা কিন্তু ভীষণ কষ্ট পাবেন।"

গল্পটা অনেকদিন লেখা হয়নি। সম্প্রতি খবর পেলাম নবগোপালের মা দেহরক্ষা করেছেন। ছোটভাই আমাকে শ্রাদ্ধের যে চিঠি পাঠিয়েছে, তার শেষে সাতটি ভাগ্যহীন ও ভাগ্যহীনার তালিকায় প্রথমেই রয়েছে "নবগোপাল দেবশর্মণঃ।"

যথারীতি নবগোপাল শ্রাদ্ধবাসরে অনুপস্থিত।

আমি দায়িত্বমুক্ত হয়েছি, নবগোপালের খুঁতের গল্পটা এবার আমি লিখতে পারি।